রক্ত রঞ্জিত পথ

নাজিব কিলানী

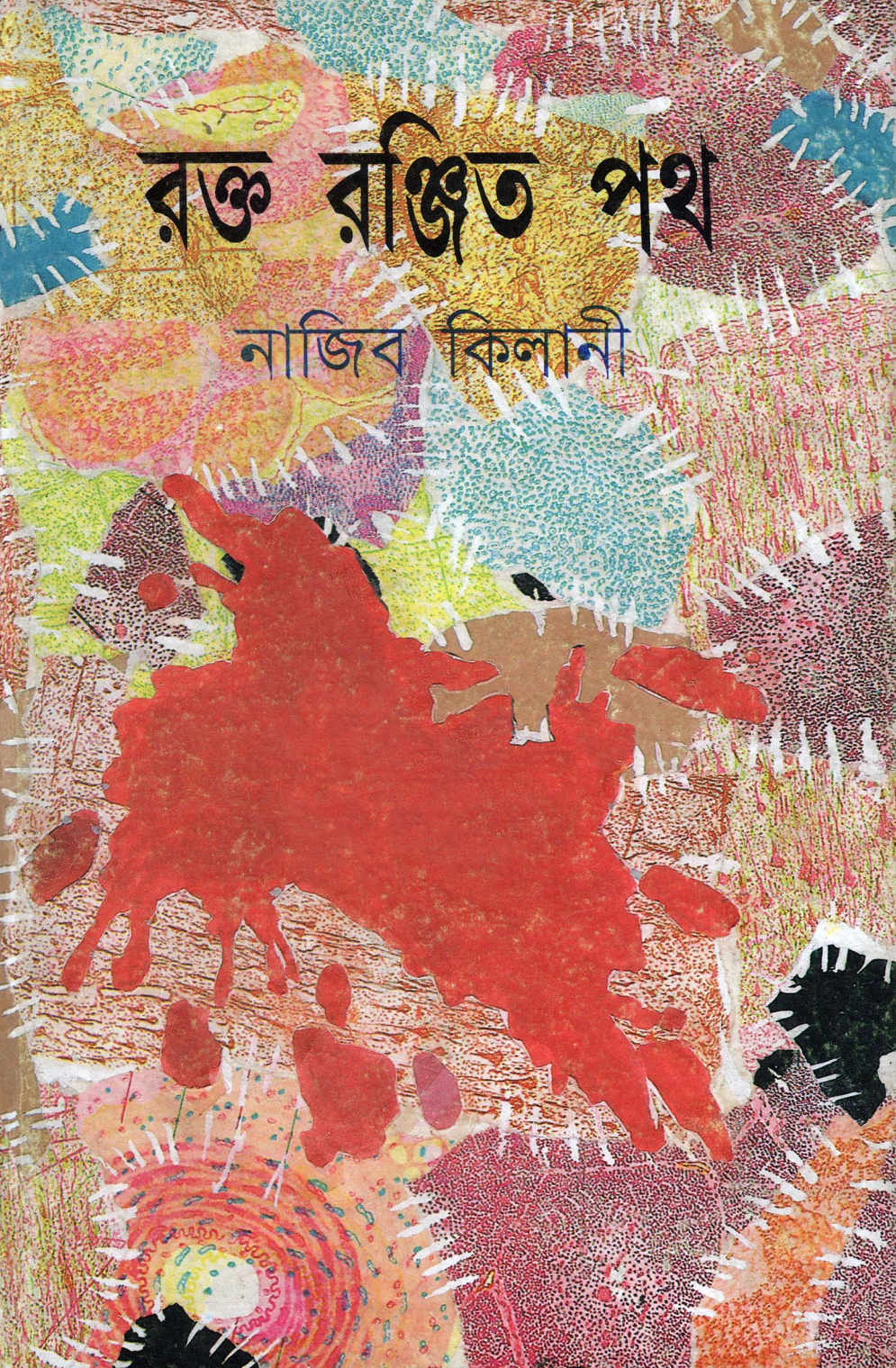

রক্ত রঞ্জিত পথ

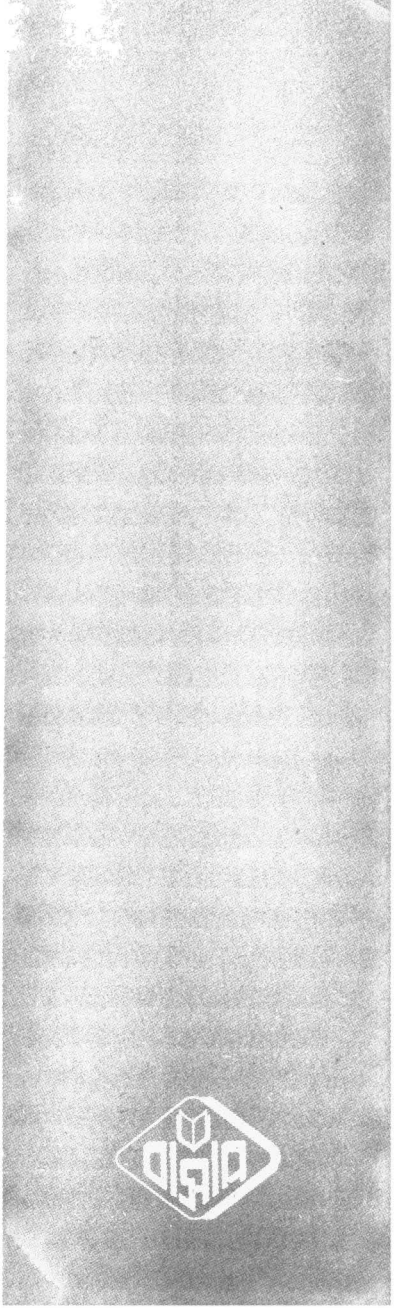

বাংলা সাহিত্য পরিষদ

রক্ত রঞ্জিত পথ

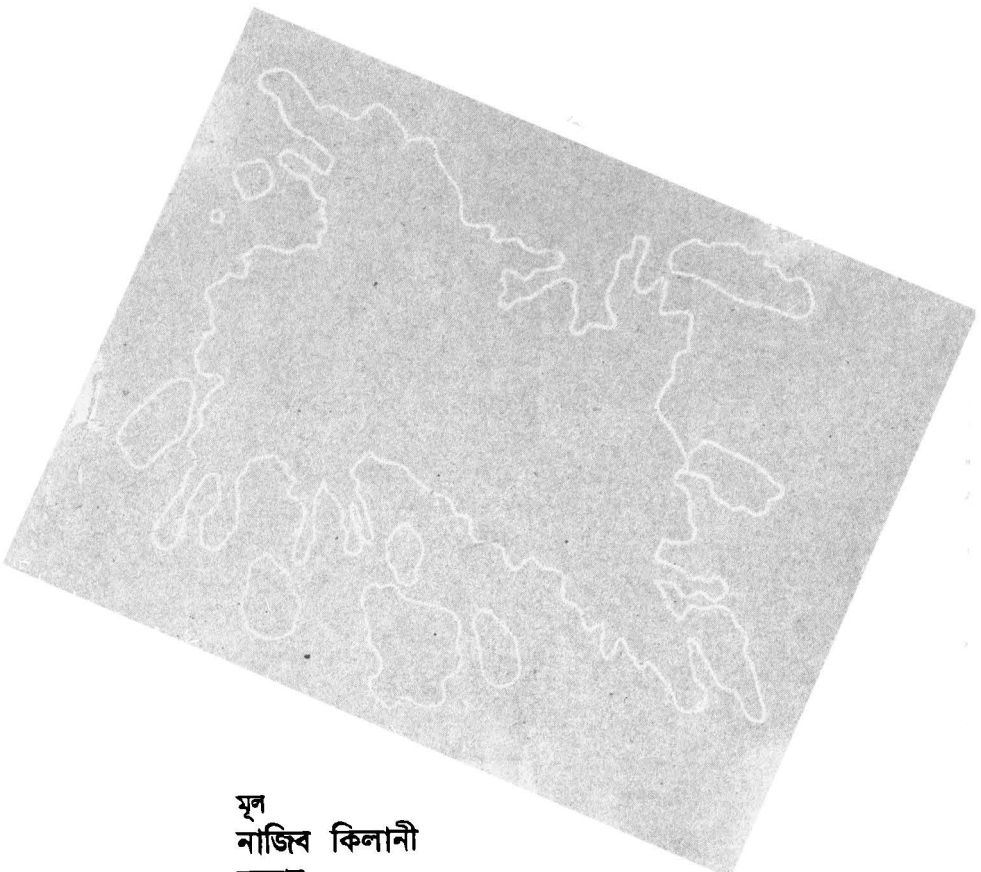

মূল
নাজিব কিলানী
অনুবাদ
মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ

রক্ত রঞ্জিত পথ
মূলঃ নাজিব কিলানী
অনুবাদঃ মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ
প্রকাশক
আবদুল মান্নান তালিব
পরিচালক
বাংলা সাহিত্য পরিষদ
১৭১, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
প্রথম প্রকাশ
আশ্বিনঃ ১৩৯৮
সেপ্টেম্বরঃ ১৯৯১
বাসাপপ্র-২১
প্রচ্ছদ
মোমিন উদ্দীন খালেদ
মুদ্রক
ইছামতি প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা
কম্পোজ
কনফিডেন্স কম্পিউটিং এন্ড প্রিন্টিং
ঢাকা
মূল্য
আশি টাকা মাত্র (সাদা)
পঞ্চান্ন টাকা মাত্র (নিউজ)

RAKTO RANJITO PATH
By: Najib Kilani
Translated by Muhammad Abdul Ma'bud
Published by
Abdul Mannan Talib
Director
Bangla Shahitta Parishad,
171, Bara Maghbazar, Dhaka-1217.
Published on
September 1991
Cover Desing & Illustration
Momin Uddin Khaled
Price
Tk. 80.00 (White)
Tk. 55.00 (News)

সমকালীন প্রখ্যাত মিসরীয় কথাশিল্পী ডাক্তার নাজিব আল-কিলানীর জন্ম মিসরের 'আল-গারবিয়্যা' জেলার 'শারশাবা' পল্লীতে ১৯৩১ সালে। কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আল-কাসরুল আইনী' মেডিকেল কলেজ থেকে এম, বি, বি, এস, ডিগ্রী লাভ করেন। বর্তমানে তিনি সংযুক্ত আরব আমীরাতের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে উচ্চ পদে সমাসীন।

ছাত্র জীবন থেকেই আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গনে তাঁর সজাগ পদচারণা শুরু। তাঁর গতি কখনো থেমে থাকেনি। আজো তিনি সমভাবে লেখনী চালিয়ে যাচ্ছেন। এ দীর্ঘ সময়ে তিনি অনেক লিখেছেন। আরবী উপন্যাস, ছোট গল্প, কবিতা, নাটক, মননশীল গদ্য, সমালোচনা তথা প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর বিচরণ সমান। তবে গল্প, উপন্যাস ও মননশীল গদ্যে তাঁর স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র পরিস্ফুট হয়েছে অধিক। আরব বিশ্ব, মুসলিম জগত তথা বিশ্বের পতিতজনদের দুঃখ-দুর্দশা, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও নৈতিক অবক্ষয়ের সার্বিক ও সূক্ষ্ম চিত্র ধরা পড়েছে তাঁর লেখায়। সমস্যা বিশ্লেষণের সাথে সাথে পথ-নির্দেশও দিয়েছেন তিনি। তাঁর বিপুল রচনা-সম্ভারে একটা আদর্শবাদের ছাপ সুস্পষ্ট। সে আদর্শের নাম তাঁর ভাষায়-'আল-ইসলামিয়্যা' বা ইসলামী আদর্শ।

আরবী এবং বিশ্ব সাহিত্যে একটা স্বতন্ত্র ইসলামী ধারা সৃষ্টির যে সচেতন প্রয়াস বা আন্দোলন আজ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, আরব বিশ্বে তিনি তার অন্যতম পথিকৃৎ। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী সাহিত্য সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে ইসলামী সাহিত্যের সংজ্ঞা, প্রয়োজনীয়তা, রূপরেখা, সীমা, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত মতামত তুলে ধরেছেন। এ কারণে ১৯৭৮ সালে ভারতের প্রখ্যাত আরবী সাহিত্যিক ও ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভীর আহবানে সাড়া দিয়ে 'লাক্ষ্ণৌ আন্তর্জাতিক ইসলামী সাহিত্য সম্মেলনে' যেমন তিনি অংশ নিয়েছেন, তেমনি ১৯৮২-তে মদীনা ও ১৯৮৫-তে রিয়াদ সম্মেলনেও যোগদান করেছেন। আরব বিশ্বের নানা স্থান থেকে প্রকাশিত সাহিত্য সাময়িকী, ম্যাগাজিন, জার্নাল ও দৈনিকে তিনি লিখে চলেছেন নিরলসভাবে।

আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় এ পর্যন্ত তাঁর পঞ্চাশের অধিক বই প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রতিভা ও অবদানের স্বীকৃতি তিনি লাভ করেছেন আরব বিশ্বের বিভিন্ন সরকার, সংগঠন ও সমিতির নিকট থেকে বিপুলভাবে পুরস্কার লাভের মাধ্যমে। মিসরের শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ক উচ্চ পরিষদ, আরবী ভাষা একাডেমী, আরবী গল্প ক্লাব, ইয়ং মুসলিম জার্নাল প্রভৃতি সংগঠন থেকে পুরস্কার লাভ করেছেন। 'ডক্টর তাহা হুসাইন' স্মরণে প্রবর্তিত স্বর্ণপদকও তিনি লাভ করেছেন। মিসরের শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের একাধিক পুরস্কারে তিনি ভূষিত হয়েছেন। আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচীতে তাঁর লেখা

অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাঁর লেখা বহু কাহিনী সিনেমা ও নাটকে যেমন মঞ্চস্থ হয়েছে, তেমনিভাবে বিভিন্ন দেশের টেলিভিশনে সিরিজ আকারে অভিনীতও হয়েছে। তাশখন্দ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রথম পুরস্কার বিজয়ী 'লাইল ও কুদবান' (রাত্রি ও রেলপথ) ছবিটির কাহিনীকারও তিনি।

নিম্নে আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় লিখিত তাঁর কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য বইয়ের বাংলা নাম দেয়া হলোঃ

উপন্যাস

১. রক্ত রঞ্জিত পথ, ২. আল্লাহর পথের সৈনিক, ৩. অন্ধকারে, ৪. প্রতিশ্রুতির দিন, ৫. পল্লীকুমারী, ৬. ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ বসন্ত, ৭. নবীদের দেশ, ৮. চিরন্তন আহবান, ৯. যারা জ্বলতে থাকে, ১০. শয়তানের মাথা, ১১. দাসদের রজনী, ১২. আল্লাহর জ্যোতি, ১৩. হামযার ঘাতক, ১৪. উমর আসবেন বায়তুল মাকদাসে, ১৫. অপরাধের রজনী, ১৬. খায়বরের উপকণ্ঠে, ১৭. উষার আগমন, ১৮. যমযমের কাছে দেখা, ১৯. মুক্ত মানুষের কাফেলা, ২০. তুর্কিস্তানের রজনী, ২১. উত্তরের রাজন্যবর্গ, ২২. জাকার্তা কুমারী, ২৩. শান্তির শ্বেতকপোত, ২৪. কালো ছায়া, ২৫. রমযান আমার বন্ধু, ২৬. পাহাড়ী রাজকন্যা।

ছোট গল্প

১. আমাদের প্রতিশ্রুত দিন আগামীকাল, ২. সংকীর্ণ বিশ্ব, ৩. প্রস্থানের সময়, ৪. আমীরের অশ্রু, ৫. আল্লাহর সিপাহীরা, ৬. হাওয়াযিনের অশ্বারোহী, ৭. প্রাচ্য কুমারী।

সমালোচনা ও মননশীল গদ্য

১. বিপ্লবী কবি ইকবাল, ২. চিরন্তনী কাফেলার কবি শাওকী, ৩. রোগগ্রস্ত সমাজ, ৪. ইসলামী ঐক্যের পথ, ৫. ইসলামী সাহিত্য ও অন্যান্য সাহিত্যিক মতবাদ, ৬. ধর্ম ও রাষ্ট্র, ৭. ইসলামী সাহিত্যের দুশমন।

কাব্য

১. প্রবাসীদের গান, ২. শহীদদের যুগ।

নাটক

১. দিমাশ্‌কের উপকণ্ঠে।

তাঁর লেখা বহু বই ইটালী, ইংরেজী, রুশ, তুর্কী, আফগানী, উর্দুসহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ১৯৮৬ সালে তাঁর সাড়া জাগানো উপন্যাস 'রিহলাতুন ইলাল্লাহ'–'আল্লাহর পথের সৈনিক' নামে বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় এবং পাঠকদের কাছে বিপুলভাবে সমাদর লাভ করে। 'আত–তরীক আত–তবীল'–'রক্ত রঞ্জিত পথ' বাংলা ভাষায় অনূদিত তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস। ১৯৫৭ সালে মিসরের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত সাহিত্য প্রতিযোগিতায় এ উপন্যাসখানি প্রথম পুরস্কার লাভ করে।

—অনুবাদক

রক্ত রঞ্জিত পথ

১

আমার গ্রামের পথে হাঁটছিলাম। একটি গভীর চিন্তায় তখন নিমগ্ন। যে সব সমস্যায় জড়িত হয়ে পড়েছিলাম তা-ই ছিল আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ- এমনকি হিটলার এবং তার যুদ্ধের থেকেও বেশী জটিলতর। খালি পায়ের সাথে পাথরের হোঁচট লাগছিল কিন্তু সেদিকেও আমার কোন লক্ষ্য ছিল না। জীব-জন্তুর বিষ্ঠা, গ্রামের রাস্তা-ঘাটে ছড়িয়ে থাকা কাদা-মাটি আমি মাড়িয়ে যাচ্ছিলাম। সে ব্যাপারেও যেন আমার কোন অনুভূতি ছিল না।

'ইবতেদায়ী মাদ্রাসা' আমার আব্বার কাছে যে চিঠিটি পাঠিয়েছে, তা বের করার জন্যে আমি ওভারকোটের পকেটে হাত ঢুকালাম। আর এটাই হলো সব সমস্যার কারণ। তাতে জড়িয়ে পড়েই আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি হাবুডুবু খাচ্ছে। মাদ্রাসা বাবাকে জানিয়ে দিয়েছে, আমার Bilharzia ও Ancylostomiasis রোগের যদি পূর্ণ চিকিৎসা না হয়, তাহলে আমাকে চতুর্থ শ্রেণীতে কোনক্রমেই গ্রহণ করা হবে না। আর সাথে সাথে এ কথার ওপরও জোর দেয়া হয়েছে যে, নিয়ম পদ্ধতি অনুযায়ী অন্যান্য ছাত্রদের মত বিশেষ ইউনিফরম ছাড়া আমি যেন আগামী নতুন বছরে স্কুলে না যাই।

আমার আব্বা ঋণের সাগরে তখন আকর্ণ নিমজ্জিত। সে বছর তুলোর দাম খুবই পড়ে গেছে। কিন্তু গম ছাড়া আমাদের ঘরে আর কিছুই নেই। তা দিয়ে আমাদের পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজন কোনভাবেই পূরণ হবে না। আমার মা হলেন আর এক হতভাগিনী...। প্রায়ই তিনি বুকের অসহ্য ব্যথায় কাতর হয়ে পড়েন। তার ওপর তিনি ছ' মাসের অন্তঃসত্ত্বা। তাঁকে ডাক্তার দেখানো নিতান্তই প্রয়োজন। অথচ আমার আব্বা-আম্মা দু'জনেই মনে করেন এ অবস্থায় ডাক্তারের কাছে যাওয়া একটা বিলাসিতা অথবা বলা যেতে পারে এক প্রকার অহমিকা। আর আমাদের দুর্বল আর্থিক অবস্থা- যদি তা আর্থিক অবস্থা নামে আখ্যায়িত করা সঙ্গত হয়, সে ভার বহন করতেও অক্ষম।

এসব কারণে আমি বুঝে নিয়েছিলাম, আমার Bilharzia রোগের চিকিৎসা একটা অসম্ভব ব্যাপার। অসম্ভব হবেই বা না কেন? মিটগামারের Bilharzia ও Ancylostomiasis হাসপাতালে যাওয়া-আসার জন্যে পয়সার দরকার। তাছাড়া আমাদের গ্রাম ও নিকটবর্তী রেলস্টেশনের মাঝখানের দূরত্ব অতিক্রম করে রেলে চড়ার ব্যাপারটিও হিসেবের মধ্যে রয়েছে। আর সে দূরত্ব কিছুতেই পাঁচ কিলোমিটারের কম হবে না।

এ সব বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও মিটগামার যাওয়ার জন্যে আমি মনে মনে উৎসাহী ছিলাম। বিশেষত আমার সেই ছোট্ট বন্ধুদের সাথে, যারা Tartar ematic ইনজেকশন নেয়ার জন্যে ফি বছর সেখানে যেতে অভ্যস্ত। তারা আমার কাছে মিটগামারের

বাড়িঘরগুলোর মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য এবং মিটগামার ও যুফ্‌তির মধ্যবর্তী সুপ্রশস্ত বিরাট ব্রীজের চিত্র তুলে ধরত। তারা বলতো, এটার নাম নাকি 'আল-কোবরী-আল-ফ্রান্সাবী'-ফরাসী পুল। তারা একটা ভীতি ও শংকার সাথে সেখানকার সেনা ছাউনির ইংরেজ সৈনিক, সামরিক গাড়ীতে প্রতি মুহূর্তে তাদের চলাচল এবং এ পুলের অপর পাশে তাদের শ্বেত গৌরবর্ণের চেহারাগুলোর কথা আলোচনা করতো। তুমি কি মনে কর যে, আমার বাবা খুব সহজেই আমাকে সেখানে নিয়ে যাবেন, ইনজেকশন বাবদ প্রতি দিন দুটি 'গুরুশ' করে কোরবানী দেবেন এবং আমার এই আকাংখিত আনন্দ থেকে বঞ্চিত না করে ছেড়ে দেবেন?

আমার ছোট্ট গ্রামটিতে আমি পায়চারি করছিলাম আর মাঠ থেকে ফিরে আসা পশু, বিরসীম (ত্রিপত্র গাছ বিশেষ), লাঙ্গল ও মাথালি বোঝাই গাধাগুলোর মাঝখান দিয়ে অন্যমনস্কভাবে রাস্তা অতিক্রম করছিলাম। আমাদের বাড়ীর কাছাকাছি এসে দেখতে পেলাম আমার আব্বা একটি বেঞ্চের ওপর বসে আছেন। তাঁর পাশেই বসে আছেন আমাদের একজন প্রতিবেশী-শায়খ হাফেজ শীহা। তাঁরা দু'জন কোন্ বিষয়ে আলাপ করছিলেন, তা শোনার জন্যে আমার কান পাতার কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ শায়খ হাফেজ তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী মুখে ফেনা তুলে জোরে জোরে বলছিলেন, আবদুদ দায়িম! আমার মর্যাদার কসম। এই কুত্তার বাচ্চা ইংরেজদের ওপর হিটলার অবশ্যই জয়ী হবেন।

-শায়খ হাফেজ! আমাদেরকে আমাদের মতই থাকতে দাও। লা'নাতুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন-তাদের সবার ওপর আল্লাহর লা'নাত।

-শোন, হিটলার একজন ভদ্রলোক। তিনি ইসলাম, মুসলমান ও আরবদের স্বাধীনতার সম্মান দেন। তিনি কখনই এই নাপাক ইংরেজদের মত হবেন না।

-সত্যি?

-অবশ্যই। ....আর অনেক দিন থেকেই। অথচ এই চার্চিল আমাদের কাঁধে সোয়ার হয়ে আমাদেরকে অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করাচ্ছে।

-কে জানে হিটলারও হয়তো এর থেকেও বেশী কঠোর ও বিপথগামী হতে পারে।

-সুবহানাল্লাহ। আবদুদ দায়ি,ম তুমি কি মনে কর ইংরেজদের মত হিটলারও ক্ষুধার্ত এবং ছুঁচো?

-তা আমি জানিনে। আমি একজন চাষাভুষো মানুষ। আর চাষবাসও আমার বাড়ীতেই। আমার কাছে তুমি শস্য মাড়াইয়ের মেশিন, সেচের সময় ইত্যাদি বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে পারো।

-কখখনো না। হিটলার চায় এসব প্রতারক ও জোচ্চোরদের হাত থেকে আমাদের মুক্তি ও স্বাধীনতা হোক।

-তার অন্তরটি এত ভালো? সে যে আমাদের পক্ষ নিচ্ছে তার কারণ কি?

-বন্ধু, এ হলো রাজনীতি! গভীর রাজনীতি এবং একেবারে 'আবু যায়েদ রেল পথের' মত বহুমুখী।

–তোমার কথা আমি বুঝলাম না।

–আজ না বুঝলে আগামীকাল বুঝবে।

আমার মা ও আব্বা এবং শায়খ হাফেজ তাদের কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছেন। আমি চুপে চুপে আমাদের ঘরের খোস–পাঁচড়ার মত ছাল উঠে যাওয়া বিবর্ণ দেওয়ালটি ঘেঁষে ভিতরে ঢুকলাম। প্রথমে মার কাছে যেতে চাইলাম। আমি ভাবছিলাম মাদ্রাসা থেকে আসা চিঠিটির কথা মাকেই প্রথম বলব। কেননা, আব্বাকে বুঝাতে ও তাঁর কাছে দেন–দরবার করতে নিঃসন্দেহে তিনি আমার থেকে বেশী পারদর্শী। কিন্তু আমি ঘরে ঢুকতে যাওয়ার মুখে তিনি আমাকে দেখে ডাক দিলেন,

–সুলায়মান এদিকে এসো। শুনলাম মাদ্রাসা নাকি একটা চিঠি পাঠিয়েছে। খায়ের ইনশা আল্লাহ।

আমি তাড়াতাড়ি চিঠিটি বের করে আমার আব্বার দিকে এগিয়ে দিলাম। কিন্তু আমাদের প্রতিবেশী শায়খ হাফেজ তার হাতটি আগেই বাড়িয়ে দিয়ে তা ধরে নিলেন।

আমি বাতি নেয়ার জন্য এলাম যাতে আলোতে তিনি পড়তে পারেন। আমার ধারণা সত্যই হলো। আমার বাবা মুখটি বেঁকিয়ে একটু ব্যঙ্গ করে বললেন–বিলহারজিয়া? সত্যিই মাদ্রাসাটি যেন পাগল হয়েছে। এখানে এ ব্যাধি থেকে কেউ কি সুস্থ আছে? এ তো আমাদের ভাত–পানির মত হয়ে গেছে।

প্রত্যুত্তরে শায়খ হাফেজ বললেন– কিন্তু সুলায়মান একজন অধ্যবসায়ী ছাত্র, ভবিষ্যতের নওজোয়ান, সব ধরনের রোগ থেকে তার স্বাস্থ্য রক্ষা করা উচিত।

–শায়খ হাফেজ! আল্লাহ তোমাকে সুস্থ রাখুন। কয়েক মাস পরে আবার ফিরে আসবে। এজন্য এখন আমি তার বিলহারজিয়া চিকিৎসা করবো, না তার জন্য জুতো কিনবো?

আমি যা ধারণা করেছিলাম তাই সত্য হলো। প্রতিদিন যাতায়াত খরচ বাবদ যে দু'টি পয়সার আমি মুখাপেক্ষী ছিলাম, তা দেয়া আমার পরিবারের জন্য অত্যন্ত কঠিন ছিল। গোটা যুদ্ধটাই যেন একটা দারিদ্র্য, বঞ্চনা ও সংকীর্ণতার নামান্তর। মনে হচ্ছে, এ দু'টি পয়সার ব্যাপারেই আমার ওপর তার যত কার্পণ্য। এমনি ধরনের আজেবাজে চিন্তায় আমি বিভোর ছিলাম। এমন সময় আমার আব্বার কণ্ঠস্বরে সে দুঃস্বপ্ন থেকে সম্বিত ফিরে পেলাম। তিনি বললেনঃ যাও, ভিতরে গিয়ে রাতের আহারপর্ব সেরে নাও। ইনশাআল্লাহ তোমার এ দুরবস্থা কেটে যাবে।

অত্যন্ত ব্যথা ভারাক্রান্ত ও ভগ্নহৃদয়ে আমার বাবা এ কথাটি বললেন। তাঁর ঐ অবস্থাটি আমার কাছে নতুন নয়। আমি তাঁর এ অবস্থা সম্পর্কে সব সময় অবহিত। বিশেষত যখন তাঁর ঋণের বোঝা ভারী হয়ে যায় এবং আর্থিক অসচ্ছলতায় তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েন, তখন তাঁর এমনটি হয়। খুব মনমরা অবস্থায় ভিতরের দিকে চললাম। মনমরা এ কারণে যে, সম্ভবত ফরাসী পুল, মিটগামার শহর, সেখানকার সুউচ্চ অট্টালিকা, সুবিস্তৃত সাগর ও

ভীতিপ্রদ লালমুখো ইংরেজ প্রভৃতি দেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলাম। এরপর আমার চোখে পড়ল আমাদের সেই রোগা দুর্বল মাদী মহিষটি পুরিসী রোগে আক্রান্ত হবার কারণে সব সময় ব্যথায় ছটফট করে। একটি কামরার ভাঙ্গাচোরা দরজাটি– আমরা নতুন করে যা লাগাতে পারছিলাম না, আর আমার হতভাগিনী মা, যিনি আমাদের জন্য রাত্রিকালীন খাবার আল–খুব্বাইয়াহ নামক সব্জি ও শুকনা রুটি তৈরী করছিলেন। তার মুখমন্ডলে যন্ত্রণার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল, থেকে থেকে আহ্, উহ্ বলে অস্পষ্ট কান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। তা সত্ত্বেও তাঁর হাত দু'টি সর্বদা কর্মব্যস্ত ছিল। তিনি গরম খুব্বাইয়াহ ডিসে ঢালছিলেন, শসা টুকরো টুকরো করে কেটে লবণ মিশাচ্ছিলেন এবং আটার রুটি একটার পর একটা সাজাচ্ছিলেন। টিমটিমে বাতির আলোতে ওগুলোর লালচে রং স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল। সে রাতে আমার মা–বাবা দু'জনের মাঝে দীর্ঘ আলোচনা হলো। আমার মা আমার চিকিৎসার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়ার প্রতি উৎসাহ দিচ্ছেন এবং বারবার তাগাদা দিচ্ছেন। কারণ স্কুল–মাদ্রাসার হুকুমে কোন নড়চড় হবে না। আর সামান্য এ ক'টি পয়সার অভাবে আমার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যাক, সেটাও তো যুক্তিসঙ্গত নয়। কিন্তু আমার বাবার পকেটে যখন একটি মিলিমও (মিসরীয় পয়সা) নেই, তখন কোন্‌টা যুক্তিসঙ্গত, কোন্‌টা যুক্তিসঙ্গত নয়, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করা না করা উভয়ই সমান। শেষমেশ খুব তাড়াতাড়িই আমার মা একটি সমাধানে পৌছলেন। সিদ্ধান্ত হলো, আধা কেজি ভুট্টা তিনি বিক্রি করবেন। সেই কালো দিনগুলোতে খাদ্যশস্যের কী আকালই না পড়েছিল। এ আধা কেজির দামই আমার প্রয়োজন মিটাবার জন্য যথেষ্ট ছিল।

আমি খুব তাড়াতাড়ি করে আমার চাচা শায়খ হাফেজ শীহার ছেলে ও আমার সহপাঠী সাঈদের কাছে ছুটে গিয়ে বললাম– সাঈদ, অবশেষে আমার আব্বা সম্মতি দিয়েছেন। আগামীকাল তোমার সঙ্গে আমি মিটগামার যাচ্ছি।

আনন্দে সাঈদ উচ্ছল হয়ে উঠল। কারণ, সেই ছোট বেলা থেকে আমরা দু'জন পরস্পর খুবই বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলাম। ঠিক যেন আমরা দু'টি ভাই। আর এখন আমাদের বয়স প্রায় তের বছর। অধিকাংশ সময় আমরা এক সাথে খাওয়া–দাওয়া করি, এক সাথে খেলাধূলা করি এবং একই জায়গায় পড়াশুনা করি। বললাম,

–শোন সাঈদ! আমি কি ইংরেজদেরকে দেখতে পাব?

–অবশ্যই। হাসপাতালে যেতে–আসতে আমরা সবাই তো তাদের দেখতে পাই।

–তুমি তাদের সাথে কথা বলতে পার না?

–কী সব কুলক্ষুণে কথা! সুলায়মান, তুমি যে কী বলো? তাদের বাদামী রংয়ের গাড়ীগুলো আমাদের পাশ দিয়ে চলে যায়, ঠিক যেন বাতাসের গতিতে, খোদা না করুন, কেউ যদি এক সেকেন্ড অমনোযোগী হয় বা একটু ধীরগতি হয়, তাহলেই কাম শেষ।

–কি হবে?

–চাকার তলেই তার প্রাণটি যাবে।

সাঈদকে আমি বলার সুযোগ দিলাম। সে আমার সামনে একটি ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরলো। আমার উর্বর কল্পনায় এসব ইংরেজকে শয়তানের চামুন্ডা বলে মনে হলো, যারা কিনা বাতাসের মত চলাচল করে, মৃত্যুর মত সহসা এসে পড়ে এবং মানুষের জীবনের প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করে না। আমি প্রশ্ন করলাম,

–আমার ও তোমার বাবা কি তাদের কারো একজনের ঘাড় মটকিয়ে দিতে পারেন না?

সাঈদ হেসে উঠে বললো– চুপ কর, বোকা কোথাকার। তাদের কাছে বন্দুক, রাইফেল, রিভলভার, বোমা, মেশিনগান আরো কত কি থাকে।

–রিভলভার, রাইফেল, আরো কত কি?

–হুঁ! তুমি নিজ চোখেই দেখতে পাবে।

পরের দিন খুব ভোরেই আমাদের রওয়ানা করতে হবে। আমাদের সামনে পুরো পাঁচ কিলোমিটার পথ। পায়ে হেঁটেই এ পথ অতিক্রম করে নিকটবর্তী রেলস্টেশনে পৌছতে হবে। আমাদের কাফেলা যাত্রা শুরু করলো। ছেলে–মেয়ে, ছোট–বড় সব মিলে এ কাফেলার সংখ্যা দুশেরও বেশী হবে। আমাদের সবারই ছিল খালি পা। শুধুমাত্র স্কুলে যাবার সময় ছাড়া আমরা জুতো পরতাম না। স্বাস্থ্যের বইয়ে যেসব সতর্কতার কথা থাকতো তার প্রতি প্রায়ই আমরা গুরুত্ব দিতাম না। বইয়ে লেখা থাকতো খালি পায়ে না চলার কথা। কারণ তার ফলে অনেক রকম রোগবালাই দেখা দিতে পারে এবং রোগ জীবাণু শরীরে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু আমাদের কাছে সে কথার অর্থ ছিল স্কুল চলাকালীন সময়েই কেবল জুতো পরতে হবে। তাছাড়া আমাদের জুতোই বা ছিলো কোথায়?

আমাদের নাজুক ও দুর্বল শরীরগুলো শেষ রাতের অন্ধকারেই হেলেদুলে চলতে শুরু করেছে। মাঝে মাঝে আমরা হাঁটতে যেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ছি। আমাদের কচি চোখের ভ্রুগুলো ঘুমের কবল থেকে মুক্তির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। রুমালে বাঁধা একটি রুটি ও এক টুকরো পনিরের একটি টোপলা আমাদের প্রত্যেকেরই হাতে ঝুলছে। কারণ সন্ধ্যার আগে তো আমরা ফিরতে পারবো না। আর 'গুরুশ' দু'টি আমার মা একটি নেকড়ায় শক্ত করে গেরো দিয়ে জামার আস্তিনের নীচে এমনভাবে বেঁধে দিয়েছেন যাতে কেউ সেটা দেখতে না পায়। আর বার বার আমাকে চোরের ব্যাপারে সতর্ক থাকার উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর বর্ণনা মতে, চোরেরা খুবই চালাক এবং চুরির ক্ষেত্রে অত্যন্ত পটু। এমন কি তারা মানুষের চোখের সুরমাও চুরি করতে পারে। আমাদের এ পীড়াদায়ক দীঘ ভ্রমণের জন্য আমরা কোন অভিযোগ করিনি অথবা কিছু মাত্র কষ্টও অনুভব করিনি। জীবনের কঠোরতা ও আমাদের প্রতি তার কৃপণতার কারণে আমরা সেদিন ব্যথিত হইনি। কারণ এরূপ সংগ্রাম ও ধৈর্য ধারণে আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমরা বরং সব সময় আমাদের প্রতি অসংখ্য নিয়ামতের জন্য আল্লাহর প্রশংসা করতাম। কারণ আমরা তো স্কুলে যেতে পারতাম। আমাদের সাথীদের অনেকেরই সে সৌভাগ্যটুকুও হতো না। সারাদিন তাদের কেটে যেত

গরু–গাধা চরিয়ে এবং ক্ষেতে বিরামহীনভাবে কাজ করে।

আল্লাহ আমার দাদীকে ক্ষমা করুন। তিনি আমার গাউনের হাতার ছেঁড়া জায়গায় বড় একটি তালি দিয়ে রেখে দিয়েছিলেন। আমার অন্তরে এ ব্যথাটি সব সময় খচখচ করে বিঁধতো। আমি সবচেয়ে বেশী পীড়িত হতাম যখন সে তালিটি দীনতা ও দারিদ্রের স্মারক হিসেবে নজরে পড়তো এবং আমার অপমান ও লজ্জার প্রতি ইঙ্গিতসূচক হয়ে দেখা দিত। আমি সে তালিটি ঢাকার জন্যে, এ অপমান থেকে মুক্তির জন্যে কতদিন কতভাবেই না কসরত করেছি! বিশেষ করে যেদিন হাসান ইবনে মুসা আবু আফার আমার কাছে আসে। আমাদের গ্রামে যুদ্ধের ডামাডোলে যারা ধনবান হয়েছিল সে তাদের একজন। সে আমার লেখাপড়ার উন্নতিতে সবসময় হিংসা করতো। বিদ্রুপের সুরে সে আমাকে বলেছিলঃ তোমার গাউনটি তো তালি মারা। ওটি পরতে তোমার শরম লাগে না?

কিন্তু উপায় ছিল না। এই একটি মাত্র গাউন ছাড়া আমার আর কোন গাউন ছিল না। আমার মা যখন সেটা ধুয়ে শুকাতে দিতেন আমি প্রায় বন্দীর মতন বাড়ীতে বসে থাকতাম। তারপর তিনি সেটা আমাকে পরিয়ে দিতেন আর আমি রাগে গরগর করতাম। তিনি তখন অত্যন্ত শান্তশিষ্টভাবে আত্মপ্রত্যয়ের সাথে আস্তে আস্তে বলতেন,

–এটা আল্লহ্‌র অনুগ্রহ। কত লোকের তো তোমার যা আছে তা–ও নেই। বেটা, গর্ব ও অহংকার সম্পদের ধ্বংস ডেকে আনে।

মিটগামার যাওয়ার সময় এই তালিটি আমার ব্যথা ও দুঃখকে অত্যন্ত প্রকট করে তুলেছিল। কিন্তু উপায় কি? আমার মা বলেনঃ যুদ্ধ। বাবা বলেনঃ যুদ্ধ। আর শায়খ হাফেজ শীহা তো সব সময় বলে থাকেনঃ যুদ্ধ এবং ইংরেজই হলো এ মুসিবতের মূল হোতা। তবে হিটলার একজন শরীফ ও মধ্যপন্থী লোক। ঠিক যেন হিটলার তার একজন নিকট আত্মীয়। আমরা সবাই ট্রেনের টিকিট কালেকটরকে সবসময় মুগ্ধ ও খুশি করার চেষ্টা করতাম। কখনো বা আমরা তাকে বলতাম, আমরা ছাত্র, ট্রেনের অর্ধেক ভাড়াও আমাদের দেয়া উচিত না। কখনো বা আমরা আমাদের মাথার ওপর থেকে টুপি বা কাপড় যা কিছু থাকতো সরিয়ে নিতাম, ছেলে–মেয়েরা যেমনটি করে থাকে, যাতে তার দৃষ্টিতে আমরা অল্পবয়সী বলে ধরা পড়ি। কিন্তু সে লোকটি অর্ধেক ভাড়া আদায়ের জন্য বিভিন্ন রকম বাহানা করতো, ভয় দেখাতো অথবা ব্যক্তি বিশেষের দোহাই দিত। তবে আমরাও জানতাম, এই ট্রেনগুলো আমাদের গাধাগুলোর মত বিনা ভাড়ায় চড়ার জন্য তৈরী করা হয়নি। বিনা ভাড়ায় ট্রেনে চড়ার অর্থই ছিল মিটগামারে দু'এক পয়সা খরচ করে কিছু মুখে দেয়া। সেখানে নানা ধরনের ফল, মিষ্টি ও তাজা রুটি পাওয়া যায়। সেসব আমাদের কালো শুকনো রুটি থেকে সব দিক দিয়ে আলাদা। আর তাই আমাদেরকে ভাড়া না দিয়ে ঝগড়া, বচসা ও বাহানার জন্যে বাধ্য করতো।

আমরা মিটগামারের নিকটবর্তী স্থানে পৌছলাম। পুলটির প্রবেশ মুখে লোকদের সাথে সমবেত হয়ে বললামঃ পুলটি পার হবার জন্য আমাদেরকে ছেড়ে দিচ্ছে না কেন?

আমার বন্ধু সাঈদ হাফেজ ভিতরের ব্যাপার সম্পর্কে তার বিদ্যা জাহির করে জবাব দিলঃ

–কিছুক্ষণ আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। এখন পার হওয়া নিষেধ। প্রতি দিন এ সময় পাল তোলা নৌকাগুলো পার হয়।

বললামঃ আমরা যখন পুলের ওপর দিয়ে চলবো, তখন নীচ দিয়ে নৌকাগুলো চলাচল করলেই তো পারে।

সাঈদ বললোঃ অসম্ভব।

কারো কোন পরোয়া না করে দ্রুত ধাবমান হলুদ রংয়ের একটি গাড়ীর বাঁশির শব্দ আমাদের দু'জনের কথার ছেদ টেনে দিল। খুব তাড়াহুড়ো করে মানুষজন সরে গিয়ে গাড়ীটার জন্য প্রশস্ত পথ করে দিল। পুলের গেটের চৌকিদার দৌড়ে গেল গেট খুলে দিতে এবং পাল তোলা নৌকার সামনে রাস্তা খালি করার জন্য কর্মরত লোকদের ইশারা দিতে। তারাও খুব তাড়াতাড়ি তাদের কাজ বন্ধ করে দিল। এরই মধ্যে অত্যন্ত ধীরগতিতে হলুদ গাড়ীটি এগিয়ে এলো। আমরা একটা ভীতি ও সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। সাঈদ আমার কানে ফিস্ ফিস্ করে বললোঃ

এই তোমার সামনেই এখন দু'জন ইংরেজ, ঐ দেখ হলুদ গাড়ীতে।

–এরাই ইংরেজ?

–হুঁ।

–বোমা–রাইফেল কই?

–রিভলভার প্যান্টের পকেটে, আর পেছনে বসা সৈনিকের হাতে রাইফেল দেখতে পাচ্ছ না?

–হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি।

–ওরা অসংখ্য গাড়ী এবং অস্ত্রেশস্ত্রে ভর্তি অনেক গুদামের মালিক।

–সাঈদ, তুমি ওদেরকে এত ডরাও কেন?

–সুলায়মান, ওরা সব কাফের। ওদের কলজে বড় শক্ত, ওদের কাছে মৃত্যু খুব সহজ ব্যাপার। আর ওদের কাছে অনেক অনেক অস্ত্র।

–আমরা ওদের মত অস্ত্র তৈরী করতে পারি না কেন?

–আমার বাবা বলে থাকেন, ওরা আমাদেরকে এ কাজ করতে বাধা দেয়।

–কিভাবে? কেন বাধা দেয়?

সাঈদ ঘাড় নেড়ে বিড়বিড় করে বললোঃ সেসব আমি জানি না।

হলুদ গাড়ীটি যেতে না যেতেই আমি পেছন দিক থেকে কাউকে জোরে জোরে বলতে শুনলামঃ

–কি মজা! একটি পয়সা দাও।

তারপরই হো–হো করে হাসির শব্দ। যেদিক থেকে শব্দটি আসছিলো, সেদিকে

তাকিয়ে দেখতে পেলাম একটি ছেলে। মাথার চুল উসকো–খুসকো। অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন শরীর। পোশাক তেলচিটচিটে। তার চারপাশে গুটিকয়েক সঙ্গী–সাথী। তারা আবার হাততালি দিয়ে মিষ্টি গলায় সুর দিয়ে কোরাস গাইতে লাগলোঃ বন্ধু হে, ও বন্ধু....

কিছুক্ষণ পর গেট খুলে দেয়া হলো। মানুষের হুড়োহুড়ির মধ্যে আমরাও ঢুকে পড়লাম। আমার বন্ধুরাও আমার সাথে চলছে আর মিষ্টি সুরের সেই গান শুনছে। কাঠের পুলের ওপরকার ধুলো–বালিতে নাকি পুলের উল্টো দিকের পিচঢালা পাথরের ওপরে তাদের খালি পাগুলোর পতনের শব্দ যেন অনুরণিত হয়ে ফিরছে। একটার পর একটা ইংরেজদের গাড়ীগুলো ছুটে চলেছে। প্রতিটি স্থানই যেন ইংরেজে ভরে গেছে এবং প্রতিটি ছিদ্রপথই তারা বন্ধ করে দিয়েছে।

আমি আমার চারপাশের অবস্থা দেখে হতবাক হচ্ছিলাম এবং আমার মাথায় অসংখ্য প্রশ্নবোধক চিহ্ন আঁকছিলাম। আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে সে সব প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব খুঁজে হয়রান হয়ে যাচ্ছিলাম।

আমি নিজেকেই জিজ্ঞেস করলামঃ কীভাবে ইংরেজরা আমাদের এ দেশটিকে নিজেদের দেশ বানিয়ে নিল? তাদেরকে দেখে আমরা ভীত ও শংকিত হই কেন? তারা বিদেশী আর আমরা হলাম দেশের মালিক। হিটলারের মত সাহসী কি আমরা হতে পারি না? হিটলারই পারেন তাদেরকে তাড়াতে এবং ধ্বংসের স্বাদ চাখিয়ে দিতে। এমনটিই আমরা শুনেছি শায়খ হাফেজের মুখ থেকে। যিনি সব সময় পত্র–পত্রিকা ও ম্যাগাজিন পড়ে থাকেন। সত্যিই হিটলার সম্মান লাভের উপযুক্ত যদি তিনি ইংরেজদের সাথে তাদের এত সব অস্ত্রশস্ত্র, ভীতিপ্রদ চাহনি ও লালমুখো চেহারা সত্ত্বেও–তাদের সাথে লড়তে পারেন।

আমি স্কুলে, রাস্তা–ঘাটে ও শায়খ হাফেজের কাছ থেকে শুনেছিঃ ইংরেজ ও যুদ্ধ–এ দু'টিই হলো সব মুসিবত, ক্ষুধা–দারিদ্র ও অর্থনৈতিক টানাটানির মূল কারণ। যার আবর্তে পড়ে দেশ ও জাতি নাকানিচুবানি খাচ্ছে। আমি বুঝতে পারি কথাটি সত্যি কিন্তু কেমন করে যে তা হচ্ছে, তার ব্যাখ্যা আমার জানা নেই। আসল কথা হলো, আমার ভিতর থেকে কেউ যেন জোর দিয়ে বলছে, এটাই সত্য। আর আমিও আত্মপ্রত্যয়ী যে, আমার বিশ্বাসই সঠিক। তা যদি না হবে তাহলে মুস্তফা কামিল, সা'দ যাগলুল প্রমুখের ন্যায় ব্যক্তিবর্গ এ ইংরেজদের সাথে এমন বিরামহীন সংগ্রাম ও যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন কেন? সুতরাং ইংরেজরাই হলো দুর্ভাগ্যের মূল ভিত্তি। ক্ষুধা ও বঞ্চনা সকল মুসিবতের উৎস। এভাবে আমরা মিটগামারের রাস্তায় এসে পড়লাম। বললামঃ সাঈদ সাঈদ দেখ, কতসব সুন্দর সুন্দর দালান–কোঠা, এগুলো কি ঐ সব খাদ্যশস্যের গুদাম– যে শস্য আমাদের কৃষকদের কাছ থেকে প্রতি বছর কেড়ে নিয়ে ইংরেজদের খাওয়ানোর জন্য জমা করে রাখা হয়?

সাঈদ উচ্চস্বরে হেসে উঠলো এবং কিছুটা আত্মতৃপ্তি ও অহংকার অনুভব করলো। ওর হাসির কারণ আমার মূর্খতা ও সরলতা। আমি ধারণা করলাম, এই বার সে আমাকে বলদ ও বোকা বলে সম্বোধন করবে। সে বললোঃ

–এগুলো লুকোবার স্থান। বুঝেছো? লুকোবার স্থান!

–তা ঠিক, হামলার সময় মানুষ এখানে এসে লুকাবে যাতে হিটলারের বোমা থেকে বাঁচতে পারে।

–আশ্চর্য! আমরা হিটলারের কি এমন ক্ষতি করেছি যে, আমাদের উপর বোমা বর্ষণ করবে?

–আমার বাবা যেমনটি বলে থাকেন, আসলে হিটলারের উদ্দেশ্য হলো, ইংরেজদেরকে ভালো মত পিটুনি দেওয়া। কিন্তু তারা তো আমাদের দেশে, আমাদের মাটিতে আনাচে–কানাচে ছড়িয়ে রয়েছে। বেচারা হিটলার কি করবে?

–তাই বলে অপরাধী ও নিরপরাধ দু'জনকেই মারবে?

–আমরাও অপরাধী।

–কি বললে?

–অবশ্যই। কারণ ইংরেজদেরকে আমরা আমাদের দেশে থাকার সুযোগ দিয়েছি, আমাদের গম থেকে তাদেরকে খাওয়াচ্ছি এবং তাদের সকল প্রয়োজনই তো আমরা পূরণ করে দিচ্ছি।

–আমরা তা করছি কেন?

–তোমাকে আমি একবার বলেছি, আমি জানি না। আমার বাবা এ ধরনের কথা বলে থাকেন। আর আমার জানা এতটুকুই Bilharzia ও Anbylostomiasis হাসপাতালটি মিটগামার শহরের দক্ষিণে একটি কৃষিপ্রধান অঞ্চলে। চারদিকে কাঠের প্রাচীর ঘেরা। ভেতরে কৃষকদের প্রচন্ড ভিড়। তাদের সবারই চেহারা বড্ড মলিন, যা তাদের দারুণ রক্তস্বল্পতার কথাই প্রকাশ করছে। অন্যদিকে ইংরেজদের চেহারাগুলো যেন আঙ্গুরের মত রসে টসটস করছে। অত্যধিক রক্ত ও লাল বর্ণের কারণে এখনই যেন তাদের গা থেকে রক্ত ফেটে বের হবে। কৃষকদের জীর্ণ–শীর্ণ সবুজ পোশাক, ফাটাচেরা খালি পা, দুর্বল হালকা–পাতলা শরীর, Bilharzia রোগ এমনভাবে কুরে কুরে খেয়ে ফেলেছে যেমন আগুন শুকনো ঘাসপাতা খেয়ে ফেলে। ফোলা–ফাঁপা পেট, যা সকল রোগের ডিপো এবং রোগে ফোকলা করে ফেলেছে। এ অবস্থা দেখেই বোঝা যায়, তারা প্রত্যেকেই এখান থেকে ওষুধ নিয়েই দ্রুত ক্ষেতে চলে যায় এবং খালের পানিতে পা দু'খানি বিছিয়ে দিয়ে শুষ্ক কঠিন হাতে হাতচালিত সেচ মেশিনের হ্যান্ডেলটি ধরে ঘন্টার পর ঘন্টা ঘোরাতে থাকে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই Bilharzia নতুন করে দেখা দেয়। মনে হয়, তার কোন চিকিৎসাই হয়নি।

আমার আজও মনে আছে সেই বিরাট বপুধারী সাদা জ্যাকেট পরা নার্সটির কথা। দীর্ঘ দৈহিক কাঠামোটির শীর্ষে তার লাল চুড়াওয়ালা টুপিটি শোভা পেত। পাকানো গোঁফ জোড়া একটা আত্মম্ভরিতা ও গর্বের ভাব ফুটিয়ে তুলতো। তার সেই দৃশ্যটি আমি কখ্খনো ভুলবো না। সে তার কাঠের জানালাটির ফোকর দিয়ে পিটপিট করে তাকাতো এবং হেঁড়ে গলায়

রোগীদের প্রতি এ শব্দগুলো ছুঁড়ে দিত– 'ওরে জানোয়ারের দল এদিকে আয়, এদিকে এসে পড়া শোন'। আমরা সকলে হুড়মুড় করে ছুট দিতাম এবং নির্দেশিত পড়বার জায়গাটিতে পৌছানোর জন্যে প্রতিযোগিতায় নেমে যেতাম।

কখনো আমরা একটু অলসতা করলে নার্সের হাতের ছড়িটি আমাদের মধ্যে শক্তি ও তেজ এনে দিত। আমার মাথায় সব সময় এ প্রশ্নটি ঘুরপাক খেত, 'এই ইংরেজ ও নার্সটির মধ্যে কি কোন সম্পর্ক আছে? নিশ্চয় তার ও ইংরেজদের মধ্যে বড় ধরনের কোন সম্পর্ক আছে, আর সেটা দিবালোকের মতই স্পষ্ট। এটা কি সেই হাসপাতাল, যেখান থেকে স্নেহ ও করুণার ধারা প্রবাহিত হয় এবং মানুষের দুঃখ–কষ্ট লাঘব করে? যার কথা আমরা স্কুলে শিখেছি?' এ ধরনের আরো নানা রকম প্রশ্ন।

আমি বুঝতাম স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বিষয়টি হলো পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতা। কিন্তু আমার নিজের কাছে যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশী বিরক্তিকর ছিল তা হলো, যখনই আমি হাসপাতালের বাথরুমগুলোতে ঢুকতাম, তখন সেখানে খোলা ময়লা–আবর্জনা এখানে–সেখানে এমন বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখতে পেতাম যে, গ্রামাঞ্চলে আমাদের গরু–ঘোড়ার গোয়াল ও খোঁয়াড়গুলোতেও কখনো দেখিনি।

দিনশেষে ক্লান্ত পদে থপথপ করে হেঁটে আমরা ফিরে গেলাম। এমনটি হয়েছিল হেঁটে হেঁটে দীর্ঘ ভ্রমণজনিত শ্রান্তির কারণে। গ্রামের রাস্তায় আমাদের পাগুলো নতুন করে পাথর ও টিলার সাথে টক্কর খেতে শুরু করলো আর ঠিক তখনই আমাদের মিটগামারের সড়কগুলোর মসৃণতার কথা মনে পড়তে লাগলো। বিশেষত আল–মুয়াহিদা সড়কটির কথা, যেটি ইংরেজরা নিজেদের চলাচলের জন্য বিশেষভাবে তৈরী করেছে। আমাদের অধঃপতিত গ্রামের রাস্তাগুলোর সাথে শহরের রাস্তাগুলোর তুলনা করতে পারলাম। কিন্তু আমাদের এ কাজ বেশীক্ষণ চললো না। শায়খ হাফেজ শীহার স্বভাবসুলভ ধমকি আমাদের এ তুলনায় ছেদ এনে দিল। তিনি রাজনীতির ব্যাপারে ধমকি দিচ্ছেন, পত্র–পত্রিকায় তার পঠিত সংবাদের ওপর টীকা–টিপ্পনী কাটছেন, খুব গর্ব ও আত্মতৃপ্তির সাথে হিটলারের রণকৌশল এবং বিভিন্ন ফ্রন্টে বিজয়ের প্রশংসা করছেন।

–আমি মহান আল্লাহর নামে কসম করে বলতে পারি, হিটলার এ অভিশপ্ত ইংরেজদের ওপর বিজয়ী হবে। তাদেরকে সে শত তালি দেয়া ছালার চট পরিয়ে ছাড়বে এবং তাদেরকে এমন শিক্ষাই দেবে, যা চিরকাল মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

–শায়খ হাফেজ, আমি মান্নত মানলাম, যেদিন হিটলার বিজয়ী হবে, সেদিন আমি মুসল্লীদের খাসি জবেহ করে খাওয়াবো এবং মানুষের মধ্যে শরবত বিতরণ করবো।

আমরা শায়খ হাফেজের বাড়ীতে এ আলোচনা শুনতে শুনতে আমাদের বাড়ীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, পথের মাঝখানে ছোট্ট মিষ্টি মেয়ে 'বাসীমা' আমাদের দেখে খুশিতে বাগবাগ হয়ে অত্যন্ত মধুর স্বাগতম জানালো,

–হামদান লিল্লাহ আলাস সালামাহ্– তোমাদের ভালোয় ভালোয় ফিরে আসায়

আল্লাহর প্রশংসা।

তার ভাই সাঈদ তার সাথে কুশল বিনিময় করলো। তবে স্বভাবসুলভ রুক্ষতার কারণে তার দিকে সে একটু চোখ তুলেও তাকালো না। কিন্তু আমি তার প্রতি স্নেহ ও ভালোবাসা প্রকাশ করে একটু হেসে উঠে বললাম,

–বাসীমা, আল্লাহ তোমাকে সহীহ সালামতে রাখুন।

–আমাদের জন্য কিছু মিষ্টি আনেননি?

–ইনশাআল্লাহ, পরের বার আনবো। আমার কথা শুনে তার চেহারাটা একটু কালো হয়ে গেল এবং রাগের সুরে বললো– আমি আপনার কাছে কিছুই চাচ্ছি না।

–কি বললে? তুমি রাগ করলে? তুমি তো জান আমরা যে দু'টি পয়সা নিয়ে গিয়েছিলাম তা তো ট্রেনের ভাড়া দিতেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু বাসীমা যে তার জীবনের মাত্র বারোটি বসন্ত পেরিয়ে এসেছে, সে আমাদের কোন কথা শুনতে রাযী নয়। এমন কি আমাদের যুক্তি–তর্কেরও কোন গুরুত্ব তার কাছে নেই। সে শুধু জানে, আমরা মিটগামার গিয়েছিলাম এবং সেখানে ফল, মিঠাই ও আরো অনেক কিছু পাওয়া যায়। আমাদের কর্তব্য হলো, তার জন্য কোন কিছু নিয়ে আসা– তা সে রঙ্গিন কিছু কাগজ, সবুজ, লাল কাপড়ের কিছু টুকরা অথবা গ্লাসের কিছু ঢাকনা যাই হোক না কেন। আমি অত্যন্ত দরদের সাথে তার মাথায় হাত রেখে একটু নরম সুরে বললাম,

–বাসীমা, তোমাকে আমি কথা দিচ্ছি আগামী পরশু তুমি যা চাও তাই আমি এনে দেব–ইনশাআল্লাহ।

সাথে সাথে একটি মিষ্টি হাসিতে তার মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো এবং একটা আকর্ষণীয় আশার আলো মুহূর্তে তার সমস্ত অবয়বে ঝিলিক দিয়ে গেল। আশা এমন একটা জিনিস যে, আমরা সবাই তো তাই নিয়েই বেঁচে আছি। বাসীমা আমার একখানি হাত ধরে আমার সাথে সাথে আমাদের বাড়ীতে চললো। আমার অন্তরে তখন নানা ধরনের মিশ্র অনুভূতি ও চিন্তার ঢেউ বয়ে চলেছে। তার বিরাট একটি অংশ বাসীমাকেই কেন্দ্র করে। এমন সময় আমার মা আমাকে দেখে দু'টি বাহু আমার দিকে প্রসারিত করে দিয়ে বললেন,

–আহলান সুলায়মান সোনা মানিক আমার, ফিরে এসেছিস? আমার কলিজার টুকরা, একটু আমার কাছে এসে বিশ্রাম নে বেটা!

বাসীমা আমার আগেই মার বুকের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আমাদের দু'জনকেই অত্যন্ত দরদের সাথে জড়িয়ে ধরলেন তিনি এবং অনেকক্ষণ ধরে আমাদের দু'জনের গালে চুমুতে চুমুতে ভরে দিলেন। তারপর আমার পা দু'খানি টেনে নিয়ে তাঁর ঘামে ভেজা হাত দিয়ে ধূলোবালি ও ময়লা সাফ করতে করতে বললেন– বেটা, তুমি নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছো।

–মোটেও না। ভ্রমণটা খুবই মনোরম ছিল মা। আমরা অনেক ইংরেজ দেখেছি।

–বেটা, একটু সহ্য কর। সবুর করা ভালো। ভবিষ্যতে তুমি অনেক বড় অফিসার হবে

এবং জীবনকে উপভোগ করতে পারবে। সারা জীবনই তুমি তোমার আশা পূরণ করবে।

আমার কল্পনায় তখন ভেসে উঠছে দামী চশমা চোখে আঁটা হাসপাতালের ডাক্তারের ছবি, গলায় ঝোলানো তাঁর চোখ ঝলসানো টেথিসকোপটি, যেন তা সম্মান ও গৌরবের একটি হারের ন্যায় কণ্ঠে শোভা পাচ্ছে এবং তাঁর চাবির রূপালি চেইনটি। সেটা তিনি সব সময় আঙ্গুলে পেঁচাতে থাকেন এবং মোলায়েম ও আকর্ষণীয় ভাষায় আমাদেরকে বোঝান Belhargia রোগ, তার কারণ, সংক্রমণ এবং যাতে আমরা দ্রুত এই রোগ থেকে সুস্থ হতে পারি সেজন্য আমাদের খাদ্য-খাবারের প্রতি গুরুত্ব প্রদানের প্রয়োজনীয়তা। কৃষকরা তাঁর সামনে মাটিতে নীরবে বসে বসে এমনভাবে তাঁর কথা শোনে যেনো তাদের প্রত্যেকের মাথার ওপর পাখি বসে আছে। তাঁর কথার কোন কিছু না বুঝেই মাঝে মাঝে তারা মাথা নেড়ে সায় দেয় এবং তাদের শুকনো রুটির পুটলিটি তখন বাজুতে ঝুলতে থাকে। আমার মানসপটে আরো ভেসে উঠছে সেই নার্সটির ছবি, যার গোঁফ জোড়া দড়ির মত শক্ত করে পাকানো। সে তার পাজি ছড়িটি নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে এবং বকের মত সাদা জ্যাকেট ও মিচমিচে কালো জুতো পরে মন্থরগতিতে এগিয়ে আসে।

এ তিনটি ছবিই আমার চোখের ওপর ভেসে উঠতো। চিন্তা করতাম ভবিষ্যতে আমি এর কোন্‌টি হবো-ডাক্তার, নার্স, না কৃষক? যে কৃষকদের প্রকৃতিগত নিষ্কলুষ চোখ, উস্‌কো-খুস্‌কো দাড়ি এবং সূর্যের কিরণ ও দীর্ঘ কষ্টদায়ক শ্রম যাদের গায়ের চামড়া ব্লাকবোর্ডের মত কালো ও শক্ত করে দিয়েছে, সেই কৃষকই কি হব আমি?

২

আমাদের সংসারের সদস্য সংখ্যা সাত জনের বেশী ছিল না। আমার দাদী, আব্বা, আম্মা, ছোট দু'টি ভাই-বোন-লায়লা ও মাহমুদ, চাচা ফরীদ ও আমি।

আমাদের প্রতিবেশী শায়খ হাফেজ শীহার সংসারে ছিল তাঁর চল্লিশ বছর বয়সের এক বিধবা বোন। তাছাড়া আরো ছিল তাঁর স্ত্রী 'খাদরা', সাঈদ ও বাসীমা।

শায়খ হাফেজের জীবনে একটি সরস কাহিনী আছে। সম্ভবত সে কাহিনী তাঁর ব্যক্তিত্বের বহুবিধ দিকের মধ্যে একটি দিক আমাদের সামনে উন্মোচন করে দেয়। শায়খ হাফেজকে ইংরেজদের এক নম্বর শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করা হতো। একথা সত্যি, আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে তাদের প্রতি একটা পবিত্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত ছিল। কারণ তারা আমাদের রাজনীতি ও অর্থনীতির অঙ্গনে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে এবং নৈতিকতা ও মূল্যবোধকে বিকৃত করে একটা কুৎসিত কন্টকাকীর্ণ পথের দিকে আমাদেরকে পরিচালিত করেছে। তবে শায়খ হাফেজ ছিলেন ক্রোধ ও উত্তেজনায় উত্তপ্ত বারুদের মত। তাঁর

মুদিখানায়, গৃহে, গ্রামের বাজারে যেখানে তিনি তার পণ্য বিক্রি করতেন অথবা অন্য যে কোন স্থানে সর্বত্রই তিনি যেমন ইংরেজদের গালাগালি ও অভিশাপ দিয়ে মনের ঝাল মেটাতেন পক্ষান্তরে তেমনিভাবেই হিটলারের গুণগান ও মহত্ত্ব প্রকাশ করতেন। তার জন্যে আমরা তাঁর ছেলে সাঈদ ও মেয়ে বাসীমাকে শায়খ হাফেজ হিটলারের সন্তান বলে সম্বোধন করতাম। তারা দু'জনই লজ্জা ও বিরক্তি অনুভব করতো।

তিনি সব সময় তাঁর পকেটে কোন না কোন একটি পত্রিকা ঢুকিয়ে নিয়ে চলাফেরা করতেন। তাঁর সম্পর্কে কিংবদন্তী আছে যে, কোথাও কোন একটি পত্রিকা পেলে সেটা আগাগোড়া তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তেন। কিন্তু যখন কোন নতুন পত্রিকা তিনি হাতের কাছে না পেতেন, তখন পুরনো পত্রিকার বান্ডিলই উল্টাতে শুরু করতেন। এভাবে তিনি পুরনো পত্রিকার স্তূপ ঘেঁটে জার্মান ডিক্‌টেটরের বিজয় সম্পর্কে কোন একটি বাসী খবর বের করে আনতেন এবং তা দুই, তিন অথবা চারবার করে পড়তেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে মাথা ঘামাতে সহায়তা করে তার উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা, জাগ্রত অনুভূতি। তানতার জামে আল-আহমাদী মাদ্রাসায় তিনি প্রায় তিন বছর অতিবাহিত করেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি কুরআনে করীমের সাথে সাথে ফিকাহ ও শরীয়াতের হুকুম-আহকামের অনেক কিছুই হিফয করেন।

অনেক সময় তাঁর স্ত্রী বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়ে একথা বলতে বলতে বেরিয়ে আসতেনঃ

-শায়খ হাফেজ, তোমাকে কিসে পেয়েছে? হিটলার ছাড়া তোমার কি আর কোন চিন্তা নেই? পুরুষ মানুষের এভাবে বসে থাকলে কি করে চলে? যাও, এক লোকমা খাবার জোটে এমন কিছু কর।

শায়খ হাফেজের মধ্যে পৌরুষ ও আত্মমর্যাদা বোধটি ছিল খুবই টনটনে। স্বামীর কোন ব্যাপারে স্ত্রীর নাক গলানোটাকে তিনি সীমালংঘন, বেআদবী এবং সম্মান ও সাহসিকতার পরিপন্থী বলে মনে করতেন। তিনি তাই গালিগালাজ করে স্ত্রীর চৌদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করতেন, বাঘের মত হুংকার ছেড়ে বলতেন,

-অকাট হস্তিমুর্খ, মুখ বুঁজে বসে থাক, হিটলার আর রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাতে যাও কেন? আমার এ গাউন ও পাগড়ী পরে আমার এ আসনে বসা ছাড়া তোমার আর কিছুই বাকী নেই। বেয়াদব কোথাকার।

তাঁর সাথে বসা লোকেরা তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করতো। কিন্তু কিছুতেই তিনি শান্ত হতেন না। যতক্ষণ না তিনি তাঁর স্ত্রীকে স্ত্রীর কর্তব্য এবং তাঁর পৌরুষ ও মর্যাদার সম্মান বিষয়ক কিছু কঠিন শিক্ষা দিতে না পারতেন, ততক্ষণ শান্ত হতেন না।

প্রথম প্রথম সাঈদ ও বাসীমা তাদের মা-বাবার এ কান্ডকারখানা দেখে দারুণ লজ্জা অনুভর করতো। কিন্তু দীর্ঘদিন বার বার একই দৃশ্য দেখে দেখে তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। পরে আর তারা তেমন কিছু অনুভব করতো না। আমি বলি, শায়খ হাফেজের জীবনে এমন

একটি অভিনব কাহিনী আছে যা তাঁর ব্যক্তিত্বের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক প্রকাশ করে দেয়। তাঁর মরহুম পিতা ছিলেন একজন খাঁটি মিসরী এবং খিদীব তাওফীক পাশার সেনাবাহিনীর প্রাক্তন অফিসার। আহমাদ আল–আরাবীর বিপ্লবের সময় মিসরীয় জনগণ ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে রক্তাক্ত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তাতে তিনি আল–আরাবীর পাশাপাশি থেকে অংশগ্রহণ করেন। খিদীব তাওফীক পেছন দিক থেকে এ বিপ্লবকে ছুরিকাঘাত করেন। ফলে ইংরেজরা আমাদের মাতৃভূমিতে সরাসরি প্রবেশের এক প্রশস্ত ছিদ্রপথ পেয়ে যায়। তারা মানুষকে বুঝ দিতে থাকে যে, এদেশে তাদের উপস্থিতি সাময়িক, তারা এসেছে কেবলমাত্র খিদীব তাওফীককে সহায়তা দিতে, আইন–শৃংখলা পুনপ্রতিষ্ঠা এবং বিদ্রোহী ও বিপ্লবীদের নির্মূল করতে। এছাড়া তাদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই।

এ ভাবে তারা খুব তাড়াতাড়ি আদালত গঠন করে বিপ্লবী ও বিপ্লব সমর্থকদের বিচার কাজ সমাধা করে। তারা কাউকে দেয় মৃত্যুদন্ড, কাউকে কারাদন্ড এবং কাউকে দেশ থেকে নির্বাসন করে। শায়খ হাফেজ শীহার পিতা কোনভাবে প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হন এবং গোপনে কায়রো থেকে পালিয়ে আমাদের গ্রামে এসে আশ্রয় নেন। গ্রামের লোকেরাও হৃষ্টচিত্তে তাঁকে আশ্রয় দেয়। কিছুদিন পর তিনি এখানে বিয়ে করে ঘর বাঁধেন। তাঁর এ স্ত্রীর গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেন শায়খ হাফেজ এবং পূর্বে উল্লিখিত তাঁর বিধবা বোনটি। তিনি তাঁর প্রথমা স্ত্রী ও সে পক্ষের সন্তানাদিকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে চলে আসেন কায়রো নগরীতে।

এভাবে পরিস্থিতি বাধ্য করে এ লোকটিকে অর্থাৎ শায়খ হাফেজের পিতাকে একটা দীর্ঘ সময়ের জন্য মানসিক অশান্তি, আত্মগোপন ও ভয়–ভীতির মধ্য দিয়ে কাটাতে। ক্ষান্তরে ইংরেজদের লেজুড়বৃত্তি ও তোষামোদকারী বিশ্বাসঘাতকদের ভাগ্যে অর্জিত হয় প্রাচুর্য, প্রশস্ততা ও উঁচু পদ ও পদবী। আর আহমাদ আল আরাবী ও কবি আল–বারুদী সাগর বক্ষের একটি দ্বীপে নির্বাসিত হয়ে দুঃসহ একাকীত্বের মধ্যে অতিবাহিত করেন তাঁদের জীবনের একটি দীর্ঘ সময়।

তাহলে দেখা গেল, এই ইংরেজরাই শায়খ হাফেজের পিতার জীবনে ডেকে আনে ধ্বংস ও ভবঘুরেপনা। অন্যদিকে নির্বোধ ও বিশ্বাসঘাতকদের এ উন্নতি এবং বুদ্ধিমান, স্বাধীনচেতা ও অগ্রগামী নেতাদের আত্মাহুতি ও বিতাড়নের মূল কারণও তারা।

তাই ইংরেজদের প্রতি তাদের ঘৃণা কয়েকগুণ বেশী হওয়াটা বিস্ময়কর কিছু নয়। তাঁর এ ঘৃণা তাঁকে এ পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে, কোন ব্যক্তি তাদের যুলুমের বদলা ও প্রতিশোধ নিলে তিনি তার জয়গান গাইতেন– তা সে ব্যক্তির দেশ বা জাতি যাই হোক না কেন, হোক না সে হিটলার। হয়তো হিটলার নিজেই একজন উপনিবেশবাদী, একেবারে ইংরেজদের মতই। কিন্তু শায়খ হাফেজ তাঁর মাথা থেকে ঐসব ঘোর–প্যাঁচ একেবারে দূরে সরিয়ে রাখতেন।

তাঁর মনে এরূপ একটি বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছিল যে, ইংরেজদেরকে একটা নোংরা শাস্তির স্বাদ চাখাবার উদ্দেশ্যেই খোদ আল্লাহ তাআলাই হিটলারকে পাঠিয়েছেন। তাছাড়া

মানুষের প্রোপাগান্ডার যুক্তি ও বিশ্বাসও এমন ছিল যে, হিটলার হচ্ছে ঔপনিবেশিক দাসত্বের জিঞ্জির থেকে বিভিন্ন জাতির মুক্তির আহবায়ক এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে ইসলামকে ভালোবাসেন ও ইসলামের দিকেই তার ঝোঁক এবং আরবদের প্রতি একটা ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের অনুভূতি তার মধ্যে বিদ্যমান। আর এসব কিছুই শায়খ হাফেজের মনে হিটলারের প্রতি সুধারণা ও গভীর বিশ্বাসের সৃষ্ট করে। আর এ থেকেই জার্মান বাহিনীর যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর হৃদয়ে একটি সংগীতের জন্ম হয় যা তিনি সর্বত্র গেয়ে বেড়াতেন।

শায়খ হাফেজ তাঁর চারপাশে গ্রামের এমন কিছু লোককে জড় করতে সক্ষম হন যারা বিশ্বাস করতো, তিনি যা বিশ্বাস করতেন এবং তারা সকলেই ছিলেন হিটলার–প্রেমে গদগদ। এদের মধ্যে ছিলেন গ্রামের মকতবের দীনিয়াতের অন্ধ শিক্ষক শায়খ সালামা, গ্রামের কবিরাজ আলহাজ্জ আবদুস সাত্তার, আমার চাচা ফরীদ, ওজনদার যাকী, অভিযোগ ও ফারায়েজ লেখক উসমান তারতুরী ও আরো অনেকে।

শায়খ হাফেজ তাঁর সঙ্গীদের সাথে বসেছিলেন। সহসা তিনি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং একটা গভীর হতাশা ও দুঃখের সাথে মাথা ঝাঁকালেন। তা দেখে শায়খ উসমান তারতুরী ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করলেনঃ

–শায়খ হাফেজ, আপনার কি হয়েছে?

–আল্লাহর কসম, উসমান! দুঃখ এবং ব্যথা আমার ওপরে, আমার নীচে....।

–এত ব্যথা কিসের?

–তুমি চিন্তা করে দেখ, সকল আরব দেশই সর্বান্তকরণে ইংরেজদের ঘৃণা করে, তা সত্ত্বেও তারা সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাদের পক্ষে যুদ্ধ করছে। গোটা জীবনই যেন একটা অপমান ও মোনাফেকী এবং আমাদের অন্তরের সাথে একটা খিয়ানত।

–আমরা তাহলে কি করতে পারি শায়খ হাফেজ?

–সমগ্র আরব বিশ্বে ইরাকী বীর রশীদ আলী আল–কিলানী ও মিসরী বীর আযীয মিসরীর মত মাত্র পাঁচ জন বীর যোদ্ধা যদি থাকতো, তাহলে ইংরেজরা আমাদের ছাগলের মত যুদ্ধের ময়দানে ঠেলে নিয়ে যেতে পারতো না। তারা পারতো না এমনভাবে আমাদের ভূমি ও বিমান বন্দরগুলোকে দখল করে নিতে, এমন কি এমন নগ্ন ও অসহায়ভাবে তারা আমাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতেও সক্ষম হতো না।

–রশীদ আলী আল–কিলানীর পরিণতি কি হয়েছিল?

–বন্ধু, জয়–পরাজয়ের বাহ্যিক মাপকাঠি বড় কথা নয়। কথা হলো, ইরাকে কিছু ব্যক্তি এমন আছেন, যাঁরা মুক্তি ও স্বাধীনতায় বিশ্বাসী এবং সকল ভয়–ভীতি উপেক্ষা করে সত্য কথাটি বলে ফেলেছেন। আর এ হচ্ছে মঙ্গল ও কল্যাণের সূচনা। তারপর সেখানে এমন একদিন আসবে যেদিন সকল বিপর্যয় ও গাদ্দারীর অবসান হবে।

–আল্লাহর কসম, শায়খ হাফেজ! আমার মন কী বলে জানেন? আমার মন বলে,

আযীয আল–মিসরীর জীবনটি বন্দীদশাতেই কেটে যাবে এবং রশীদ আলী এক শহর থেকে অন্য শহরে ভবঘুরে হয়ে জীবনটি কাটিয়ে দেবে। পক্ষান্তরে আরব বিশ্বের এসব রাজা–বাদশাহ্ ও নেতৃবর্গ যারা দাবী করে যে, তারা মিত্রশক্তি ও মুক্তবিশ্বের সাথে আছে, করের অতিরিক্ত বোঝায় তাদের মেরুদন্ড বেঁকে যাবে এবং ঢাকের কাঠি সব সময় তাদের কানে খটখট আওয়াজ করতে থাকবে।

–সত্যিই অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার।

–অথচ তাদের স্থান হলো সবার আগে। জনগণের ভবিষ্যত ও পরিণতি গচ্ছিত রাখার জন্য তারাই সবার চেয়ে উপযুক্ত।

শায়খ হাফেজ কিছু বলতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু মাঝখানে তাঁর স্ত্রী বাধ সাধলেন। তিনি আবির্ভূত হলেন ক্রোধমিশ্রিত চেহারা এবং বিদ্রোহ ও আক্রমণের ছাপমারা দু'টি চোখ নিয়ে। শায়খ হাফেজ তাঁকে এবং তিনিও শায়খ হাফেজকে কোন কথা বলতে পারলেন না। ধীরে ধীরে একটা বিষাদের ছাপ তাঁর চেহারায় ফুটে উঠলো এবং একটা গভীর দুঃখ ও ব্যথায় তাঁর মাথাটি নীচু হয়ে গেল। এমন অভ্যাস শায়খ হাফেজের কখনো ছিল না। তাঁর এই আকস্মিক আত্মসমর্পণের কী এমন কারণ ঘটেছিল বলে তুমি মনে কর? তিনি কান লাগিয়ে 'খাদরা'র কথা শুনতে লাগলেন, যার প্রত্যেকটি শব্দ যেন হাতুড়ির পিটুনির মত মাজার ওপর পড়ছিল। তাঁর বন্ধুদের থেকে দূরে দাঁড়িয়ে তিনি বলছিলেনঃ

–এই যে, মিনসে, তোমার লজ্জা করে না? তোমার ঘরে একটি রুটি নেই, এমন কি গম বা ভুট্টার একটি দানাও নেই। আমি ছেলে–মেয়েদের পত্রিকা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাওয়াবো, না হিটলার তাদের জন্য রাতের খাবার দিয়ে যাবে?

শায়খ হাফেজ মাথাটি একটু দুলিয়ে হাতের পিঠ দিয়ে থুত্‌নিতে ঠেস দিলেন এবং এ কথাটি ছাড়া তিনি আর কিছুই বলার পেলেন নাঃ

–খাদরা, আল্লাহ এক ব্যবস্থা করবেন।

–সারা শহরে খাদ্যশস্যের একটি দানাও কিনতে পাওয়া যাচ্ছে না। অন্য কোনভাবে তালাশ কর, অথবা নিকটবর্তী কোন বাজারে যাও, সেখানে দু'এক কিলো দানা পেলেও পেতে পার।

–ইন্‌শাআল্লাহ।

–লজ্জা, শায়খ হাফেজ লজ্জা! মানুষ সব সময় অন্যের বাড়ীর দিকে হা করে তাকিয়ে থাকে। এ কথা বলতে বলতে কান্নায় তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এলো, ক'ফোঁটা অশ্রু তাঁর চেহারায় গড়িয়ে পড়লো। ধরা গলায় তিনি বললেনঃ

–তুমি আমাকে মাফ করে দিও, আল্লাহ তোমাকে মাফ করবেন এবং আমাকে শত্রুদের উল্লাসের বস্তুতে পরিণত করো না।

–খাদরা, কেঁদো না। শিগগিরই আমি তোমার প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে আসছি।

শায়খ হাফেজ তাঁর সবটুকু সাহস একত্র করলেন এবং স্ত্রীকে এ আশ্বাস দিয়ে ফিরিয়ে

দিলেন যে, শিগগিরই তিনি যা চাচ্ছেন তা নিয়ে আসবেন। তারপর তিনি যখন মজলিসে ফিরে এলেন তখন ঠান্ডা ঘামে তাঁর মুখমন্ডল ভিজে গেছে, তাঁর দু'টি চক্ষু-কোটরে অশ্রুবিন্দু টলমল করছে। ফিরে এসে তিনি গভীর নীরবতায় নিমগ্ন হলেন এবং উদাস দৃষ্টিতে এক দিকে তাকিয়ে রইলেন। তখন তাঁর অন্যান্য সঙ্গীরা নানান কথার সূত্র ধরে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিল।

"তাঁর পিতা যদি মহান মূল্যবোধ ও অন্তরের দাবীতে সাড়া না দিতেন এবং খিদীব তাওফীকের আনুগত্যে অটল থাকতেন, তাহলে কি তাঁর পরিণতি আজ এমন হত?" এমন একটি চিন্তা তাঁর মনে উঁকি দিতেই তিনি তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আউযুবিল্লাহ, লা হাওলা ও আস্তাগফিরুল্লাহ পাঠ করতে থাকেন। আর সেই সাথে আওড়াতে থাকেন সম্মান ও আত্মমর্যাদার চেতনায় উদ্দীপ্ত আরবী কবিতার কিছু শ্লোক।

আগের দিনটির মত পরের দিনটিও ছিল ক্লান্তি ও নানা ঘটনায় পরিপূর্ণ। নিয়ম অনুযায়ী প্রভাতের অন্ধকারে মিটগামারের উদ্দেশ্যে আমরা বের হলাম। আমাদের চিকিৎসার মেয়াদ দিনের পর দিন শুধু বেড়েই চলছিল, আর আমরাও দিন দিন ক্লান্ত ও নিরুৎসাহ হয়ে পড়ছিলাম। খাদ্যের স্বল্পতার সাথে সাথে Tartar emetic ইনজেকশন নেয়ার অতিরিক্ত কষ্ট এবং আমাদের সফরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত দারুণ ক্লান্তি আমাদের দুর্বলতা এবং চেহারার বিমর্ষতাকে আরো বৃদ্ধি করে দিচ্ছিল। তবে আমাদের একটি মাত্র সান্ত্বনা এই ছিল যে, আমরা একটি সার্টিফিকেট লাভ করবো, যা থেকে আমরা বঞ্চিত ছিলাম আমাদের জন্মের পর থেকেই এবং এরই বদৌলতে আগামী নতুন বছরে আমাদের জন্য বিদ্যালয়ের দ্বার উন্মুক্ত হবে।

আমরা আল-মুয়াহিদা রোড দিয়ে চলছি। এমন সময় একটা প্রচন্ড ফট্‌ফট্ শব্দ আমরা শুনতে পেলাম। আমাদের পেছন দিক থেকে একজন ইংরেজ সৈনিক পাগলা গতিতে একটি মোটর সাইকেল চালিয়ে আসছিল। যেন সে তার শক্তি ও দাপটের প্রদর্শনী করছে। আমি একটু উদাস ভঙ্গিতে রাস্তার একপাশে দাঁড়ালাম এবং কিছুটা চ্যালেঞ্জ ও উদ্ধতভাবে তার দিকে তাকালাম। আমি জানিনে কি ভাবে আমি যেন আমার নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললাম। আমার হাত দিয়ে তার দিকে ইশারা করে তার মুখোমুখিই আমি চেঁচিয়ে বলে উঠলামঃ 'ওরে মাতাল, অভিশপ্ত তোর বাপ।' আমি জানিনে, সে আমার কথা শুনতে পেল কি না এবং আমার উদ্দেশ্যও সে বুঝলো কি না। কারণ, ততটুকু চিন্তা করার সময় আমি পেলাম না। আমি দেখতে পেলাম সৈনিকটি অত্যন্ত বেপরোয়াভাবে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আমার মনে হলো, সে যেন আমাদের ধাক্কা দেবে। আমি খুব দ্রুত নিজেকে বাঁচাবার জন্যে তার রাস্তা থেকে দূরে সরে গেলাম। হঠাৎ আমার পা পিছলে গেল এবং আমি আল-মুয়াহিদা রোডের পাশ দিয়ে প্রবাহিত একটি পানির নালায় পড়ে গেলাম। সৈনিকটি

উল্লাসে এমনভাবে ফেটে পড়লো যে, তার মুখমন্ডলের শিরা–উপশিরাগুলো ভেসে উঠলো। সে আমাদের দেখতে পেল, আমাদের কেউ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পালাচ্ছে, কেউ নালার মধ্যে গড়াগড়ি খাচ্ছে এবং সবার ওপর যেন একটা বিস্ময় ও আতঙ্ক ভর করে আছে।

এ কৌতুকপ্রদ দৃশ্য উপভোগ করার পর সৈনিকটি তার নিজের কাজে চলে গেল। এ দৃশ্যটির গভীর মিল ছিল ভীত–শঙ্কিত ইঁদুরকে নিয়ে খাওয়ার আগে বিড়ালের খেলা করার দৃশ্যের সাথে।

অনেক কসরতের পর আমি নালা থেকে উঠলাম। আমার জামা–কাপড় তখন কাদা পানিতে একাকার। আমি বোকার মত দাঁড়িয়ে রইলাম, কি করবো তা ভেবে পাচ্ছিলাম না। এহেন দুরবস্থা সত্ত্বেও আমার মুখ থেকে গালাগালির তুফান বয়ে যাচ্ছিল। আমি যেন এই ভাবেই কোন রকমে আমার ভিতরের ক্রোধের আগুন এবং হৃদয় মাঝে প্রজ্বলিত ঘৃণার তীব্র দহনকে কিছুটা ঠান্ডা করে নিচ্ছিলাম।

এই নোংরা ছোটলোক ইংরেজের জাত ক্ষুধার্ত মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে এবং আমাদের লাঞ্ছিত করেই ক্ষান্ত হয়নি। বরং ক্ষুধা এবং দুর্ভাগ্যের রঙে আমাদের জীবন রঞ্জিত হতে দেখলে তারা খুবই খুশি হয়। হ্যাঁ, সত্যিই সে দিনটি ছিল ভীষণ মর্মন্তুদ ও পীড়াদায়ক।

আমরা যখন আল–মুয়াহিদা স্ট্রীট পেছনে ফেলে হাসপাতালের দিকে মোড় নিলাম, তখন এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য অবলোকন করলাম। দেখলাম, আমার ফল বিক্রেতা সালেম চাচা একটা উঁচু গাছের তলায় বসে কান্নাকাটি করছেন এবং নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করে মাতম করছেন আর বলছেন,

–ওরে আমার প্রাণ, আমার ছেলে সাইয়্যেদ, এত অল্প বয়সে তুই চলে গেলি। তুই আমার সন্তান, তুই আমার ভবিষ্যত, আমাকে কার জন্য রেখে গেলি সাইয়্যেদ? আমি বুড়ো হয়ে গেছি, সহায়সম্বলহীন, একাকী। তোকে কেড়ে নিয়ে যারা আমার অন্তরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে, আল্লাহ তাদের প্রতিশোধ নেবেন। ওরে হতভাগার সন্তান হতভাগা! সাইয়্যেদ তোর বদলে আমার মরণ হোক এটাই আমি সব সময় কামনা করতাম। কিন্তু একী হলো?

সালেম চাচা আহাজারি ও মাতম করছেন। আর চারপাশে পরিচিতজনেরা তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। তাঁকে আল্লাহর ইচ্ছা ও ফয়সালায় সন্তুষ্ট হতে বলছে। তাদের একজন বললঃ সালেম, আমাদের রব আল্লাহ পরম দয়ালু, বিনিময়ে তিনি তোমাকে অবশ্যই অনেক কল্যাণ দান করবেন।

–আমাকে বিনিময় দিবেন? ভায়েরা আমি দৃষ্টিশক্তিহীন, রোগগ্রস্ত মানুষ। দেখতে পাই না, কোন কাজ–কর্মও করতে পারি না, 'ওরে আমার পুত্র, তুই আমাকে এত কষ্টের জন্য রেখে গেলি? সাইয়্যেদ, তুই ছিলি আমার চোখের মণি, আমার শক্তি এবং আমার জীবনের আশা। যে এ কাজ করেছে, আল্লাহ্ তার প্রতিশোধ নেবেন।

চাচা সালেম, আবারো কান্নায় ফেটে পড়লেন। তাঁর মুখ থেকে যেসব করুণ ও

বেদনাদায়ক কথা বের হচ্ছিল, তাতে হৃদয়ের গ্রন্থিগুলো যেন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল।

আমরা বুঝতে পারলাম, সাইয়্যেদ নামক সেই সুন্দর সদাচারী যুবকটি মৃত্যুবরণ করেছে। সে প্রতিদিন সকালে হাসপাতালের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে 'জুমাইয়্যেখ' বিক্রি করতো। আমাদের মত অল্প আয়ের লোকেরা সবাই ছিলাম তার খরিদ্দার। সে খুব ভাল ব্যবহার করতো, দর-দামের ব্যাপারেও খুবই উদারতার পরিচয় দিত। আর আজ দেখছি, সে বেচারা এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে।

রাস্তায় দাঁড়ানো লোকেরা দেখেছে, কীভাবে একজন ইংরেজ গাড়ীচালক মাতাল হয়ে গাড়ী চালাচ্ছিল। গাড়ীটি তার ডানে-বাঁয়ে হেলেদুলে চলছিল। গাড়ী এমন নিয়ন্ত্রণহারা হয়ে পড়েছিল যেন খোদ গাড়ীটিই মাতাল হয়ে পড়েছে। রাস্তায় কোন মেয়ের দেখা পেলে অমনি গাড়ীটির একে-বেঁকে চলাটাও বেড়ে যাচ্ছিল। ছোটলোক ইংরেজটি এভাবেই তার গাড়ী চালাবার বাহাদুরী ও ঠাট দেখাচ্ছিল। ফল হলো, গাড়ীর একটি চাকা নষ্ট হয়ে গেল এবং বাম দিকে গাড়ীটি হুমড়ি খেয়ে পড়লো। আর তার চাকার তলায় পিষ্ট হলো সালেম চাচার ছেলে সাইয়্যেদ। তবে তার 'জুমাইয়্যেখ' ভরা ঝুড়িটি খানিক দূরে ছিটকে পড়েছিল, সেটির গায়ে একটু ছোঁয়াও লাগেনি।

এভাবেই সাইয়্যেদ এ জীবন থেকে বিদায় নিয়েছে। সে বিদায় নিয়েছে, তার যৌবনের শুরুতেই। আর সে রেখে গেছে তার বৃদ্ধ পিতাকে। তিনি এখন আর্তনাদ করছেন, আর পাগলের মত প্রলাপ বকছেন। এমন সব বেদনাদায়ক ও হৃদয়বিদারক বাক্য তাঁর মুখ থেকে বের হচ্ছে, যা শুনলে মানুষের হৃদয় বিগলিত হয়ে যায়। আমি জানিনে, জীবনের দুঃখ ও লাঞ্ছনা থেকে যে মৃত্যু সাইয়্যেদকে মুক্তি দিয়েছিল, সে মৃত্যু যখন উপস্থিত হয়েছিল, তখন কি সে হেসেছিল? নাকি সে তার হতভাগ্য ও হতভম্ব পিতার পক্ষ থেকে দুর্বার প্রতিশোধস্পৃহায় এ জীবনকে পরিত্যাগ করেছে? এখনও পর্যন্ত এ প্রশ্নগুলোর সন্তোষজনক জওয়াব আমি খুঁজে বের করতে পারিনি। যা হোক, আমাদের চোখ থেকেও তখন অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়ছিল।

আবার আমরা হাসপাতালের দিকে চলতে শুরু করলাম। সেখানে আছে সেই বিরাট বপুধারী পুরুষ নার্সটি, আকর্ষণীয় চেহারার গম্ভীর প্রকৃতির ডাক্তার। তার চালচলনে রয়েছে ঠাট-ঠমক। সেখানে ময়লা, শতচ্ছিন্ন পোশাক পরে মলিন মুখে দাঁড়িয়ে আছে কৃষকরা, বিশেষ ধরনের জ্ঞান লাভের আশায়। আর আছে সেই নিয়ম মাফিক ইন্‌জেকশন দেয়ার পালা।

হাসপাতাল থেকে ফেরার পথে আমি বললামঃ কোথাও একটু বসে কিছু খেয়ে নিলে হয় না?

দলের ছেলেরা সবাই নিজ নিজ খাবারের পুটলা ও রুমালের গেরো খুলে শুকনো রুটি, গাজর ও মরিচ বের করার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা শুরু করে দিল। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম, আমার বন্ধু শায়খ হাফেজের ছেলে সাঈদ এক পাশে একটু সরে গেল এবং

আমাদের থেকে একটু দূরে গিয়ে বিমর্ষ মুখে চুপ করে বসে রইল। আমাদের একজন ওকে ডাকলোঃ এসো সাঈদ, খেয়ে নাও।

–শুকরান, আমার খেতে ইচ্ছে করছে না, ভাই।

একজন সংগী আমার কানে কানে বললঃ সাঈদ আজ সংগে করে খাবার আনেনি।

আমি বেশ রাগের সাথে তাকে বললামঃ তাতে হয়েছে কি?

–আজ আমি তার হাতে খাবারের পুটলি দেখিনি, তাই বলছি। তাছাড়া তোমাকে আমি বিরক্ত করব কেন?

–তুমি তোমার মত থাক। মোটেও বাজে কথা বলো না।

কথাগুলো বলেই আমার খাবারটুকু নিয়ে আমি সাঈদের দিকে যাওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে গেলাম।

যে অভাবের কারণে আমার আব্বার কণ্ঠরোধ হয়ে আসছিলো, তার চেয়েও বেশী অভাবের মধ্যে ছিলেন সাঈদের আব্বা। কারণ আমরা যে পরিমাণ গম পেয়েছিলাম, তা খুব টেনে–ছিঁড়ে সারাটি বছর চলতো। কিন্তু শায়খ হাফেজ ছিলেন একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যাকে বলে দিন–আনা–দিন–খাওয়া–লোক। গতকাল তিনি পরিবারের সকলের জন্য প্রয়োজনীয় খাবারটুকুও যোগাড় করতে পারেননি।

–সাঈদ, তুমি আমাদের সাথে খেতে আসছো না কেন?

–আমার খিদে পায়নি। আসলে আজ আমি খাবার আনতে ভুলে গেছি।

–সাঈদ, আমার ও তোমার মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

–তা তো বটেই, সুলায়মান।

–তাহলে এসো, আমরা এক সাথে খেয়ে নিই।

–মাফ চাই, আমি তো বলেছি, আমার খিদে পায়নি।

–আমার সাথে তুমি না খেলে এক লোকমাও আমি গালে দিব না।

–মাফ চাই, তুমি আমাকে চাপাচাপি করো না।

সাঈদের ব্যাপার–স্যাপার ছিল সত্যিই একটু অভিনব ধরনের। পেটের তীব্র চাহিদা সে এভাবেই দমন করতে পারতো এবং এভাবেই সে আহারের তীব্র আকাংখাকে পরাভূত করতে পারতো যদিও ক্ষুধার চোটে তার শিরা উপশিরায় আগুন জ্বলতো। "ওহে আত্মমর্যাদা সচেতন বন্ধু সাঈদ। তোমার এ মহত্ত্ব ও আত্ম–মর্যাদাবোধ কি তোমার বিদ্রোহী সেনা–অফিসার পিতামহ বা তোমার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী পিতার নিকট থেকে অর্জন করেছো? নাকি এ তোমার অহংকার ও অহমিকা যার জন্য তুমি তোমার সঙ্গীদের মধ্যে পরিচিতি লাভ করেছো?" শেষ পর্যন্ত সাঈদ আমাদের সাথে খায়নি। সেদিন থেকে তারপর আরো বহু দিন এক সাথে খাওয়ার জন্য আমি সাঈদকে সেধেছি, আর সাঈদ না খাওয়ার জন্য যেদ ধরে থেকেছে। কিন্তু যখন সে দেখেছে, আমি নাছোড়বান্দা এবং আমিও খাচ্ছি না, তখন অত্যন্ত অনিচ্ছা ও ভদ্রতা সহকারে এক–আধ লোকমা গালে দিত। মাঝে মাঝে দেখা যেত তার

চোখ থেকে অশ্রুধারা নামার উপক্রম হচ্ছে আর সে তা ঠেকাতে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। এভাবে সে তার গভীর অনুভূতিকে দমন করতে সক্ষম হতো। "সাঈদ, সত্যি তুমি একজন ভদ্র ও মহান ব্যক্তি। অন্তত আমার দৃষ্টিতে কমপক্ষে তুমি একজন মহান ব্যক্তি।"

স্টেশনে পৌছে আমরা দেখতে পেলাম ট্রেনটি ছেড়ে গেছে। পরবর্তী ট্রেন আসা পর্যন্ত কমপক্ষে দু'ঘন্টা আমাদের আটকে থাকতে হবে। আমি পায়চারি করছিলাম, এমন সময় দেখতে পেলাম একটি লোক টাকা নিয়ে খেলছে। তার চারপাশে ভিড় করে আছে এক দল জুয়াড়ি ছেলে। তাদের মাথায় লম্বা লম্বা চুল, গায়ে ময়লা চাদর এবং তাদের চেহারায় একটা বিমর্ষের ছাপ। জানার ঔৎসুক্য ও আগ্রহে আমি তাদের মধ্যে ঢুকে গেলাম। তারপর চমৎকার একটি দৃশ্য চোখে পড়ল। দেখলাম, তাদের একজন পাঁচ পয়সার একটি মুদ্রা ফেলছে এবং পুরো দশটি পয়সা সে পেয়ে যাচ্ছে। "হায় আল্লাহ এ তো দেখছি খুবই সহজ উপার্জনের পথ। আমিও একটি পয়সা ফেলে দেখি। এক পয়সার বিনিময়ে দু'পয়সা পেয়ে যাব। এভাবে দু'য়ের বদলে চার, চারের বদলে আট পেয়ে যাব। আর তা দিয়ে আমি পেটভরে খাবার ও ফল কিনে খাব।

স্পেনীয় শরবত 'ইরকাসুস' পান করবো। তারপর ট্রেনে চড়ে ঠ্যাঙ্গের উপর ঠ্যাং তুলে আরাম করে বসবো। সবচেয়ে বড় কথা হলো, বাসীমার জন্য একটু মিষ্টি নিয়ে যেতে পারবো। বাসীমা সে মিষ্টিটুকু দেখে উৎফুল্ল হবে। আমার পৌরুষ ও দয়া সে বুঝতে পারবে। এ তো খুবই চমৎকার খেলা।

কিন্তু আমার আম্মা তো বলে থাকেন জুয়া খেলা নাকি হারাম। আর তা নাকি বাড়ী-ঘর ধ্বংস করে দেয়। তিনি আমাকে এ সম্পর্কে কতই না সতর্ক করে থাকেন। কিন্তু আমি যদি তাঁর কথার খেলাফ করে একবার মাত্র এ খেলাটি খেলি তাতে এমন কি আসবে-যাবে? এ খেলা আমাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করছে।

সম্ভাব্য উপার্জনের এ পদ্ধতিটি আমার বুদ্ধির উপর প্রবল চাপ দিতে লাগলো। এ উপার্জন একটি নিশ্চিত বিষয় বলে আমার মনে হলো। এর লোকসানের দিকটি আমার মনে একটিবারও উদয় হলো না। এরই মধ্যে আমার হৃৎপিন্ডে হাতুড়ি পিটানি শুরু হয়ে গেছে। আমি এক পা এগুই তো দু'পা পিছোই। আমার শিরা-উপশিরায় জ্বালা শুরু হয়ে গেল। আমার কপাল থেকে দরদর করে ঘাম ঝরতে লাগলো। বিবেকের উপর লজ্জা ও অনুশোচনার চাবুক পড়া শুরু হয়ে গেল। কিভাবে আমি আম্মার কথার বিরুদ্ধাচরণ করবো এবং কিভাবেই বা এমন একটি কবীরা গোনার ভাগী হবো?

বিশেষ করে এই দিন আমার কাছে ছিল একটি অতিরিক্ত পয়সা। মনে মনে বললামঃ আমি আমার ভাগ্য পরীক্ষা করবো এই পয়সাটি দিয়েই। এটি যদি আমি হারাই, তাহলে দ্বিতীয়টি আমার কাছে অবশিষ্ট থাকবে। আর এটাই হবে আমার শেষ দৌড়। তবে না, আমি এটা কখনও খোয়াবো না। সাহস করো, সাহস করো। একটি মাত্র পয়সা অনেক পয়সা নিয়ে আসবে। এতে সংশয় ও ভয়ের কি আছে? আমি তিনটি কাগজের উপর চোখ

বুলাতে লাগলামঃ কাগজ তিনটি লোকটির হাতের মধ্যে অস্বাভাবিক দ্রুততার সাথে ঘোরাঘুরি করছিল। আমি বহুক্ষণ ধরে চিন্তা করলাম। আমি যে কাগজটি নির্বাচন করবো তা সঠিকই হবে, কোন মতেই ভুল হবে না।

অবশেষে ভাগ্য পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, যা হয় হবে। ডানে-বাঁয়ে তাকালাম। দেখলাম আমার অন্য সব বন্ধু দূরে চলে গেছে, আমার পাশে এখন তারা কেউ নেই। এটাই আমার সুবর্ণ সুযোগ। এ সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। আমার পয়সাটি হারালে তারা কেউ দেখতে পাবে না, জানতে পারবে না। এমনও তো হতে পারে, আমি পকেট ভর্তি মুদ্রা নিয়ে তাদের সাথে গিয়ে মিলিত হতে পারি। মুদ্রার ঝন-ঝনানি যেন আমার কানে বাজতে লাগলো। পকেটে হাত দিয়ে পয়সাটি বের করলাম। সমস্ত শক্তি একত্র করে কাগজ তিনটির একটির উপর পয়সাটি নিক্ষেপ করলাম। এতক্ষণে আমার হৃৎপিন্ড ধুক্‌ধুক্ করতে শুরু করেছে। এমন জোরে জোরে ধুক্‌ধুক্ করছে যেন আমি অন্য কিছুই কানে শুনতে পাচ্ছিনে। হায়! সেই ভয়াবহ মারাত্মক মুহূর্তটি! অথচ একটি, কেবল একটি মাত্র পয়সা ছাড়া আর আমি কিছুই হারাবো না।

লোকটি কাগজটি উঠালো। তারই উপর আমি পয়সাটি ফেলেছিলাম। বলল, একটিমাত্র পয়সা? তুমি তো দেখছি একেবারেই গরীব মানুষ।

ফলাফলের প্রতীক্ষায় আমি দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছি। আমার কান, চোখ সকল ইন্দ্রিয় লোকটির হাত দু'টির উপর নিবদ্ধ। লোকটি কাগজ তিনটি ওলট-পালট করছে। হঠাৎ দেখি আমার চোখ দু'টি কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। আমি যেন চেতনা হারিয়ে ফেলছি। স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আমি হেরে গেছি। লোকটি এমনভাবে পয়সাটি ছোঁ মেরে নিয়ে পকেটে ভরলো যেন কিছুই ঘটেনি।

কোন রকম প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে অথবা কমপক্ষে হারানো পয়সাটি ফিরিয়ে দেবার অনুরোধ না করে কিভাবে আমি এ স্থানটি ত্যাগ করতে পারি? এ ধরনের ক্ষতি অনেক সময় হঠকারিতার দিকে ঠেলে দেয় এবং কোন কোন ভুল অনেক সময় নেশার মধ্যে নিয়ে যায়।

সময় বয়ে গেল। আমি জানিনে, সেটা কতখানি সময়। সম্বিত ফিরে পেয়ে দেখতে পেলাম, আমার একটি হাত দ্বিতীয় পয়সাটি বের করার জন্যে পকেটের মধ্যে নড়াচড়া করছে। এটা ছিল এক রকম দুঃসাহস। আমার কাছে তো এই একটিমাত্র পয়সা ছাড়া আর কোন পয়সা নেই। এটা খোয়ানোর অর্থ কি এই নয় যে, এখান থেকে বাড়ী পর্যন্ত এই পনের মিটারেরও বেশী পথ পায়ে হেঁটে যেতে হবে। সঠিক চিন্তা-ভাবনাও আমি করতে পারছিলাম না। আর এ সংকট মুহূর্তে বুদ্ধি-বিবেকের পরামর্শ নিতেও আমি সক্ষম ছিলাম না। কারণ, আমি তখন গভীর আবেগতাড়িত। খোয়ানো পয়সাটি আমার অন্তরে যে অগ্নিশিখার সৃষ্টি করেছে তাতে আমার অন্তর তখন জ্বলে যাচ্ছে। তাছাড়া জুয়াড়ী লোকটির "তুমি তো দেখছি নিতান্ত গরীব" কথাটি তখনও আমার অন্তরে মৌমাছির হুলের ন্যায় বিঁধছে।

এ ক্ষেত্রে অদৃশ্য কোন শক্তি যেন আমার সংকল্পকে দুর্বল করে দিচ্ছিল, আমার অন্তরে সন্দেহের বীজ বুনে যাচ্ছিল আর আমার আবেগ–অনুভূতিকে নিয়ে যেন খেলা করছিল। এবার অবশিষ্ট পয়সাটিও আমি জুয়ার ছকে নিক্ষেপ করে আমার স্নায়ুতন্ত্রগুলোকে প্রশান্ত করতে চাই। তাতে যা হয় হবে। কী আশ্চর্য! পয়সাটি কোথায়? আমি পকেট হাতড়াতে লাগলাম। পকেট ওলট–পালট করে ফেললাম। আঁতিপাঁতি করে এখানে খুঁজি ওখানে খুঁজি। একে জিজ্ঞেস করি, ওকে জিজ্ঞেস করি। কিন্তু কোনই কাজ হলো না। আমি চিৎকার জুড়ে দিলাম, পরকালের ভয় দেখালাম, গালাগালি করলাম। কিন্তু কেউ আমার কথায় কান দিল না। তারা বরং আমার ব্যথা ও দুঃখ নিয়ে হাসাহাসি করতে লাগল। তারা আমার চোখ থেকে গলে পড়া অশ্রু ও আমার বিহবলতা নিয়ে রসিকতা শুরু করে দিল। আমার পাশে দাঁড়ানো লোকটির দিকে ফিরে রাগের সাথে বললামঃ তুমি তুমিই আমার পকেট থেকে পয়সাটি বের করে নিয়েছো। বলেই জোরে তার জামার একটি হাতা টেনে ধরলাম। কিন্তু সে অবহেলার দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললোঃ হাত ছেড়ে দে বলছি, নইলে তোকে আমি রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলবো।

–আমি ছাড়বো না। তুমিই নিয়েছো, আমি পুলিশ ডাকব।

আমার কথা শেষ করতে পারলাম না। আমি অনুভব করলাম মুহূর্তে তেলবালিতে পরিপূর্ণ নোংরা একটি হাত সজোরে আমার মুখের ওপর এসে পড়লো। আমাকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সেই লোকটি আগের মতই খেলা দেখতে শুরু করলো। যেন কোন কিছুই ঘটেনি।

ঘটনার আকস্মিকতায় আমার বাকশক্তি তখন রুদ্ধ হয়ে গেছে। এই চপেটাঘাতের পর আমার হুঁশ হয়েছে। আমি যেন একটা ভয়ানক স্বপ্ন থেকে জেগে উঠেছি। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছি, এমন সময় অনুভব করলাম একখানি দরদী হাত আমার কাঁধের ওপর পড়লো। সেই হাতটি ছিল সাঈদ হাফেজের।

–আল্লাহ! সাঈদ, তুমি এখানে? কী হয়েছে তোমার?

–না, না, কিছছু না।

–কি হয়েছে বল, আমার কাছে গোপন করতে চেয়ো না।

উত্তর না দিয়ে আমি মাথা নীচু করলাম। ব্যথায় অন্তর ফেটে যাচ্ছে। সাঈদ জুয়ার আড্ডা ও আশেপাশের লোকদের দিকে তাকালো। তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে চপেটাঘাতের চিহ্ন দেখতে পেলো। সে সহসা চিৎকার করে বলে উঠলোঃ কি আশ্চর্য! সুলায়মান, তুমি জুয়া খেলেছো? আমি কোন জবাব দিতে পারলাম না।

নীরবে আমার লাল দু'টি গন্ড বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। সাঈদ সে অশ্রুর সম্মান দিয়েছে। সে বলেছেঃ সুলায়মান, তোমার দায়িত্ব আমিই নিলাম, দুঃখ করো না। পয়সাটি চলে গেছে যাক। বিচলিত হয়ো না। সিত্তীন রোডে শুধু চোর–বাটপারের দল থাকে। একটি নয় বরং দু'টি। ওদেরই একজন পয়সাটি চুরি করে নিয়েছে। যেতে দাও। এসো, এসব

ভবঘুরেদের আড্ডা ছেড়ে চলে এসো। তাদের কাছে ক্ষতি, ধ্বংস, চুরি কিংবা এই ধরনের বাজে কাজ ছাড়া আর কিছুই নেই।

–আমার আম্মা সত্যিই বলেছেনঃ তারা চোখ থেকে সুরমাও চুরি করতে পারে। চুরি করে নানান টেকনিকে। এমন কি প্রকাশ্যেও। আমি আর কস্মিনকালেও এখানে আসব না। চিত্তবিনোদনের জন্যেও না। না, কখ্খনও না।

আমি বাস্তবেও তাই করেছি। আমার এই দীর্ঘ জীবনে যখনই আমি রাস্তায় কোন জুয়ার আড্ডা দেখতে পেয়েছি, তখনই আমার একটি হাত আমার পকেটে চলে গেছে। পকেট হাতড়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি যাতে কেউ পকেট মারতে না পারে। সেদিনটির সেই অশুভ মুহূর্তের কথা স্মরণ করে কিছুটা ব্যথাও অনুভব করেছি। সেদিনের আমার সেই ক্ষুদে শরীরটির কাঁপন আমার হৃৎপিন্ডে ঠিক যেন ঘন্টা পিটুনির শব্দ হয়ে আজো বাজে।

সেদিন আমার সেই কৃষক সঙ্গীটির তালাশ করা খুবই দরকার হয়ে পড়েছিল। গাধায় চড়ে সে হাসপাতালে আসতো। যদি একটু দয়া করে আমাকে তার গাধার উপর চড়িয়ে নিয়ে যায়। হোক না অর্ধেক পথ, বাকীটুকু আমি পায়ে হেঁটে যেতে পারব। সেদিন আমি এভাবেই এসেছিলাম। অত্যন্ত ক্লান্ত–শ্রান্ত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ী ফিরেছিলাম।

বাড়ী ফিরে দেখি বাসীমা চড়ুই পাখীর মতন লাফালাফি ছুটাছুটি করছে। অবস্থাটি জেনে ঘরের কোণে আমি ঘাপটি মেরে বসে রইলাম। যাতে সে আমাকে দেখতে না পায়। আমাকে দেখতে না পেয়ে নিজের কাজে চলে যাক, আমার কাছে সে যা আব্দার করেছিল, তা তো আমি আনতে পারিনি। আমার দেরীতে ফেরা এবং টেনে না চড়া সম্পর্কে আব্বা–আম্মাকে শোনাবার জন্যে নানা রকম কাল্পনিক গল্প বানাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। অবশ্য আগে ভাগেই সাঈদকে অনুরোধ করে রেখেছিলাম যা ঘটেছে তা যেন সে কাউকে না বলে। আমার ঘাড়ের শয়তানটির ওপর আল্লাহর লা'নত। আমাকে এত শাস্তি দেয়ার পরও সে থামলো না। গালাগালি, ধমকি ও লাঠির পিটুনি থেকে বাঁচার জন্যে এখন সে আমাকে মনগড়া মিথ্যা কাহিনী তৈরী করতে উৎসাহ দিতে লাগলো। এ দিনটি খুবই দুঃখের সাথে পার হতে লাগল। আমার ট্রেনের মধ্যে পড়ে যাওয়া, জুমাইয়্যেফ বিক্রেতার ছেলের মৃত্যু এবং সবশেষে জুয়ার ঘটনা সবই দুর্দশার চিহ্ন হয়ে রইল। দুঃখের সাথে আম্মা আমাকে জানালেন, আগামীকাল বা পরশু বাসীমা ইসকান্দারিয়ায় চলে যাচ্ছে। অল্পদিনের জন্যে নয়, ঢের দিনের জন্যেই যাচ্ছে।

–আম্মা, তুমি কি বলছো? বাসীমা চলে যাবে? এতো হতে পারে না। সে যাবে কেন?

–তোমার বয়স হয়নি বাছা। জীবন সম্পর্কে তুমি বেশী কিছু বোঝ না।

৩

হ্যাঁ, আমি তখন ছোট্টই ছিলাম। আমি অনুভব করছিলাম, আমার দেহের একটি অংশ যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, আমার ক্ষুদ্র অন্তরটি যেন তার থেকে সরে যাচ্ছে। হয়ত আমি তখন শিশুসুলভ কল্পনায় জড়িয়ে পড়েছিলাম। বাসীমা ছিল একটি নাজুক পুতুল। তার সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠতো অন্যান্য শিশুদের। তারা তার সাথে গোপনে আলাপ করতো, খেলা করতো। কেউ সে পুতুল ছিনিয়ে নিলে তখন কি কান্নায় না ভেঙ্গে পড়ত! বেলা ডোবার পরপরই চুপে চুপে আমি সেই জায়গাটিতে গেলাম, যেখানে ছোট্ট বাসীমার সাথে আমার দেখা হয়েছিল। ক্ষীণ প্রশান্ত সুগোল চেহারা, নিষ্পাপ মায়াভরা দুটি চোখে সে তার স্বভাবসুলভ মেয়েলী ভঙ্গিতে অত্যন্ত দক্ষভাবে মুখ নেড়ে নেড়ে বলেছিলঃ সুলায়মান, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট নই।

–কেন বাসীমা?

–কারণ, তুমি একজন বখীল।

–আমার অপরাধ কি? আমার যে পকেট মেরে নিয়েছে আর তুমি তো জান আমার সব কিছুই।

বাসীমা অভিমান ভুলে গেল। আমার প্রতি তার রাগও গেল পড়ে। সে উদাস চোখে আকাশের দিকে তাকালো, যেন কোন গোলাপী স্বপ্ন দেখছে সে। তার সাদামাঠা কল্পনা নকশা করছে নানা রকম ছায়া ও রংয়ের বিচিত্র সুন্দরের। সে বলল, সুলায়মান, আমি ইসকান্দারিয়া যাচ্ছি।

–সত্যি বাসীমা?

–সত্যি। আমি তোমাকে মিথ্যা বলছি না।

মনে খুব ব্যথা পেলাম। বাসীমা আমার কাছ থেকে দূরে চলে যাক তা যেন আমি ভাবতেই পারি না। আমরা যখন এক সঙ্গে খেলি, তখন আমি অপরিসীম আনন্দ অনুভব করে থাকি। আমি তার নরম, চিকন কণ্ঠস্বরে চেতনা ফিরে পেলাম। বাসীমা বললঃ সুলায়মান, আমি আশা করি তুমিও আমার সঙ্গে যাবে। আমার আম্মা বলছিলেন, আমি নাকি মস্তবড় সমুদ্র দেখতে পাব। নোনা সমুদ্র। যার একটাই মাত্র নাকি কূল!

স্কুলে যেমনটি পড়েছি, তেমনিভাবে তাকে বুঝাবার চেষ্টা করলাম না। সমুদ্রের অন্য একটি কূলও আছে। কিন্তু সেটি বহু দূরে। চোখে দেখা যায় না। চোখের আওতার বাইরে। বাসীমা বললঃ আমার আব্বা বলেন, সেখানে নেংটা ছেলে–মেয়েরা সারাদিন সাঁতার কাটে। তাদের নাকি হায়া–শরম নেই।

আমি তাকে বললামঃ মনে হচ্ছে, তুমি সেখানে গ্রীষ্মকালীন অবকাশ যাপন করতে যাচ্ছ!

কিন্তু বাসীমা 'আল–মাসীফ' (গ্রীষ্মকালীন অবকাশ যাপন) কথাটির অর্থ বুঝতে

পারেনি। ফলে, আমার ব্যঙ্গোক্তিতে সে লজ্জা পায়নি। সে বরং তার ঠোঁট দু'টি ফাঁক করে এমনভাবে হেসে উঠেছিল যে, চাঁদের আলোতে তার দাঁতগুলো ঝিকমিক করে উঠেছিল।

হাসতে হাসতে সে বলেছিলঃ ইসকান্দারিয়ায় অনেক মিষ্টি আছে। তাজা তাজা রুটি, গোশত, কমলা। সেখানে আছে রাজা–বাদশাহদের প্রাসাদের মত অনেক উঁচু উঁচু দালান–কোঠা।

–তুমি রাজ–প্রাসাদ কি, তা কি জান?

আমার দাদী অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করতেন। আমার সেনা–অফিসার দাদা সম্পর্কে অনেক কথা বলতেন। তিনি ছিলেন সরকার বিরোধী। সরকার যখন তাঁকে পাকড়াও করতে গেল তিনি পালিয়ে গেলেন। তার এ অমনোযোগিতার সুযোগে জিজ্ঞেস করলামঃ ইসকান্দারিয়ায় যাবে কেন, বাসীমা?

–বেড়াতে, মিষ্টি আর হরেক রকম ফল খেতে। তাছাড়া আরো কাজ আছে।

–বুঝলাম। কিন্তু সেখানে কে তোমাকে এত সব জিনিস দেবে?

–আমার চাচা।

–তোমার চাচা?

–হ্যাঁ তোমাকে বলিনি, আমার দাদা ছিলেন একজন উঁচ দরের সেনা–অফিসার? আমার আব্বা ছাড়াও মিসর ও ইসকান্দারিয়ায় তাঁর আরো অনেক ছেলে–মেয়ে আছেন। তাঁরা আমার আব্বার মত পাগড়ী ও লম্বা গাউন পরেন না। তাঁরা পরেন স্যুট–কোট ও ফেজ টুপি। আমার আম্মা বলেন, তাঁরা নাকি আমাদের থেকেও পয়সাওয়ালা, তাদের নাকি অনেক টাকা–কড়ি আছে।

সন্ধ্যায় ফিরে এলাম। মাকে একথাটি বলার প্রয়োজন মনে হয়নি যে, শায়খ হাফেজ শীহার অবস্থা দিন দিন খারাপ থেকে অধিকতর খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এক লোকমা রুজি তিনি এমন কষ্টে অর্জন করছেন যেন তাঁকে শিলাখন্ডের ওপর কিছু খোদাই করতে হচ্ছে। আজকাল তিনি তন্ময় হয়ে চিন্তায় ডুবে থাকেন। কিছুদিন যাবত যুদ্ধ আর হিটলারের আলোচনাও করছেন না। তিনি কিই–বা করতে পারেন? তাঁর এ দুরবস্থা কারো কাছে গোপন নেই। পরিবারের লোকদের শতচ্ছিন্ন তালি মারা পরিচ্ছদই অবস্থাটি প্রকাশ করে দেয়। সাঈদের আচরণ এবং বিষণ্নতা তাদের গৃহের অভ্যন্তরের অভাব–অনটনের কথা বলে দেয়। শায়খ হাফেজ ও তাঁর স্ত্রী খাদরার মধ্যে বাকযুদ্ধের আগুন যে ইদানীং আর নিভতেই চায় না, এখন তা আর কোন রাখ–ঢাক ব্যাপার নেই। আগে মাঝে–মধ্যে পত্রিকা কিনে পড়তেন। এখন এ কাজটি শায়খ হাফেজের জন্যে একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এখন তাঁর পিপাসা মিটানোর জন্যে এখানে–ওখানে পত্রিকা পাঠকদের কাছে যাওয়া ছাড়া গতি নেই। তাদের কাছে গিয়ে পত্রিকার জন্যে একটু খাতির করেন, তোষামোদ করেন। এভাবেই তিনি হিটলারের বিজয় এবং ইংরেজদের পরাজয়ের খবর সংগ্রহ করে সন্তুষ্ট হন।

এ কারণে শায়খ হাফেজ একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তাঁর সে সিদ্ধান্ত নড়চড়

হবে না।

সত্যিই বিষয়টি তাঁকে যথেষ্ট কষ্ট দিচ্ছে, চোখের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। তিনি আহার করতে পারছেন না, তাঁর হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। তিনি দারুণভাবে আন্দোলিত হয়ে পড়েছেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন, যে ভাগ্য ওঁর অফিসার পিতাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে, তাঁর আকাংখার রশিটি বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে, সেই একই ভাগ্য আজ তাঁর নিজের সাথে শত্রুতায় নেমেছে এবং তাঁর জীবনে অসহনীয় এক নরক সৃষ্টির প্রয়াস চালাচ্ছে। শায়খ হাফেজ স্থির করেছেন, বাসীমাকে তিনি ইসকান্দারিয়ায় পাঠাবেন যুদ্ধের ডামাডোলে ধনী হয়ে ওঠা এক ব্যক্তির বাড়ীতে গৃহপরিচারিকা হিসেবে। এভাবে তিনি তাঁর কষ্টের কিছু ভার লাঘব করতে পারবেন এবং তাঁর অন্তরে কিছুটা স্বস্তি আসবে। তাঁর এক পরিচিত ব্যক্তি তাঁকে কথা দিয়েছে, বাসীমা তাঁর বাড়ীতে কাজ করবে, তার মেয়ের মতই সে তাকে দেখাশুনা করবে, রাতে তার বাড়ীতেই থাকবে, সে তাকে খাওয়াবে-পরাবে। মোট কথা, বাসীমার কোন অভিযোগই থাকবে না। উপরন্তু মাস গেলে বাসীমা মজুরী পাবে দু'টাকা। সত্যি সত্যিই এটা মোটা অংক। এ দ্বারা শায়খ হাফেজ সাঈদের স্কুলের খরচ মেটাতে পারবেন, কিছু খাবারের দানাও কিনতে পারবেন। আর কে জানে হয়ত তিনি নতুন করে পত্রিকাও কিনতে সক্ষম হবেন।

জীবনটা সত্যিই রুক্ষ। তার শত রুক্ষতার মাঝেও আমরা বেঁচে থাকি। আমরা তার সাথে আপোস করি, ধৈর্য ধরি এবং সহ্য করি যতক্ষণ অবস্থা স্বাভাবিক না হয়।

বাসীমাকে আমি গভীরভাবে ভালোবাসতাম। আমার চোখে সে ছিল উঁচু মর্যাদার অধিকারিণী। যদিও তার আব্বা শায়খ হাফেজ ছিলেন একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, আর তার আম্মা খাদরা ছিলেন ঝগড়ার জন্যে প্রসিদ্ধ। আমি তখন ক্লাশ ফোরের ছাত্র। ছোট্ট গ্রামটির মধ্যে আমার মর্যাদাও কম ছিল না। কিন্তু যখন সেই নোংরা খবরটি জানতে পারলাম, তখন হঠাৎ আমি আমার স্বপ্নের আকাশ থেকে ছিটকে পড়লাম। সে হবে 'খাদেমা'-পরিচারিকা। বাসীমা হবে পরিচারিকা। তাকে আদেশ করা হবে, আর তা সে পালন করবে। তাকে বকাঝকা ও অপমান করা হবে, আর সে ডাইনিং টেবিলে পড়ে থাকা খাবার খুঁটে খেয়ে বেঁচে থাকবে। ওপর তলার লোক ও যুদ্ধের ডামাডোলে ফুলে-ফেঁপে ওঠা ধনীদের অধপতন আর অহমিকা! হায় আল্লাহ! দিন যত যাবে, জীবনের অনেক অদৃশ্য জগতই আমার দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়ে উঠবে। যখন তার খেলার সময়, হাসার সময়, তখন তার কথিত চাচা তাকে জবেহ করা পশুর মত নিয়ে যাবে ইসকান্দারিয়ায়। হায়! হতভাগিনী। যখন তার পা ইসকান্দারিয়ার মাটি প্রথম মাড়াবে-যেখানে আছে নানা রকমের রং, আলো আর শোরগোল, তখন তার অবস্থা কেমন হবে?

যখন সে তার মনিবের গৃহে পৌছবে এবং তাকে আদর ও স্নেহের বদলে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে জোরে জোরে এটা-ওটা আনার জন্যে ফরমাশ করা হবে, তখন তার ভূমিকা কেমন হবে? আর তার অনুভূতিই বা কেমন হবে, যখন সে দেখবে তার মনিবের ছেলে-মেয়েরা

অনেক দামী দামী জামা–কাপড় পরছে, আদর–যত্ন ও সোহাগ লাভ করছে, আর তার দিকে ছুঁড়ে মারা হচ্ছে যত সব পুরানো ব্যবহৃত জামা–কাপড়? আর তাকে করা হচ্ছে অবজ্ঞা ও অবহেলা? বাসীমা কি তখন কাঁদবে? সে কি বলবে, আমাকে আমার আব্বা–আম্মার কাছে ফিরিয়ে দিন? তার সে কান্নাকাটি ও মিনতিতে তাদের হৃদয় কি বিগলিত হবে? তার আশা কি পূর্ণ হবে? নাকি তার কপালে জুটবে লাথি, চড় ও বকুনি, আর তখন সে তার চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী তার ভাই সাঈদের কাছে সাহায্য চেয়ে বলতে থাকবে–সাঈদ আমার কাছে এসো, দেখ না, ছেলেরা আমাকে মারছে।

সাঈদ তাকে সাহায্য করবে না। তার দিকে চেয়েও দেখবে না।

বাসীমা, সত্যিই তুমি হতভাগিনী। কমলা, মিষ্টি ইত্যাদি খাবার হয়তো সে কখনো কখনো পাবে; কিন্তু তা হবে বিস্বাদ, তেতো। যেন তাতে বিষ মেশানো। বাসীমা তখন খুব তাড়াতাড়িই জানতে পারবে, খাবার থেকে আরো ভাল ফল–ফলাদির থেকেও সুন্দর জিনিস আছে। মার আদর, বাপের সোহাগ আর তার ভাই সাঈদের স্নেহের কথা সে কখনো ভুলতে পারবে না। এক কূলের বড় প্রশস্ত সমুদ্র হয়তো সে কখনো–সখনো দেখার–সুযোগ পাবে। কিন্তু তখনই সে অনুভব করবে যন্ত্রণাদায়ক ও জীবনসংহারক এক নিদারুণ একাকীত্ব। তখন তার মনে হবে সে যেন এই বিশাল সমুদ্রের এক কাতরা পানির মত নিতান্তই তুচ্ছ। সে হয়তো অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে উপকূলে সাঁতার কাটা লোকগুলোর দিকে এবং বিস্মিত হবে এই ভেবে যে, কেমন করে তারা উদোম হয়, তারা মানুষের দৃষ্টির আড়ালেও যায় না। গ্রামে কখনো কখনো চিকিৎসার একটি অংশ হিসেবে অবশ্যি এমনটি দেখা দেয়। নিয়ম অনুযায়ী কিছু দিন যাওয়ার পর বাসীমার বাড়ীর প্রতি টানও কমে যাবে। অন্যদিকে তার আব্বা–আম্মার অন্তর্বেদনাও ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে পড়বে। তাদের এ ব্যাপারে অন্য কোন বিকল্প পথও যে নেই। কষ্ট ছাড়া সুখ আসে না। দুনিয়াতে এই নিয়মটির ব্যতিক্রম হয় না। বাসীমা চলে গেল।

তাকে খুব খুশি ও প্রাণোচ্ছল দেখাচ্ছিল। তবে তার আম্মা কান্নাকাটি করছিলেন। আর আব্বা মানুষের দৃষ্টির আড়ালে নির্জনে চোখের পানি ফেলছিলেন। সাঈদকে দেখাচ্ছিল উদভ্রান্ত ও উদাসীনের মত। আর আমি আমার আম্মাকে কাঁদতে দেখে নিজেও কান্না জুড়ে দিলাম। তাড়াতাড়ি তিনি আমার চোখের পানি মুছতে মুছতে বললেনঃ ঠিক তোমার মার মতন তোমার অন্তরটিও খুব ভালো। সবই সয়ে যাবে, কেঁদো না বাবা।

আমি উত্তর দেয়ার মত কোন কথা পেলাম না। সারাটি দিনই আমি দুঃখের কালো সাগরে সাঁতার কাটতে লাগলাম। মুহূর্তের জন্যও তার সেই ভয়–ভীতি, কল্পনা ও ব্যথা–বেদনা থেকে মুক্তি পেলাম না।

বাসীমা যেদিন চলে গেল ঠিক সেদিনই আমার জ্বরে আক্রান্ত হওয়া এবং বুকের উপরের দিকে ব্যথা শুরু হওয়ার মধ্যে কোন সম্পর্ক ছিল কি না আমি জানি না। আমার জ্বর বেড়ে গেল। তার সাথে ভীষণ কাশি শুরু হয়ে গেল। রাত হতে না হতেই জ্বরের চোটে

জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। আম্মা পাশে বসে বসে ঝাড়-ফুঁক ও দোয়া-দুরূদ পাঠ করতে লাগলেন। যাতে আমার মানুষের কুদৃষ্টির প্রভাব দূর হয়ে যায়। তার ধারণা, এটাই রোগের কারণ। ছোট দু'টি ভাইবোন লায়লা আর মাহমুদ পাশে বসে আমার মুখের দিকে নির্নিমিষে তাকিয়ে ছিল। 'সুলায়মান, ধর, খাও' বলতে বলতে মাঝে মাঝে লায়লা রুটির টুকরো এগিয়ে ধরছিল।

আম্মা যখন কু-নজরের প্রভাব দূর করতে অপারগ হয়ে গেলেন, তখন কান্না জুড়ে দিলেন। তিনি ভুলে গেলেন তার বুকের দারুণ ব্যথার কথা। যাতে মাঝে মাঝে তাঁর শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হতো। তাঁর দেখাদেখি আমার ছোট ভাই-বোন দু'টিও কাঁদতে শুরু করলো। আমার দাদী এসে আমার নাড়ীর স্পন্দন পরীক্ষা করতে লাগলেন। একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় আমার গায়ে হাত দিয়ে শরীরের উত্তাপ নির্ণয়ে মনোযোগী হলেন। একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে, অভিজ্ঞ জনের কাছে জিজ্ঞেস করো, ডাক্তারের কাছে নয়। মনে হচ্ছে, আমার দাদী অভিজ্ঞ এবং ডাক্তারও। দ্রুত তিনি রোগ নির্ণয় করে ফেললেন। সিদ্ধান্ত দিলেন, আমার বুকের উপরি অংশের গতি স্তব্ধ করে দিচ্ছে 'আদ-দীবা' প্রেতাত্মা। আদ-দীবা? আমার বুকের ব্যথা আর জ্বরের সাথে আদ-দীবার সম্পর্ক কি? দাদী বলেছিলেন 'আদ-দীবা' আর আমি শুনেছিলাম 'আযযিবা'-নেকড়ে। মনে মনে বললাম, আমি তো জীবনে কোনদিন শুনিনি যে, নেকড়েরা বুকের স্পন্দন থামিয়ে দেয়। ব্যাপারটি আমি কোন মতেই বিশ্বাস করতে পারিনি। নেকড়ে যদি সত্যি সত্যি বুকের মধ্যে হংকার দিতে থাকে, তাও তো বিশ্বাস করা যায় না। আমার দাদী আস্থার সাথে এমন নিশ্চয়তা দিচ্ছেন যে, তাতে সন্দেহ ও সংশয়ের কোন অবকাশ থাকে না। তাঁর সিদ্ধান্তটি যেন আকাশ থেকে অবতীর্ণ প্রত্যাদেশ বা কুরআনের বাণী, যার সমালোচনা ও রদবদল সম্ভব নয়। ভাবলাম, দাদীকে বলি, আমার বুকটি এত ছোট্ট যে, সেখানে একটি চড়ুইয়ের বাচ্চাও থাকতে পারে না, নেকড়ে কেমন করে থাকবে? আমার ঠোঁটের মধ্যেই কথাগুলো রয়ে গেল। আমি তাঁকে বলতে শুনলামঃ সুলায়মানের মা, খুবই সামান্য ব্যাপার। নবীর নামই তাকে রক্ষা করবে। জায্যার ইবন জায্যার ছাড়া আর কারো প্রয়োজন হবে না। জায্যার ইবন জায্যার অর্থ কসাইয়ের ছেলে কসাই-সেই বুকের ভূত বের করে দেবে।

কথাগুলো শুনে আমি সাপ-বিচ্ছুর কামড় খাওয়া মানুষের মত বিছানার ওপর লাফিয়ে উঠলাম। চেঁচিয়ে বললামঃ জায্যার? এটা অসম্ভব! যতসব বাজে কথা। জায্যার কসাই তো কেবল গরু-ছাগল জবাই করে। সে কাটাছেঁড়ার কী জানে?

দাদী তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে মৃদু হাসলেন।। তারপর একটু মায়াভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। সম্ভবত আমার শিশুসুলভ সরলতায় তিনি মনে মনে কৌতুক বোধ করলেন। বললেনঃ কোন কাটাছেঁড়া হবে না, কোন কিছুই হবে না। নিশ্চিন্ত থাক। শুধুমাত্র তোমার ঘাড়ের ওপর ছুরি বুলিয়ে দেবে।

ওরে বাপরে! অসম্ভব! আমাকে মরতে দিন। এসব রসিকতার প্রয়োজন নেই।

আমার দাদী তাঁর দুর্বল ঠান্ডা হাতটি আমার মাথা ও শরীরে বুলাতে লাগলেন। তারপর আমার উত্তপ্ত কপালে একটা চুমু দিয়ে বললেনঃ ভয় পেয়ো না। ছুরি তোমার শরীরটি সামান্য স্পর্শ করবে, আর কিছু না। তাতেই প্রেতাত্মা বের হয়ে যাবে, আর তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে।

আমার দু'চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে লাগলো, আমি কান্না শুরু করে দিলাম। ব্যথায় আমার মাথাটি ফেটে যেতে লাগল। চিৎকার করে বললামঃ না, না, আমি সুস্থ হতে চাই না। যতদিন বেঁচে থাকবো, আশি বছরের ওপরের সেই বৃদ্ধ লোকটির কথা কোনদিন ভুলবো না।

জায্যার ইবন জায্যার একটি লম্বা মরচে পড়া ছুরি হাতে করে আমার কাছে এলেন। তারপর মেহেদী রঙ্গের জামা ও দাড়ি, কোটরাগত দু'টি চোখ আর বড় একটি নাক নিয়ে তিনি আমার দিকে ঝুঁকে পড়লেন। ছুরি ধরা হাতটি তখন কাঁপছিল। আমার ঘাড়ের দিকে এসে ছুরিটি বুলিয়ে দিতে চাইলেন। আমি প্রবল বাধা দিয়ে লাফিয়ে উঠলাম। কিন্তু হায় অনেকগুলো হাত এক সাথে আমাকে জাপটে ধরলো। আমি তাদের কাছে নিজেকে সঁপে দিলাম। আমার দাদী তাঁর কথামত মরচে পড়া ছুরিটি খুব তাড়াতাড়ি হাল্কাভাবে বুলাতে লাগলেন। ওদিকে লোকটি এমনভাবে বিড়বিড় করে কিছু আওড়াতে লাগলেন যেন সেসব কোন গভীর গর্তের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছেঃ ওরে প্রেতাত্মা, তুই বেরিয়ে আয় আমি জায্যার ইবন জায্যার তোকে শেষ করে ফেলবো। প্রেতাত্মা অপচ্ছায়া তুই বেরিয়ে আয়।

লোকটির কাজ শেষ করার আগেই আমি ভয়ে বিছানার উপর লাফ দিয়ে উঠলাম। তারপর জোরে জোরে শ্বাস নিয়ে মুখে একটু পানি দিতে চাইলাম। আমার দাদী হাসলেন, বিজয়িনীর হাসি। বললেনঃ আল্লাহর ইচ্ছায় তুমি সুস্থ হয়ে উঠেছো সুলায়মান, হাজার বছর ধরে তুমি সহীহ সালামতে থাক।

আমার দাদী, আল্লাহ তাঁকে মাফ করুন, ধারণা করেছিলেন, ছুরি চালানোর ফলেই আমি ভালো হয়ে গেছি। আমি তাদেরকে আর এ কথা জানাতে চাইলাম না যে, জ্বরে এখনো আমার শরীর সিদ্ধ হচ্ছে, বুকটি ভীষণ ব্যথায় কাতর হয়ে পড়ছে এবং সর্দিতে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। কোন কথাই তাদেরকে জানাতে চাইলাম না। যত কথাই বলি না কেন, তাঁরা আমাকে কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না। তাঁরা বরং আমাকে দোষারোপ করবেন আমি রোগের ভান করছি। জায্যারের আগমন ও নেকড়ের পলায়ন– যদিও আমি আমার বুকের মধ্য থেকে নেকড়ে বেরিয়ে আসতে দেখিনি, এটাই হচ্ছে স্পষ্ট প্রমাণ আমার পূর্ণ আরোগ্য লাভের।

আমার চোখের পাতায় নিদ্রা নেমে এলো। আমি নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়লাম। মাঝরাতে আমার ঘুম ভেঙে গেল। দেখতে পেলাম, মা আমার পাশে বসে বসে ঝিমুচ্ছেন, তার চেহারায় এখনো ক্লান্তি ও ব্যথার চিহ্ন স্পষ্ট। লায়লা মাহমুদকে দেখলাম আমার পায়ের কাছে গুটিশুটি মেরে শুয়ে আছে। তাদের নাক ডাকার মৃদু শব্দ আমার কানে ভেসে

আসছে। চোখের এক কোণ দিয়ে তাকিয়ে আব্বাকে দেখলাম, তিনি কাঠের পুরানো চেয়ারটার ওপর বসে আছেন। হাতলে চোয়ালটি ঠেস দিয়ে মুনাজাতের ভঙ্গিতে অনুচ্চ স্বরে আওড়াচ্ছেনঃ 'ইয়া রব, সদ্দিদ দুয়ূনী, ইয়া রব, লা তাযুল্লিনী লিআহাদিন, ইয়া রব, উরযুকনা ওয়াশ্‌ফি মারদানা, উফরুজ ইয়া রব, 'ইয়া কারীম–হে পরওয়ারদিগার, তুমি আমার ঋণ পরিশোধ করে দাও। হে প্রভু, তুমি আমাকে কারো কাছে অপমানিত করো না। হে প্রতিপালক, তুমি আমাদের রেযেক দান করো।'

আমার হতভাগ্য পিতা রাতদিন শুধু ঋণের কথাই ভাবতেন। তিনি বলতেন, 'ঋণ হচ্ছে দিনের অপমান, রাতের দুশ্চিন্তা, হৃদয়, ধমনী ও অন্ত্রের ব্যাধি'। তিনি ঠিক কথাটিই বলেছেন। আমার পিতা এই ঋণের কারণে খুবই কষ্ট পেতেন। কোন খাবারে তাঁর রুচি হতো না, কিছু পান করেও স্বাদ পেতেন না। চিন্তা তাকে দুর্বল করে ফেলেছিল। তাঁর নেড়া মাথায় অনেক চুল, অযত্নে বেড়ে ওঠা দাড়ি–গোঁফের বেশ কিছু সাদা হয়ে গিয়েছিল। তাঁর চোখে–মুখে স্পষ্ট ক্লান্তির যে ছাপ ছিল, তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এমন কি নিজ হাতে তামাক কেটে যে বিড়ি তৈরী করতেন, তার সংখ্যাও কমে যাচ্ছিল এবং তা এত ছোট হয়ে পড়েছিল যে, দু'তিন টানের পরেই তা ছুঁড়ে ফেলতে হতো।

যে চায়ের কথা তিনি এক মুহূর্তও ভুলতেন না, তাও তিনি আর নিয়মিত পেতেন না। সেই শৈশব থেকেই আমার আব্বা আমাকে শিখিয়েছেন দায়িত্বের বোঝার তলে কিভাবে আমি যন্ত্রণাকাতর হবো, কিভাবে হৃদয়ে মাতম করবো। তিনি আমাকে আরো শিখিয়েছেন, রাতের অন্ধকারে অসংখ্য মানুষ নামমাত্র ঘুমের স্বাদ গ্রহণ করে থাকে। রোগগ্রস্ত, ক্ষুধার্ত ও সর্বহারা ছাড়াও আরো অনেকে। সত্যি কথা বলতে কি, আমি যখন আমার পিতার ঋণের কাহিনীটি স্মরণ করি, সাথে সাথে আমার চাচা ফরীদের কণ্ঠস্বরটিও মনে পড়ে যায়। এ ঋণের সাথে আমার চাচার সম্পর্কটি কী? আমার চাচা সেই দিনগুলোতে আমাদের সাথেই থাকতেন। বড় চমৎকার আবেগপ্রবণ মানুষ ছিলেন। ভবিষ্যত সম্পর্কে বড় উদাসীন। বর্তমানকে নিয়েই তিনি মেতে থাকতেন। আল–আযহারের একজন ব্যর্থ ছাত্র। ১৯১৯–এ বিপ্লবের সূচনা পর্বেই তিনি আল–আযহার ত্যাগ করেন। তিনি তাঁর শত শত বন্ধুকে বৃটিশের বন্দুকের গুলী খেয়ে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখেছেন। কারণ জাতি সেই সময় স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্রের জন্য তাদেরকে ডাক দিয়েছিল।

জীবন সম্পর্কে আমার চাচার বিশেষ এক ধরনের দর্শন ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, ছাত্রদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হচ্ছে জ্ঞানার্জন। হরতাল, বিক্ষোভ ও মিছিল নয়। এভাবে আমরা একদিন একটি শিক্ষিত ও সচেতন জাতি হিসেবে গড়ে উঠবো। তখন আমরা জানতে পারবো, কিভাবে আমরা চলবো এবং কিভাবে আমরা ভুল ও পদস্খলন থেকে বেঁচে থাকবো। আমি এ মতবাদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলাম। আর তা আমাকে নম্র–ভদ্র, শান্ত–শিষ্ট ও আপোস–মনোভাব সম্পন্ন করে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। এর সম্পূর্ণ বিপরীতে ছিল সাঈদ হাফেজ। সারা জীবনই ছিল সে বিপ্লবী, বিদ্রোহী ও বেয়াড়া

ধরনের। তা সে পথে-ঘাটেই হোক বা স্কুলে। কতদিন না তিনি আমার কানে উপদেশ ঢালতে ঢালতে উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। সেই সময় প্রেমের স্বপ্ন বিলাস থেকে আমাকে সতর্ক থাকতে বলেছেন। আমাকে আবেগ-অনুভূতির বাড়াবাড়ি ও সকল প্রকার অতিরঞ্জন থেকেও সতর্ক থাকতে বলেছেন, কারণ তাতে আমার ভবিষ্যত সফলতা বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। একজন কৃষক যিনি কষ্টের মধ্যে তার জীবনটি শেষ করে ফেলেছেন, তার ছেলের জীবন ঐভাবে নষ্ট হওয়াটা কখনই সমীচীন নয়।

আমার চাচা ব্যথার সাথে দীর্ঘশ্বাস নিতেন। তারপর সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটি সিগারেট বের করে দু'আঙ্গুলের মাঝখানে চেপে ধরে বলতেন, সুলায়মান, তোমার সকল শক্তি প্রয়োগ করে ধূমপান থেকে দূরে থাকবে। এমন ভুলের মধ্যে তুমি পড়ো না যাতে আমি নিজেই পড়েছি। সিগারেটের একটি শলা দু'ঠোঁটের মাঝখানে রেখে আমি মনে মনে ভাবতাম, পুরুষ হয়ে গেছি। যেন পৌরুষের চিহ্ন হচ্ছে, আমার মুখ ও নাকের দু'টি ছিদ্র দিয়ে ক্রমাগত ধোঁয়া বের করা। ভাবতাম, এতে আমি মানুষের সামনে খুব বড় হচ্ছি। যাদের আমি ভালবাসতাম, তাদের সামনে সিগারেটের প্যাকেটটি এগিয়ে দিতে কতই না গর্ব হতো।

সুলায়মান, এটা ছিল এক অভিনব মানসিকতা। আমার বুদ্ধি-বিবেককে সেই জিনিসটি আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। আমি তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছিলাম। আমার সকল উদ্দেশ্য ও আকাংখা বাতাসে উড়ে গেল। আমি ধীরে ধীরে অধপতনের চরমে গিয়ে পৌছলাম। এর পশ্চাতে ছিল দু'টি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। প্রথমত, আমি থাকতাম গ্রাম থেকে বহু দূরে অভিভাবকহীন অবস্থায়। দ্বিতীয়ত, আমার ছিল একদল অসৎ বন্ধু-বান্ধব। ফলে ধূমপান, আফিম ও গাঁজা থেকে আমি বেঁচে থাকতে পারিনি। এখন সময় বয়ে যাওয়ার পর বুঝেছি, সত্যিকার পৌরুষ হচ্ছে কোন অভ্যাসের দাস না হওয়া, তা সে যতই শক্তিশালী হোক না কেন। কামনা ও বাসনা যত প্রচন্ডই হোক না কেন, তোমাকে যেন ভাসিয়ে না নিয়ে যায়। তুমি মানুষ হও মানবতার প্রকৃতিগত সঠিক গন্ডির মধ্যে, বিকারগ্রস্ত ও ব্যতিক্রমধর্মীদের মধ্যে নয়।

এরপর আমার চাচার চেহারায় ব্যথার ছাপ ফুটে উঠতো। বলতেন,

-ওঠো তো সুলায়মান! তোমার মাকে বলো, আমি এক কাপ চা চাই। তারপর পকেট হাতড়ে ছোট্ট একটি রূপালী কাগজের মোড়ক বের করতেন। খুবই সতর্কতার সাথে সেটি খুলে তার মধ্য থেকে কি একটা জিনিস বের করে টুক করে মুখের মধ্যে ফেলে দিয়ে চিবোতেন। আমার বিশ্বাস এ একটা আফিমের দানা ছাড়া আর কিছু নয়।

ধূমপান ও আফিম ক্রয়ের মত পয়সা আমার চাচার হাতে যখন থাকতো না, তখন আমার আব্বার দিকে কর্জের জন্যে হাত বাড়াতেন। আব্বাও ছিলেন সীমিত শক্তি ও স্বল্প আয়ের মানুষ। শেষমেশ, আমার চাচা কয়েক শতক জমি বিক্রির সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি ছিলেন দেড় একর জমির মালিক। শুনে তো আমার আব্বা একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলেন।

একজন বাইরের মানুষ আমাদের জমির উপর আসবে এটা খুবই অপমানজনক। আব্বার ধারণা, জমিও আমাদের দেহের একটি অংশের মত এবং তা হচ্ছে আমাদের মর্যাদা ও আভিজাত্যেরও একটি অংশ। এ জমি এমন একটি পবিত্র জিনিস, যেখানে বাইরের মানুষের পদচিহ্ন পড়া উচিত নয়। আব্বার কাছে তা থেকে মৃত্যুই শ্রেয়। গ্রামবাসীরা কি বলাবলি করবে, যখন আমাদের শস্যক্ষেত দু'ভাগে ভাগ করা হবে এবং আমাদের পরিবারে অন্য একজন অবাঞ্ছিত মানুষ ঢুকে পড়বে? আব্বা পড়লেন ভীষণ দুশ্চিন্তায়। চাচা 'ফরীদ' চাচ্ছেন অর্থ, আর আব্বার হাতে একটি টাকাও নেই। চাচার এখন অর্থের নিতান্ত প্রয়োজন। তাই তিনি কিছু জমি বিক্রি করতে চাচ্ছেন। আব্বা প্রচলিত প্রথা ও পরিবারের সম্মান অক্ষুণ্ন রাখার উদ্দেশ্যে জমিটুকু কিনে রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন, যাতে করে প্রতি ইঞ্চি জমি নিজেদেরই মালিকানায় থাকে। আব্বা হাত বাড়ালেন মানুষের কাছে অতিরিক্ত সুদের বিনিময়ে কর্জের জন্যে। আর মুরসে আবু আফার আব্বার ডাকে সবচেয়ে দ্রুত সাড়া দিয়ে ফেলল।

মুরসে ছিল একজন ব্যবসায়ী। যুদ্ধের পূর্বে কিছু জিনিস সে স্টক করেছিল। অবস্থা যখন সংকটজনক হয়ে পড়লো, কালোবাজারে জিনিসপত্রের দাম গেল বেড়ে, সে তার স্টকের মাল বিক্রি করেছিল। এভাবে একজন কপর্দকহীন ভবঘুরে মানুষ রাতারাতি তিন থেকে চার হাজার টাকার মালিক হয়ে গেল। ঋণের চাবুকের কশাঘাত আমার আব্বার পিঠে পড়তে লাগলো। রাত-দিন তিনি কেবল তারই প্রতিচ্ছবি দেখতেন। যখনই ঋণ কিছুটা পরিশোধ হয়ে আসতো, অমনি আমার চাচা আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন, নতুন করে কয়েক শতক জমি বিক্রির প্রস্তাব দিতেন। আমার আব্বা যদি তা না কেনেন, তাহলে অন্য কেউ তা কিনে নেবে। সুতরাং নতুন করে ঋণ নেয়া ছাড়া কোন উপায় থাকতো না। অন্যথায় নানাবিধ যন্ত্রণার শিকার হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

আমার চাচা, যিনি আমাদের এত দুঃখ-কষ্টের কারণ, তিনি আমাদের প্রতি ছিলেন খুবই স্নেহশীল ও দয়ালু। আমাদের উপর তিনি যে অত্যাচার করছেন, তা অস্বীকার করার চেষ্টা কখনো করতেন না। কখনো কখনো তিনি কাঁদতেন আর বলতেনঃ

-আমি কি করবো? এটাই আল্লাহর ইচ্ছা, আমাদের প্রতিপালক আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন।

আমার দাদী তাঁর কাছে এসে বলতেন, বাবা ফরীদ, তোমার ভাইয়ের প্রতি দয়া করো। বাল-বাচ্চাওয়ালা আবদুদ দায়েমের উপর রহম করো। তুমি একটু চিন্তা করো। আগামীকাল যখন তোমার নেশার ঘোর কেটে গিয়ে বুদ্ধি ফিরে আসবে তুমি অনুশোচনা করবে।

গভীর এক বিষণ্নতার মধ্যে আমার চাচা মাথা নীচু করে থাকতেন। মনে হতো তিনি যেন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ বিপদসংকুল এক সমুদ্রে নিমজ্জিত। সেখান থেকে তাঁর মুক্তির কোন আশা নেই। অস্ফুট স্বরে বলতেন, আমি আপনাদের চেয়ে অনেক বেশী চিন্তিত ও দুঃখিত।

দাদী বলতেন, ঐ কয়েক শতক জমি বিক্রি করার পর কিসের ওপর ভরসা করে বাঁচবে আর তো কিছু নেই।

–এ গ্রাম ছেড়ে আমি চলে যাব। কোনদিন আর এখানে আসবো না। নিজের জন্যে যে কোন একটি কাজ তালাশ করে নেব।

–যদি কোন কাজ না পাও ফরীদ?

না পেলেও আমি আর আপনাদের কাছে ফিরে আসবো না। অনাহারে–ভবঘুরে অবস্থায় মরে যাব। আমার চেহারা আর আপনাকে কখনো দেখাবো না। আপনাদেরকে আমি অনেক কষ্ট দিয়েছি।

ব্যস, এতটুকুই যথেষ্ট। এতসব কথার পরেও আমার চাচা আমাদেরই একজনের মত বাড়ীতে থাকতেন, খাওয়া–দাওয়া করতেন, ঘুমাতেন তাঁর পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি বিক্রি করা সত্ত্বে। আমার চাচা বিয়ে করতে সম্মত না হয়ে ভালোই করেছিলেন, যদিও তখন তাঁর জীবনের পঁয়ত্রিশটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। ভবিষ্যত বংশধরদের প্রতি করুণাবশত তিনি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

৪

–আস্‌সালামু আলাইকুম, ভাই আবদুদ দায়েম!

–ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। জনাব মুরসে, আসুন, ভিতরে আসুন।

মুরসে আবু আফার, কুখ্যাত সুদখোর ভিতরে প্রবেশ করলো। তার দাঁতে তখন একটা কপট পিঙ্গল বর্ণের হাসি লেগে ছিল। সে এমন ধীরে ধীরে সামনে এগুলো যে, তাতে তার সতর্কতা, বিজ্ঞতা ও গভীর নিরীক্ষণ ক্ষমতা প্রকাশ পেল। আর এগুলোকে আরো নিশ্চিত করছিল তার বেঁটে হালকা–পাতলা শরীরটি, এখানে ওখানে তার সতর্ক দৃষ্টিপাত ও তার ঐতিহ্যগত গলাখাঁকারী। মুরসেকে দেখলেই আমার আব্বার মুখের পান্ডুরতা ও মলিনভাব আরো বেড়ে যেতো। একটা চাপা ক্রোধে তাঁর মুখের মাংসপেশীগুলো কেঁপে উঠতো। ভিতরে দাবিয়ে রাখা ক্রোধ ও ক্ষোভে তাঁর শরীরে খিঁচুনি এসে যেতো। তাঁর দু'চোখে সংকোচ ও অস্থিরতা ফুটে উঠতো। মুরসে যেন এক মারাত্মক বিস্বাদ হানজাল, আর আমার আব্বা তা গিলতে বাধ্য।

–ভালো আছেন তো, আবদুদ দায়েম।

আব্বা সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেনঃ আল্লাহ আপনাকে সুখে শান্তিতে রাখুন।

–ঋণ শোধ করা তো উচিত।

–অবশ্যই। এক মাস এখনো বাকী।

–আবদুদ দায়েম, তোমার জন্যে হারাম হবে। আল্লাহর নামে হাজার বার কসম করে বলছি, এসব অর্থ অন্য মানুষের। এতে আমার এক মিলিয়মও লাভ নেই।

আগুনঝরা দৃষ্টিতে আব্বা তাকে দেখলেন, কিন্তু উত্তেজনা চেপে রেখে চুপ করে থাকলেন। তাঁর মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে মুরসের এ কথাটি 'আবদুদ দায়েম, তোমার জন্যে হারাম হবে।' কি অদ্ভুত ব্যঙ্গ! আমার আব্বার জন্যে হারাম? আর মুরসে যে আমাদের রক্ত চুষছে, কর্জের নামে অতিরিক্ত সুদের বিনিময়ে টাকা দিয়ে যখন–তখন আমার আব্বাকে দাবড়াচ্ছে, তাঁর জীবন অতিষ্ঠ করে তুলছে, তাঁর ঘুম কেড়ে নিচ্ছে তা কি তার জন্যে হালাল? আমার আব্বা কি অপরাধ করেছেন? যার জন্যে তিনি নিজেকে কুরবানীর পশুর মত সমর্পণ করে দিয়েছেন, সব কিছুই সহ্য করছেন, মুরসের সব কথাই বরদাশত করছেন?

আরো কৌতুকের ব্যাপার হলো, মুরসে বলছে, এ অর্থ তার না, সবই অন্য মানুষের। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, তার একথাটিকে, অথবা সঠিকভাবে বলতে গেলে, তার এ মিথ্যা কথাটিকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আল্লাহর নামে তিন তিনটি বার সে কসম খেয়েছে।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে আব্বা বললেন, এ ধরনের কথার কোন প্রয়োজন ছিল না। আপনার বা অন্য যারই অর্থ হোক, আমি কাকেও ঘুরাবো না। প্রত্যেকটি মিলিয়ম আমি ফেরত দেব। আপনি দেখতে পাচ্ছেন, তুলো স্তূপ হয়ে পড়ে আছে, যুদ্ধের কারণে ব্যবসার বাজার মন্দা। ইংরেজ আমাদের শেষ করে দিয়েছে।

–আল্লাহ তাদেরকেও ধ্বংস করুন। মুরসের মুখ থেকে এ বাক্যটি বের হওয়া নিতান্তই লৌকিকতার খাতিরে। এ তার অন্তরের কথা নয়। কারণ সে জানে, যুদ্ধ তার জন্যে কল্যাণ ও বরকত বয়ে নিয়ে এসেছে। তাকে কালোবাজারীর সুযোগ দিয়েছে। গুদামজাত করার সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি তাকে শিখিয়েছে। আর সে জেনেছে, সারা দেশে রেশন বন্টনকারী কর্মকর্তাদের কাছে কিভাবে পৌছাতে হয় এবং তাদেরকে ঘুষ, হাদিয়া দিয়ে লক্ষ লক্ষ বনি আদমের প্রাণের বিনিময়ে ধোকাবাজি ও অবৈধ পন্থায় সম্পদের পাহাড় তৈরী করতে হয়।

অনেক সময় আমি মনে মনে বলেছি, 'কি হতো যদি মিসরের প্রতিটি মানুষ ইংরেজদের প্রতি সাহায্য ও সহযোগিতার হাত একেবারেই না বাড়াতো? তারা কি পারতো সামরিক শক্তির উপর ভর করে আমাদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে, তারা কি পেত আমাদের কাউকে বন্ধু ও সহযোগীরূপে এবং তারা কি সক্ষম হতো আমাদের দেশটিকে তাদের ব্যবসা ও উৎপাদিত পণ্যের বাজারে পরিণত করতে? মুরসের মত চোর–ডাকাতদের সাধ্য ছিল কি তাদেরকে সাহায্য ও সাহস দেয়া এবং পারতো কি তারা মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে ফুলেফেঁপে উঠতে?

এমন অনেক প্রশ্নই আমার মাথায় ঘুরপাক খেতো। আমি তখন বসে থাকতাম আমার আব্বা ও মুরসের সাথে। বুঝতাম প্রশ্নগুলোর উত্তর খুব কঠিন।

–যাই হোক, আবদুদ দায়েম, যদি আপনি তুলো বিক্রি করতে না পারেন, তা হলে

আমার বিশ্বাস মহিষটি বিক্রি করলে আপনার বেশ সাহায্য হবে।

আমার আব্বা দাঁতে দাঁত রেখে এমনভাবে চাপ দিলেন যেমন চেপে রাখে ক্রোধে ফুলে থাকা ব্যক্তি তার ক্রোধ। বললেন–এ উপদেশের জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। আমিই দেখবো কিভাবে কি করা যায়। আমি তো বলেছি, আমাদের হাতে এখনো একটি মাস আছে।

–আবদুদ দায়েম, অসন্তুষ্ট হলেন? মহান আল্লাহর কসম, আপনাকে কষ্ট দিতে চাইনি।

–এখানেই শেষ করা যাক। এ বিষয়ে আর কোন কথার প্রয়োজন নেই।

এ কথাটির অর্থ ছিল সাক্ষাত এখানেই শেষ। মুরসে চলে যেত। তখন তার দাঁতে ফ্যাকাসে কপট হাসিটুক লেগে থাকতো, আর তার দু'টি চক্ষুকোটরে ধূর্ততা ও বিজ্ঞতার একটা ছাপ লক্ষ্য করা যেত। এটাই এ ধরনের প্রথম সাক্ষাত নয়। বরং সময়ে সময়ে মুরসে ঘৃণ্য অপচ্ছায়ার মত আমাদের বাড়ীতে উপস্থিত হতো। সে তার এই উপস্থিতির দ্বারা তার পাওনা টাকার কথা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিত। এভাবে সে আমাদের আনন্দ ও বিশ্রামের মুহূর্তগুলো মাঝে মাঝে কেড়ে নিয়ে বিরক্তির সৃষ্টি করতো। আমার বিশ্বাস, সেও তা বুঝতো। কিন্তু এতে সে যে স্বাদ ও আনন্দ লাভ করতো সম্ভবত তা দমন করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সে একাধিক বার আমার আব্বার কানে দিয়েছে মহিষ বিক্রির কথাটি। আসলে এ মহিষটি যে বিপুল পরিমাণ দুধ দিত তা সবাই জানতো। আম্মা সে দুধ থেকে ঘি ও পনির বানিয়ে কিছু কিছু বিক্রি করতেন। এ থেকে সামান্য দু'চার গুরুশ আমার হাতে আসতো। কিন্তু মনে হচ্ছে মুরসে এ মহিষটি থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করতে এবং তার বিপুল পরিমাণ দুধ থেকে নিজেই ফায়দা লুটবার জন্যে আদাপানি খেয়ে লেগেছে। আমরা যে ঋণের সাগরে নিমজ্জিত তাতে যেন তার খায়েশ মিটছে না। যেন লোভ ও পেটুকতা তার নতুন জীবনের জন্যে অপরিহার্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আল্লাহ আমার আব্বার সহায় ছিলেন। আব্বা তাঁর রাগ হজম করে ফেলেন। না, এই লোভী দয়ামায়াহীন জীবন সম্পর্কে বোধশক্তিহীন সুদখোর লোকটির মাথাটি গুঁড়িয়ে দেবার জন্যে তিনি হাতে কুড়াল তুলে নেননি।

নতুন বছরে স্কুল খোলার সময় ঘনিয়ে এলো। আমার স্কুলের প্রয়োজনীয় ড্রেস বানিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আব্বার। ব্যাপারটি ছিল তাঁর জন্যে খুবই কঠিন। এ কারণে সহজ পন্থা ছিল, আমার আম্মা আধা কিলো গম, কিছু পনির বা ঘি বিক্রি করতে দিতেন। আমরা সেগুলো নিয়ে গ্রামের হাটে যেতাম। মাত্র আধা কিলো গম এজন্যে যে, অবশিষ্ট গমে কোনমতে আমাদের বছর পার হতো। নতুন জামা–কাপড় কেনা সহজ কাজ ছিল না।

এক এক করে আমার সঙ্গী–সাথীরা শহরে যেতে লাগলো। তারা যখন ফিরে আসলো, তখন তাদের হাতে নতুন নতুন পোশাক। আমি ফ্যালফ্যাল করে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। তারা যখন আমাকে জিজ্ঞেস করতো–'তুমি কি নতুন পোশাক কিনেছো? আমি তাদের এ প্রশ্ন এড়িয়ে যেতাম। আমি তখন দু'ধরনের আগুনের মধ্যে পড়ে দগ্ধ হচ্ছিলাম।

আমাদের আর্থিক অবস্থা আমার কাছে গোপন ছিল না। আর একই সময়ে আমার মধ্যে প্রশ্ন জাগতো, আমি কি অপরাধ করেছি যে, নতুন পোশাক থেকে মাহরুম থাকবো এবং আমার বন্ধুদের কাছ থেকে খোঁচা ও ভ্রুকুটি লাভ করে মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করবো?

আমার মনে হতো আমার ব্যথাটা অন্য সব মানুষের থেকে বেশী কঠিন। আমার ধারণা ছিল, যে আগুন স্পর্শ করে কেবল তারই হাত পোড়ে। কিন্তু আমার এ ধারণা ভুল বলে আমি বুঝতে পারলাম। শুনেছি আমার আম্মা কখনো কখনো উত্তেজিত হয়ে বলছেনঃ

–আবদুদ দায়েম, সুলায়মান বড্ড রাগারাগি করছে। তার জামা–প্যান্ট এনে দেবে না?

–আমি কি দিয়ে আনবো? বল, আমি কি আমার জান বিক্রি করবো? না, আমি টাকা বানাবো?

–হতভাগ্য ছেলেটি মুখে কিছু বলে না, কিন্তু তার মুখে সব সময় একটা গভীর ব্যথার ছাপ দেখা যায়।

–সুলায়মানের মা, আমাদের রব তাঁর বান্দাদেরকে ভুলে যাবেন না। শিগ্‌গিরই ইনশাআল্লাহ স্বাচ্ছন্দ্য এসে যাবে।

স্কুল খোলার প্রথম দিনটি এসে গেল। বাড়ীতে আমি ঘোঁতঘোঁত করে কাঁদতে থাকলাম। এছাড়া আমি আর কি–ই বা করতে পারতাম? আমি এত ব্যথা অনুভব করেছিলাম যে, আমার হৃদয়ের তন্ত্রীগুলো যেন ছিঁড়ে যাচ্ছিল, দুঃখে আমার কলিজাটি ফেটে যাচ্ছিল। আমার সংগী–সাথীরা আনন্দে নাচতে নাচতে দলে দলে স্কুলে চলে গেল। আর আমি আমাদের বাড়ীর ছাদের উপরে এমন এক জায়গায় বসে থাকলাম, যেখানে কেউ যেন আমাকে দেখতে না পায়। স্কুলে যাবার রাস্তাটি ধরে ছেলেরা যখন গ্রামের বাইরে চলে যাচ্ছিল আমি তখন চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকলাম। স্কুলটি ছিল আমাদের পাশের গ্রামে। সেদিন আমি আমার নিজের মধ্যে অনুভব করেছিলাম বঞ্চনার এক তীব্র জ্বালা এবং আমার দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে মনের মধ্যে একটা বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার ভাব।

অতীতের এ ঘটনাটি আমার মনের উপর বিরাট এক প্রভাব রেখে গেছে। আমাকে সময়ের মূল্য দিতে ও সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে শিখিয়েছে। প্রতিটি কাজ, তা সে যত তুচ্ছই হোক না কেন, সাধ্যমত আমি তার সম্মান ও মূল্য দিই। আজ আমার হয়তো প্রচুর সুযোগ ও সুবিধা আছে, কিন্তু কে জানে আগামীকাল হয়তো এর বিপরীত কিছু ঘটে যেতে পারে। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, ঘাম ঝরিয়ে পরিশ্রমের মাধ্যমে যা কিছু অর্জন করা যায়, তার মূল্য ও সম্মান অনেক বেশী হয়। যা সহজে এমনিতেই এসে যায়, তার সম্মান ও মূল্য কম। এ কারণে সব জিনিসের মূল্য দিতে আমি শিখেছি। তবে সেই মূল্য নয় সাধারণত মানুষ যা বুঝে থাকে। আমার মূল্য হলো, তা অর্জনের পেছনে আমি যে শ্রমটুকু

ব্যয় করেছি, তাই।

সেদিন আব্বা আমার সাথে কোন কথাই বলেননি। এমন কি ক্ষোভে–দুঃখে দুপুরের খাবার খেতেও আসেননি। সম্ভবত তিনি আমার আবেগ, অশ্রু ও ক্ষুব্ধ অনুভূতিকে সম্মান দিয়েছিলেন। এ কারণে আমাকে না দেখাই ভালো মনে করেছিলেন। নিজেকে এবং সেই সাথে আমাকে আরো বেশী কষ্ট দেয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না।

সন্ধ্যায় আমার ফরীদ চাচা ফিরে এলেন। তিনি ফিরে এলেন ডান হাতে গোল একটা জিনিস নিয়ে। রাতের আঁধারে আমি সেটা চিনতে পারিনি। তিনি ঘরে ঢুকলেন। আমাদের চোখের সামনে সেটা খুললেন। জিনিসটি ছিল ভাল উলের একটি লম্বা পাজামা। তবে তা ব্যবহৃত এবং বড়দের মাপের। আমার মত ছোট ছেলেদের জন্য নয়। অবশ্য চাচা ফরীদের উদ্দেশ্যটি ছিল স্পষ্ট। তাঁরা আমাকে গ্রামের এক দর্জির কাছে নিয়ে গেলেন। সেই সর্বশক্তিমানের অপার মহিমায় লোকটি সেই লম্বা পাজামাটি থেকে দু'টি ছোট পাজামা বানিয়ে ফেলল। এ জাতীয় পোশাক সেলাইয়ের অভিজ্ঞতা তার না থাকা সত্ত্বেও সে কাঁচি চালিয়ে দিল এবং অল্প একটু ভাবনা–চিন্তার পরই আমার আব্বা ও চাচার আশা পূরণ করতে সমর্থ হলো।

আমি কি বলিনি, আমার চাচা লোকটি খুব ভালো? যদিও তিনি আফিম, গাঁজা ও ক্রমাগত দারিদ্রের জটাজালে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

কিন্তু আমার প্যান্ট–কোটের সমস্যার সত্যিকার সমাধান কি হয়েছিল? স্কুল তো নির্ধারণ করেছিল বিশেষ এক ধরনের ইউনিফরম।

তারপর আমি? আমার অভ্যন্তরে শক্ত একটা অনুভূতি আমার কলিজাটাকে চিপে রস নিংড়ে ফেলছিল। কারণ আমি তো জীবন ধারণ করছি অনুগ্রহ ও ভিক্ষার উপর। আমার ভূমিকা তখন কি হবে, যখন আমি এ কথার মুখোমুখি হবো যে, একটি পাজামা থেকে আমি দু'টি পাজামা বানিয়েছি? আমার চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী আমি কি তখন নাক ও মাথা উঁচু করে চলতে পারবো? নিশ্চয় তখন লজ্জা আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত আবৃত করে ফেলবে। কেউ কখনো আমার দিকে তাকালে আমার মনে হবে, সে আমার পাজামাটি খুঁটে খুঁটে দেখছে এবং সে আসল রহস্যটি জেনে ফেলছে। যখনই দু'জন লোক ফিসফিস করে কথা বলবে, আমার ধারণা হবে, তাদের এ ফিসফিসানির বিষয় আমার এ কিম্ভূতকিমাকার ড্রেস ছাড়া অন্য কিছু নয়। এ থেকে মুক্তির কোন পথ নেই।

চাচা, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। এছাড়া আর কোন সমাধান কি আপনি খুঁজে পাননি? তিনি কোথা থেকে দৌড়ে গিয়ে একটি পাজামা নিয়ে এলেন এবং এভাবে আমার প্রয়োজন পূর্ণ করতে চাইলেন, অথচ এ থেকে আমি ন্যাংটা থাকা শ্রেয় মনে করি। তিনি কি জানেন না, আমারও অন্তকরণ ও অনুভূতি আছে। আমি দুঃখ ও বেদনা অনুভব করে থাকি। আর সে দুঃখও অতি তীব্র ও গভীর। আল–হামদু লিল্লাহ আমি সব কিছুটা সহ্য করে নিয়েছি। এ পোশাক স্কুল মানুক বা না মানুক, আমার বন্ধুরা ঠাট্টা–বিদ্রুপ করুক বা না

করুক, অথবা আমার উদ্ধত আমিত্ব বাধ্য হোক বা না হোক, আমাকে অবশ্যই স্কুলে যেতে হবে। আমাকে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে হবে। আমাকে আমার ভবিষ্যত গড়ে তুলতে হবে। যে ভবিষ্যতের স্বপ্ন আমার আব্বা আমার জন্যে দেখে থাকেন এবং নিজের সাধ্য অনুযায়ী সে উদ্দেশ্যে খরচ করেন।

আমাদের গ্রামের মানুষের কাছে দিনগুলো একইভাবে কেটে যাচ্ছে সংঘাত, ধৈর্য ও আশার সংমিশ্রণে। সবখানেই যুদ্ধের আলোচনা। দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতি ও তুলোর মন্দা ভাবের কথা ছাড়া মানুষের মুখে আর কোন কথা নেই। শহর থেকে শরণার্থীরা পালিয়ে এসেছে। বোমা পড়ে তাদের বাড়ীঘর ধ্বংস হয়ে গেছে। শায়খ হাফেজ শীহা তাঁর পূর্বের অভ্যাস মত আবার সেই রাজনীতি ও হিটলারের যুদ্ধ জয়ের সংবাদে ফিরে এসেছেন। আমি তাঁকে তার এক দোস্তের কাছে এমনি এক অর্থহীন বাজে প্রলাপ বকতে শুনলাম।

কিসের জন্যে আমরা যুদ্ধ করবো? সত্যিই কি আমরা জার্মানকে এমন ঘৃণ্য ও অপছন্দ করি, যা আমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিতে পারে? যদি তাই হয়, তাহলে ইংরেজই তো অধিকতর ঘৃণার পাত্র হওয়া উচিত।

–আমাদের নেতৃবৃন্দের ধারণা, আমরা স্বাধীন বিশ্বের পক্ষে লড়ছি এবং জার্মানীর নাজী ডিকটেটরশীপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করছি। ডেমোক্রেসির ভিত্তি মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন, আমাদের তার সহায়তায় এগিয়ে আসা উচিত।

শায়খ হাফেজ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। হাতে হাত মেরে তিনি বলতে থাকেন, যত সব পাগলামি। স্বাধীন বিশ্ব কোথায়? মিসরের কি আছে স্বাধীনতা, যার জন্যে আমরা লড়তে পারি? দেশে ইংরেজরাই তো সর্বেসর্বা। ইরাক চেয়েছিল, স্বাধীন রাজনীতির প্রবাহ সৃষ্টি করতে। কিন্তু চার্চিল ঘোষণা করেছিল তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ। এ দেশটি কি স্বাধীনতা ভোগ করছে? আলজিরিয়া, সিরিয়া, লেবানন, ইরান এসব দেশে কি স্বাধীনতা আছে?

অন্য বন্ধুটি সমর্থন করে বললেন,

–শায়খ হাফেজ, ঠিক কথাই বলেছেন। কিসের জন্যে আমরা যুদ্ধ করবো? আমরা তো আমাদের উদ্দেশ্য জানিনে।

–আমরা বরং অপমান ও গোলামীর ট্যাক্সই দিয়ে যাব।

শায়খ হাফেজ ঢোক গিললেন, ঘামে এবং ভয়ে ভয়ে ডানে–বাঁয়ে তাকিয়ে দেখে নিলেন খাদরা আসছে কি না। সে এলে তো তার মজলিসটি তিক্ত–বিরক্ত করে তুলবে। তিনি বললেন, সে ডেমোক্রেসি কোথায়? বন্ধু, গোটা দেশটাই তো জমিদার, ব্যবসায়ী, মনিব ও দাস। বুঝলেন?

তারপর তিক্ত বিদ্রূপের হাসি হেসে যোগ করলেন,

–হুসাইনকে আমি ভালবাসি। তবে আমার যবান তাঁর বিরুদ্ধে, অন্তর তাঁর সাথে।

আর একজন জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি চান, মিসরবাসী হিটলারকে ভালোবাসুক?

–তা তো বটেই। যখন কোন ব্যক্তি এগিয়ে আসে আমি যে দুঃখ–কষ্টের মধ্যে আছি

তা থেকে উদ্ধার করতে, তখন আমি কি তাকে ঘৃণা করবো? সেটা হবে আমার বোকামি। যা হোক, কায়রোয় যে বিক্ষোভ মিছিলটি হয়েছে এবং সেখানে উচ্চধ্বনি সহকারে হিটলারকে সাহায্যের আবেদন জানানো হয়েছে, তা আর কারো কাছে গোপন থাকবে না।

–উফ! শায়খ হাফেজ খুবই দুঃখের কথা। এখানে এমন বহু গাধা আছে, যারা ইংরেজদের অঙ্গীকার ও চুক্তিসমূহের ওপর বিশ্বাস করে। এসব চুক্তি ও অঙ্গীকারের বিনিময়ে আমরা যে তাদের লেজুড়, তাদের দুধের গাভী এবং তাদের সেই বিশাল সাম্রাজ্যের যেখানে সূর্য কখনো ডোবে না, বেষ্টনীতে পরিণত হচ্ছি।

–বন্ধু তুমি কি বলতে পার, মানুষ বন্ধু ও শত্রু কখন চিনতে পারে?

–কখন?

–যখন তারা নিজেদের ইতিহাস খোলে, পড়ে এবং জানে, কারা তাদের ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছে, কারা তাদের একতাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। তাদেরকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত করে অতি সহজেই যাতে ধ্বংস হতে পারে এবং কোনমতেই যাতে আর শত্রুর সামনে দাঁড়াতে না পারে, সে ব্যবস্থা করেছে।

–ইংরেজদের উপর আল্লাহর লা'নত। তারা আমাদের জীবনের সর্বস্তরে এক ধ্বংসাত্মক সংক্রামক ব্যাধি ছড়িয়ে দিয়েছে।

গভীর দুঃখের সাথে শায়খ হাফেজ মাথাটি দুলালেন। একটা ব্যাকুল অশ্রুবিন্দুর চিহ্ন তাঁর দু'চোখে ফুটে উঠলো। ঐ অবস্থায়ই তিনি বলে চলেছেন, আমাদের মান–ইজ্জতের প্রতি শত্রুরা চোখ মিটমিট করে তাকাচ্ছে এবং তারা তাকেই যত আলোচনা–সমালোচনার লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছে।

একজন শ্রোতা জিজ্ঞেস করলো, কি বলছেন, শায়খ হাফেজ?

–বলছি আমাদের মেয়েদের কথা। যাদের বিকিকিনি হচ্ছে ইংরেজ সাম্রাজ্যের সৈনিকদের কাছে, যারা আমাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে যুদ্ধ করছে। কত শত শত সেবিকা ও নর্তকী মোটাসোটা আশ্বাস ও প্রলোভনে প্রলোভিত হয়েছে, অভাব ও দারিদ্র তাদেরকে লম্পট ও দুশ্চরিত্রদের সহজ শিকারে পরিণত করেছে। এমনিভাবে ইংরেজদের সর্বনাশা বিপর্যয় আমাদের স্বাতন্ত্র্য, নৈতিকতা ও প্রাচীন ঐতিহ্যসমূহের মর্মমূলে প্রবেশ করেছে।

আমি আমার সকল অনুভূতি একীভূত করে শায়খ হাফেজের কথাগুলো শুনছিলাম। দুঃখ, ক্ষোভ আমার অন্তরকে কুরে কুরে খাচ্ছিল, যখন তিনি অতি সহজ ভঙ্গিতে ও অবলীলাক্রমে ব্যাখ্যা করছিলেন ইংরেজদের ষড়যন্ত্র ও সকল নষ্টামির কথা। আমি অবাক হয়েছিলাম, তাদের সম্পর্কে আমাদের রহস্যজনক নীরবতা ও তাদেরকে প্রশ্রয়দানের ব্যাপারটি লক্ষ্য করে। শুধু তাই নয়, তাদের বন্ধুত্ব নিয়ে আমাদের বড়াই করা দেখেও। আমি প্রথমে তাদের এই নীতিহীন পরিকল্পনার বিষয়টি বুঝতে পারিনি। সে পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা অগ্রসর হয়েছে আমাদের নৈতিক মূল্যবোধ, জাতীয় চেতনা ও স্বাধীনতার

স্পৃহাকে ধ্বংস করতে এবং বাদশাহ ও জমিদারদের সাহায্য করার জন্য। কিন্তু যখন আমি শুনলাম আমাদের মান-সম্ভ্রম নিয়ে তাদের অপকর্মের কথা, নর্তকী ও সেবিকাদের দেহ বিক্রির কাহিনী, তখন আমি ভীষণভাবে কেঁপে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার স্মৃতিতে ভেসে উঠলো বাসীমার ছবিটি।

যারা সেবিকা হয়েছে, বাসীমাও তো তাদের একজন। মুহূর্তেই আমার মনে প্রশ্ন জাগল, তবে তারও পরিণতি কি হবে অধপতন ও ধ্বংস যেমন অন্য হাজারো মেয়ের ভাগ্যে হয়েছে? পিচের মতন কালো একটা দুশ্চিন্তা আমাকে দারুণ ভীত করে তুললো। আমার অন্তরটি ঘৃণা ও ক্ষোভে ভরে গেল। তাহলে মানুষ ও নেকড়ের মধ্যে তো কোন পার্থক্য নেই। উভয়েই তো লোভী, হিংস্র জানোয়ার। লালসা ও কামনা-বাসনার ডাকে সাড়া দেয়া ছাড়া তাদের আর কোন লক্ষ্য নেই। মনে হচ্ছে নৈতিকতা, মূল্যবোধ ইত্যাদি যেন কবির কল্পনা, বানোয়াট, গাঁজাখুরি, আষাঢ়ে গল্প, স্বপ্নের জগত ছাড়া বাস্তবে তার কোন অস্তিত্ব নেই।

বাসীমা একটি ছোট্ট নিষ্পাপ মিষ্টি মেয়ে। সেও কি হবে ধ্বংসের শিকার? মানুষের অন্তরকে পুড়িয়ে কয়লা বানিয়ে দেয়। এই নিষ্ঠুরতা আমাকে বিক্ষুব্ধ ও মর্মাহত করেছিল। আমি আর শায়খ হাফেজ ও তার সঙ্গীদের আলোচনা শুনতে পারিনি। একটা মারাত্মক দুশ্চিন্তা আমাকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে আমার সমগ্র সত্তাকে প্রকম্পিত করে তোলে। আমি আমার শরীরে কাঁটার খোঁচা ও অন্তরে জ্বলন্ত আগুনের দহন অনুভব করতে থাকি। মনে মনে ভাবতে থাকি, ভাগ্যে যা থাকে থাকুক, এখন থেকে আমার সামনে যে ইংরেজই পড়বে, তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবো, তার হাডডি-মাংস কুকুরের সামনে ছুঁড়ে মারবো। এভাবে আমার মনের আগুন নিভাবো।

সত্যি, শৈশবের স্বপ্ন কত অদ্ভুত ধরনের হয়। কল্পনায় লাফালাফি করে, ভাঙ্গে-গড়ে এবং দাপট দেখায় যেমন দেখাতেন প্রাচীন আরবী লোক কাহিনীর দু'নায়ক- আবু যায়েদ হিলালী ও সাইফ বিন যি ইয়াযেম। আমাদের মনের মধ্যে যে সব ভাবের উদয় হতো পরিস্থিতি ছিল তার বাস্তবায়নের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাই আমরা বাস্তব থেকে পালিয়ে কল্পনার জগতে আশ্রয় নিতাম। যাতে আমরা শান্তি ও কিছুটা স্বস্তি পেতে পারি। যখন আমি বাড়ীর দিকে ফিরে তাকালাম, তখন শায়খ হাফেজকে বলতে শুনলাম, ভাইসব, ফাতেহা পাঠ করুন। আল্লাহ যেন আমাদের হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যান এবং হিটলারকে বিজয় দান করেন। ফাতেহা পড়ুন।

সবাই বিড়বিড় করে পড়তে লাগলেন এবং অত্যাচারী হারামযাদাদের ওপর অভিশাপ কামনা করলেন।

আমরা স্কুল থেকে ফিরছিলাম। সাঈদকে বললাম, তোমার কি হয়েছে সাঈদ? আজকাল তোমাকে দেখি খুব তাড়াতাড়ি রেগে যাও, বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়?

-আমার স্বভাবই এমন।

-কিন্তু এমন বদমেযাজী তো তুমি ছিলে না কখনো?

–সত্যি আমি বড়ডো ক্লান্ত। একটি কথাও আর সহ্য করতে পারিনে।

–কেন এমনটি হয়েছে?

সাঈদ তার ঠোঁট দু'টি নাড়াচাড়া করলো, বিষাদের একটা ছায়া তার মুখমন্ডলের উপর এসে পড়লো। সে কিছু বলতে চাইলো কিন্তু তার জিহবা আড়ষ্ট হয়ে রইল। কথাগুলো তার মুখের মধ্যেই আটকে থাকলো। সে কেঁদে ফেললো। বললাম, সাঈদ কথা বল। আমরা কি দু'জন ভাই নই? আমাদের মধ্যে তো পার্থক্য নেই?

সাঈদ সাহস পেল। সে হাত দু'টি মুষ্টিবদ্ধ করে আবেগের সুরে বললো, হাসান ইবন মুরসে আবু আফার এ সপ্তাহে আমাকে একটি বাজে কথা বলেছে।

–এক কথায় বল, কি বলেছে?

–এমন কথা যা বলা যায় না। আমার মুখ দিয়ে তা বলাও শোভন নয়।

–বল কি সাঈদ? এত বড় কথা?

–হ্যাঁ। সে আমার অন্তরে আঘাত দিয়েছে। যেভাবেই হোক আমি এর বদলা নেব। আমি তার চোখ দু'টি উপড়ে ফেলে অন্ধ বানিয়ে দেব। সে একটা অমানুষ।

সাঈদের আক্রোশ এত কঠোর ছিল যে, আমি ভয় পাচ্ছিলাম সে কোন অঘটন ঘটিয়ে না বসে। বললাম, নিশ্চয় সে তোমাকে ঈর্ষা করে। কারণ ক্লাসে তুমি প্রথম, আর সে তিন তিনবার ফেল মেরেছে। তার কথা ছেড়ে দাও। ঈর্ষায় জ্বলেপুড়ে মরুক।

–সুলায়মান, সে আমাকে জোরে এক থাপপড় মেরেছে। তার প্রতিশোধ নিতেই হবে।

–সে তোমাকে থাপপড় মেরেছে? কেমন করে সম্ভব? সে সাহসই করতে পারে না। আমি তাকে জানি, সে একজন চরম ভীরু, কারো গালে সে হাত উঠাতেই পারে না।

–সে আমাকে হাত দিয়ে মেরেছে একথা তো বলছি না, সে এমন কাজ করেছে, আমার দৃষ্টিতে তা হাত দিয়ে মারা থেকেও মারাত্মক।

–যা ঘটেছে, খুলেই বলো না।

–আমাকে সে বলেছে, তোমার অত ফুটানি কেন? তোমার বোন তো লোকের বাড়ীর চাকরানী!

উত্তেজনায় আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম, কি বললে?

দুঃখের সাথে সাঈদ বললো, হ্যাঁ, ঠিকই বলছি।

এই প্রথমবারের মত আমি আমার শান্তশিষ্ট ও নির্জন স্বভাববিরোধী হয়ে উঠলাম। নিজেকে আমি সম্বরণ করতে পারলাম না। আমার মাথার মধ্যে নানাবিধ চিন্তা ও ভাব ঢেউ খেলতে লাগলো। আমি বললাম, তাকে অবশ্যই মনে রাখার মত শিক্ষা দিতে হবে। না, আমি তার ঘাড় মটকে দেব। সে তার বাপের মতই ইতর, ভীতু।

সাঈদ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। মনে হলো, সে তার বিদ্রোহী স্বভাবের বিরোধী হয়ে উঠেছে। সে চাপা ক্ষোভের সাথে আস্তে–ধীরে বললো, না, সুলায়মান। আমরা তার উপর হাত উঠাবো না। এবারের মত মাফ করে দাও, যাতে আমাদের ব্যাপারটি প্রকাশ না পায়।

আমরা তাকে মারলে কি হবে? তাতে করে বরং যারা না জানে তারা জেনে যাবে যে, আমার বোন গৃহ-পরিচারিকা। ক্লাসে আমি প্রথম, এ জন্যে তারা আমাকে রেহাই দেবে না। এতে নিন্দুক ও হিংসুকের সংখ্যা বেড়েই যাবে। বিষয়টি আমরা উপেক্ষা করবো। হয়তো এমন একদিন আসবে, সেদিন আমি হাসান ইবন মুরসেকে জবর শিক্ষাই দেব। তার বাপের নামটি ভুলিয়ে ছাড়বো।

সাঈদের কথা যুক্তিসঙ্গতই ছিল। তার কথাগুলো বরং তার বয়স ও বুদ্ধির থেকেও বড় ছিল। কিন্তু মনে হচ্ছিল, ঘটনা ও মুসিবত তার কাজ করেই যাচ্ছে। তাই সঠিক মতামত ও সিদ্ধান্তকে বাতাসের মত উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যা হোক, আমি তার মতের কাছে মাথা নত না করে পারলাম না। তারপর সাঈদকে কিছু সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলাম, যাতে তার মনোকষ্ট কিছুটা লাঘব হয়।

আমি আলোচনার প্রসঙ্গ পাল্টানোর উদ্দেশ্যে বললাম, সাঈদ, আমাদের উচিত হবে, এ বছর প্রাণপণ চেষ্টা করা। সব বিষয়ে খুব বেশী বেশী নম্বর পেতে হবে, যাতে বিনা বেতনে মাধ্যমিক শিক্ষালাভের সুযোগ লাভ করা যায়।

-মাধ্যমিক শিক্ষা?

-হ্যাঁ।

-তুমি খুব লম্বা-চওড়া স্বপ্ন দেখে থাক।

-কী? তুমি কি তোমার লক্ষ্য থেকে ফিরে গেছ? তুমি কি বলতে না, তুমি তোমার দাদার মত সেনা-অফিসার হতে চাও?-যিনি আরাবীর সাথে মিলে খিদীবকে বিতাড়িত করতে চেয়েছিলেন এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন?

-মনে হচ্ছে, আমার আব্বা আমার পথকে সংক্ষেপ করতে চাচ্ছেন। এর থেকে বাঁচার কোন পথ আমার নেই। বরং তুমি বলতে পার আমি সেদিকেই ঝুঁকে পড়েছি।

-তুমি দেখছি আমাকে ভয় পাইয়ে দিলে।

-আমি আমার অন্তরে মোটেও শান্তি পাব না। এভাবে আমার আব্বা ও পরিবারের ওপর আমি একটা বোঝা হয়ে থাকবো। এ বছর আমি প্রাইমারী পরীক্ষায় পাস করলে সোজা চলে যাব বড় কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে। আমার আব্বা বলেছেন, আমার এ প্রাইমারী পাস সার্টিফিকেট দেখলে তারা বেশ ভাল বেতনই দেবে-তা দশ জুনাইয়ের বেশীও হতে পারে।

-এমন কথা তুমি বলো না।

-তুমি কি চাও আমার বোন বাসীমা আজীবন পরিচারিকাই থাকুক?

সাঈদ এমনভাবে কথা বলছিল যেন তার সামনে গ্রহণযোগ্য বিকল্প কোন পথ নেই। বরং তার উচিত হবে সেই একটিমাত্র ফটক দিয়ে প্রবেশ করা। সেখানেই আছে মুক্তি এবং সেখানেই আছে নিষ্কৃতি তার নিজের, তার পরিবার ও বোনের সুনাম ও মর্যাদার। আমি চিন্তা করতে লাগলাম ক্লাসের ফার্স্ট বয় সাঈদ সম্পর্কে-ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে তাকে পড়া

ছাড়তে হচ্ছে। আমি চিন্তা করতে লাগলাম হাসান ইবন মুরসে আবু আফার সম্পর্কেও–যে ক্রমাগতভাবে ফেলই করে যাচ্ছে। চিন্তা করে বিস্ময়ে আমার মাথা চক্কর দিয়ে উঠলো।

বললাম, হয়তো এর মাঝে আল্লাহর কোন রহস্য নিহিত আছে যা আমরা জানি না।

মনের ব্যথা মনে চেপে রেখে রাস্তায় নেমে পড়লাম।

সাঈদকে বললাম, এ ব্যাপারে এখন আর কিছু চিন্তা করো না। প্রথমত আমাদের কাজ হবে খুব খেটেখুটে পড়া এবং যথাসম্ভব একটা ভালো রেজাল্ট করা।

–তোমার দৃষ্টি তোমার ঘরের দিকে। ইনশাআল্লাহ তোমার তা হবে।

আমি জানিনে, কেন আজ সন্ধ্যায় বাসীমার কথা মনে পড়ছে। আরো মনে পড়ছে, আমার প্রতি তার রাগ আর অভিমানের কথা– মিটগামার থেকে তার জন্যে মিষ্টি না আনার জন্যে। আমি নতুন করে স্মৃতিচারণ করতে লাগলাম। এতে এক আশ্চর্য রকমের প্রশান্তি লাভ করলাম। স্বপ্নের মত স্মৃতিও মাঝে মাঝে প্রশান্তির উৎস হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ তখন বাস্তবের দুঃখ–বেদনা ও নিষ্ঠুরতার কাছ থেকে পালিয়ে তার কাছে আশ্রয় নেয়। কিন্তু নিজেকে ধোকা দেয়ার চেষ্টা করে বললাম, নিশ্চয় সে এখন আর মিষ্টি খেতে চাইবে না। কারণ ইসকান্দারিয়ায় অনেক মিষ্টি সে খেয়েছে।

শয্যায় যাওয়ার পূর্বে অবচেতনভাবে আমার মনে প্রশ্ন দেখা দিল, বাসীমা কবে ফিরবে? তাকে ও তার রাগ দেখার জন্যে আমি কতই না উদগ্রীব।

৫

আমার চাচার অধপতনের একটি চূড়ান্ত পরিণতি অবধারিত ছিল। একটি মর্মান্তিক পরিণতি। চাচা আব্বার কাছে এসে বললেন, ভাই, আপনি তো জানেন, আমার অংশে আর ছয় শতক জমি ছাড়া কিছু নেই।

–হাঁ, জানি।

–আমি বিশ্বাস করি, আমার মত অমিতব্যয়ী লোকের প্রয়োজন এর আয় দিয়ে মিটতে পারে না।

–এসব কথার কি দরকার? তুমি আমার ভাই, তোমার ও আমার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ছয় শতক বা তার থেকে কম–বেশী যা–ই কিছু তোমার থাকুক না কেন, সেটা আমার কাছে বড় কথা নয়। আমরা একই সাথে খাবো–পরবো–থাকবো। আমরা একে অপরের সুখ–দুখের ভাগী হবো।

চাচা মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, আপনি একজন মহৎ, উদার মানুষ। কিন্তু আপনার বাচ্চা–কাচ্চা রয়েছে। আপনার এ দায়িত্বের ওপর আমি অতিরিক্ত বোঝা হতে চাইনে। যথেষ্ট হয়েছে। আপনার এ আর্থিক দুর্গতি ও ঋণের জন্যে আমিই দায়ী। তবে আমার বড়

সান্ত্বনা, আমার জমিটুকু আপনার কাছেই আছে। বাইরে কেউ তা হস্তগত করতে পারেনি।

–চুপ কর! আমি তোমার বড় ভাই। তোমার আব্বারই স্থানে। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ করো না।

–যা–ই হোক, আমার কথাটি শেষ করা পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করুন। আমার এ চরিত্র, আমার এ স্বভাব সম্পূর্ণ বেকার বসে বসে আপনার ওপর বোঝা হয়ে থাকার দাবী করতে পারে না। এ কথা সত্য যে, আমি একজন নিকৃষ্ট নেশাগ্রস্ত মানুষ, কিন্তু যতক্ষণ আমার মধ্যে কিছুটা সদগুণ ও আত্মমর্যাদাবোধ অবশিষ্ট আছে, ততক্ষণ আমার উচিত হবে কিছুটা নড়াচড়া করা এবং নিজের জন্যে কোন কাজের খোঁজ করা। আশা করি আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ এবার সম্পূর্ণ করবেন। আপনি আমার অবশিষ্ট ছয় শতক জমি এবার কিনবেন এবং তার দামটা এক সঙ্গেই আমাকে পরিশোধ করবেন। কারণ এ টাকাগুলো এক সঙ্গে নিয়ে আমি কায়রো যেতে চাই। সেখানে কোন কাজ খোঁজ করতে চাই। যে কোন ধরনের কাজই হোক না কেন। এ ব্যাপারে আপনার মত কি?

–এটা একটা দুঃসাহসিক কাজ। এ ব্যাপারে আমি তোমার প্রতি সহানুভূতিশীল।

–আমাকে সবকিছুই সহ্য করতে হবে। আমি নতুন করে আবার কাজ শুরু করবো।

–তোমার কষ্টের কথা চিন্তা করে আমার দুঃখ হচ্ছে।

–আমি আমাদের এলাকার নির্বাচিত প্রতিনিধি এস, বেগের কাছে যাব। তিনি হয়তো আমাকে ছোট–খাট কোন কেরানীর চাকরি জোগাড় করতে সাহায্য করবেন, অথবা কোথাও শিক্ষকতার কাজেও লাগিয়ে দিতে পারেন। তা সে কোন বেসরকারী স্কুলেই হোক না কেন। মোটামুটি যোগ্যতা আমার আছে। একমাত্র মেডিকেল রিপোর্ট ছাড়া আর কোন বাধা আমার সামনে নেই। আল্লাহ আমাকে সাহায্য করবেন।

আমার আব্বা ও চাচার মধ্যে এ ধরনের কথাবার্তা চলছিল। আমার আব্বা স্নেহ, দয়া ও ভাইয়ের প্রতি মুহাব্বতের সুরে দিল খুলে কথা বলছিলেন। চাচাকে তিনি বারবার চাপ দিচ্ছিলেন গ্রামে থাকার জন্যে, আর চাচা গোঁ ধরে বসেছিলেন তাঁর সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্যে। কারণ তার এভাবে অবস্থান করা এক প্রকার রুচিহীন ও লজ্জাজনক কাজ, যা কোন পুরুষের জন্যে শোভন নয়। তবে তাঁর আশা–আকাংখা ও দুঃখ–বেদনা যত প্রবলই হোক না কেন, তিনি কিন্তু আমাদের গ্রামটিকে খুবই ভালোবাসতেন এবং গ্রামটিকে ছেড়ে যেতে সর্বান্তকরণে অপছন্দ করতেন। কিন্তু তাঁর তো কোন উপায় ছিল না।

একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। এ ছয় শতক জমি কেনার জন্যে আমার আব্বা প্রয়োজনীয় অর্থ এখন কোথায় পাবেন। তিনি কি আবার যাবেন মুরসে আবু আফারের কাছে, তাকে তেল মাখিয়ে রাযী করাতে, যাতে তিনি আগের ঋণের সাথে নতুন করে কিছু ঋণ দেন? আমার আব্বা এখনো তার পূর্বের ঋণ শোধ করতে পারেননি। কারণে–অকারণে মুরসে আবু আফার এখনো নিয়মিত আমাদেরকে সাক্ষাৎ দান করে যাচ্ছে। আর যে দারিদ্রের মধ্যে আমরা জীবন যাপন করছি দিন দিন তা যেন ফুলে–ফেঁপে বেড়ে যাচ্ছে।

আব্বার কালো মাথাটির সবটুকু সাদা হয়ে গেছে। তিনি দিন দিন শক্তিহীন হয়ে পড়ছেন। আর এদিকে চাচা, একেবারে ফকীর হওয়ার পর, এখন তাঁকে ভবিষ্যতের সন্ধানে বের হওয়া চাই–ই। আব্বা কি এবারের মত কানটি বন্ধ করে ফেলবেন, আর চাচাকে বলে দেবেন এ জমিটুকু অন্য কারো কাছে বিক্রি করার জন্যে? এভাবে শক্তভাবে টেনে ধরার কোন মানে নেই। আর আমাদের ভূমিতে অন্য কেউ আসতে পারবে না–এ কথাটিও অর্থহীন।

কিন্তু আব্বা অনেক কিছুই সহ্য করেছেন, অনেক রুক্ষতার সামনাসামনি হয়েছেন। সুতরাং দৌড়টা তিনি শেষ করবেন না কেন এবং এর বিনিময়ে ঋণের যে নতুন বোঝাটি কাঁধে উঠবে তা বহনই বা করবেন না কেন? কথায় আছে, বানরকে তারা বললো, তারা তোমার আকার পরিবর্তন করে দেবে। বানর বললো, তারা কি আমাকে হরিণ বানিয়ে দেবে? আব্বা বর্তমানে যে অবস্থায় আছেন, তা থেকে আর কি–ই বা খারাপ হবে? কষ্ট ও ঝড়–ঝাপটা সহ্য করতে করতে এখন তিনি পাহাড়ের মত কঠিন ও দুর্জয় হয়ে উঠেছেন।

মুরসের নিকট আব্বার যাওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ মুরসে, যেমন আমি একটু আগেই বলেছি, সে তার সাক্ষাৎ থেকে আমাদের বেশী দিন মাহরুম করতো না। এবার সে এলো। সে কিছুটা অবাকও হলো। কারণ অতীতের যে কোন দিনের তুলনায় আজ আমার আব্বার চেহারায় কিছুটা হাসিখুশির ভাব দেখা যাচ্ছিল। আজ তিনি কোন বিরক্তিও প্রকাশ করলেন না এবং মুরসের কথার কাটা কাটা সংক্ষিপ্ত জবাবও দিলেন না। যেমনটি তিনি সচরাচর করতেন। আমার মনে হয় না, মুরসে এর অর্থ বুঝতে ভুল করেছে। এ ধরনের অবস্থা সম্পর্কে সে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। মুরসে বললো, ওহে আবদুদ দায়েম, আমি তো আর ধৈর্য ধরতে পারছি না। ঋণ পরিশোধের যে একটি মাস সময় ছিল তা তো দু'মাসে এসে দাঁড়ালো। আপনি জানেন যদি আমরা এক সঙ্গে বসবাস না করতাম, তাহলে আমি একটুও ইতস্তত করতাম না বিষয়টি আদালতে তুলতে।

অবশ্য মুরসে ভুলে গেছে বা ভোলার ভান করছে যে, সে আমার আব্বার ওপর কোনরূপ অনুগ্রহ বা দয়া দেখায়নি বিষয়টি আদালতে উঠানোর ব্যাপারে। কারণ আমার আব্বা অতিরিক্ত সুদের অঙ্গীকার করে আরো এক মাস সময় বাড়িয়ে নিয়ে একটি দলিলে সই করে দিয়েছেন। এত লালসা ও নিষ্ঠুরতা সত্ত্বেও মনে করছে, সে সহ–অবস্থান ও প্রতিবেশীত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখেছে এবং তার সম্মান ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেনি। এমন নির্লজ্জতা দেখে আব্বার চোখ বন্ধ করা প্রয়োজন ছিল। তিনি তা করেননি। কারণ তাঁকে নতুন লেনদেন করতে হবে। নিতান্ত আকস্মিকভাবেই এ লেনদেনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

অল্পক্ষণ পর মুরসে বললো, ওহে আবদুদ দায়েম, আল্লাহই জানেন, আমি এসব অর্থের এক মিলিমেরও মালিক নই। মানুষ মনে করে, আমি এসব অর্থ যেন সাগর থেকে আনি অথবা মাঠে ফলিয়ে থাকি। তারা কি জানে না, এর সব কিছুই এতিম ও বিধবাদের এবং আমিও তাদের মতই একজন ঋণগ্রস্ত? আমি তো একজন মধ্যস্থতাকারী ছাড়া আর কিছুই

নই।

এ ধরনের অপ্রয়োজনীয় মিথ্যা কথায় আমার আব্বা ভীষণ বিরক্তি বোধ করেন। তাঁর পেশীগুলো টনটন করতে থাকে। যদি তিনি ধৈর্যের সাথে সম্বরণ না করতে পারতেন, তাহলে ছিঁড়ে যেন তা বেরিয়ে যেত।

আগের কথার জের টেনে মুরসে বলতে থাকে, আবদুদ দায়েম, মানুষের জিহবা যেন মুখের মধ্যে এক মুহূর্তও স্থির থাকে না। সব সময় তারা বলে বেড়ায়, আমার কাছে নাকি হাজার হাজার 'জুনাই' আছে। আর আমি নাকি একটা কৃষি ফার্ম, মোটর গাড়ী এবং একটা ধান-আটা মাড়াইয়ের মেশিনও কিনবো। আমি জানিনে, এসবের রহস্য কি। অবস্থা আমার এমন অনুকূলে আসেনি যাতে আমি সৌভাগ্যের রাত্রি দেখতে পারি। আমি কোন সোনার ভান্ডারও পাইনি।

অসহ্য লাগলেও আমার আব্বা মুরসের কথাগুলো হজম করে নিলেন। কোন কথার প্রতিবাদ না করে তিনি চুপ থাকলেন, যতক্ষণ না সে তার বারবার বলা কথাটি, যা কদাচিৎ সামান্য এদিক-ওদিক হয়ে থাকে, বলে শেষ করলো।

হঠাৎ আব্বা বলে ফেল্লেন, মুরসে শুনুন, নতুন করে আরো কিছু অর্থের আমার ভীষণ প্রয়োজন।

-আবদুদ দায়েম, কিন্তু কোত্থেকে দেব? আপনি কি মনে করেন, আমার কাছে টাকা পয়সা আছে, তারপরও আমি আপনাকে এভাবে তাড়া দিচ্ছি এবং পরিশোধের জন্যে পীড়াপীড়ি করছি? এ তো দেখছি বড় এক তামাশা।

-যেমন করেই হোক, আপনাকে দিতে হবে। টাকার খুবই প্রয়োজন। আপনি যত লাভই চান আমি দেব। বুঝলেন?

-আপনি তো সব অবস্থা জানেন।

-এ কারণে আমি নিশ্চিত, আমার প্রয়োজন আপনি পূরণ করতে সক্ষম।

-আসল....

আমার আব্বা তার কথা কেটে দিয়ে বললেন, আসল ফাসল বুঝি না। আসুন আপনাকে আমার মাদী মহিষটি দিয়ে দেব। আপনি যা অনেক বারই চেয়েছেন, অনেক বার কেনার কথাও বলেছেন। কি, এতে আপনি খুশি হবেন?

-কি বল্লেন?

-মহিষ, মহিষ। আপনার কাছে আমি বিক্রি করবো। কি, বিশ্বাস হচ্ছে না?

মুরসে কিছুক্ষণ নীরব থেকে তার বিচ্ছিন্ন চিন্তাসূত্রগুলো একত্রিত করে পরিকল্পনাটি শক্ত করে নিল। তারপর বললো, আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আগের পাওনা? কিভাবে তার সমাধান হবে?

-মহিষের দাম বাদ দিয়ে নতুন অর্থের সাথে মিলিয়ে নেব।

মুরসে কিছুক্ষণ চিন্তার ভান করলো। তারপর হাতের পুছা দিয়ে থুতনি চুলকালো

আব্বা বুঝতে পারলেন, তার মাথায় এখন কি ঘুরপাক খাচ্ছে। ত্বরিত তিনি বলে ফেল্লেন, তার সাথে অতিরিক্ত নতুন লাভও যোগ করে নেব। ভয়ের কিছু নেই।

এভাবে নতুন লেনদেনের পর্বটি শেষ হলো।

আব্বার অবস্থা সম্পর্কে বেশী কিছু বলতে পারবো না, যখন মুরসের ছেলে হাসান এসে মহিষটির দড়ি ধরলো, মনে হচ্ছিল, যেন তাঁর এক প্রিয়জনকে তিনি হারাচ্ছেন। অথবা মহিষটি যেন তাঁর পরিবারেরই একজন সদস্য ছিল। এখন কেউ তাকে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। লায়লা, আর সেই সাথে মাহমুদও মহিষটিকে আঠার মত জড়িয়ে ধরলো। তারা দু'জন ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো যাতে মহিষটি বেরোতে না পারে। আর আমার দাদী আমাকে বলতে লাগলেন, ওরে সুলায়মান, ওরে আমার দাদাভাই! জন্তু–জানোয়ার খুবই বিশ্বস্ত। তারা নিজ মালিক চেনে। তাকে ছেড়ে যেতে তাদের খুবই কষ্ট হয়। তুমি কি আমাদের মহিষটিকে দেখতে পাচ্ছো না, কিভাবে সে ব্যথা–বেদনায় বিলাপ করছে, তার দু'টি চোখ থেকে কিভাবে শ্রাবণের ধারা নেমেছে?

দাদী যখন দেখতে পেলেন, আমার চেহারায়ও আবেগের ছাপ ফুটে উঠছে, বললেন, বাছা মনে কোন কষ্ট নিও না। অর্থ এবং জীব–জানোয়ার সব সময় হাত বদল হয়ে থাকে। আজ যাচ্ছে তো কাল আবার ফিরে আসছে। নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের এ কষ্ট দূর করবেন। আমরা তখন অন্য একটি কিনে নেব। তুমি যাও, তোমার পড়া মুখস্থ কর। তারপর তিনি চোখ দু'টি লম্বা করে বিনীতভাবে ভিক্ষা চাওয়ার ভঙ্গিতে বলতে লাগলেন, ইয়া রব! আমার পেটের ছেলে আবদুদ দায়েম, তার ছেলে সুলায়মানকে আপনি নিজ হাতে তুলে নিন। আপনি তাকে কামিয়াবী দিন, তাকে বড় চাকুরে বানিয়ে দিন। ইয়া রাববুল আলামীন, আপনি তো আমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত।

আমার আম্মা বেচারী একটি কথাও বলতে পারেননি। তাঁর এ নীরবতার মধ্যে ছিল একটা গভীর ব্যথা ও আক্ষেপ। তিনি সকল ব্যথা পুঞ্জীভূত করে রাখতে অভ্যস্ত ছিলেন। কোনদিন কারো কাছে মুখ খুলে প্রকাশ করতেন না। আর এ কারণে যখন–তখন তাঁর বুকে যে ব্যথাটি দেখা দিত, এ মুহূর্তে তা চরমভাবে দেখা দিল। আরামে একটু ঘুমাতে পারছিলেন না, কিছু খেতেও ভালো লাগছিল না। এমনকি তাঁর চেহারার ছায়াটি আরো ঘন হয়ে গেল, তিনি শক্তি হারিয়ে ফেল্লেন। আমি নামাযে যাচ্ছিলাম। দেখলাম তিনি সিজদা করছেন। বেশ লম্বা সিজদা। মনে মনে বললাম, হয়তো বেশী বেশী বিনীত ভাব প্রকাশ করছেন। কিন্তু যখন তা বেশী দীর্ঘ হতে চললো, তখন আমার মনে সন্দেহ ও সংশয় দেখা দিল। এগিয়ে গিয়ে নাড়া দিতেই আমি দেখতে পেলাম তিনি অজ্ঞান। তাঁর চোখে–মুখে পানির ছিটা দেয়ার জন্যে এখানে–ওখানে পানির জন্যে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগলাম। একটা পিঁয়াজও খোঁজাখুঁজি করলাম, যাতে তা নাকের গোড়ায় ধরলে তিনি শুকতে পারেন। এভাবে আমি ছুটাছুটি করলাম। তিনি বেহুশ হয়ে পড়লে আমিও দিকবিদিক জ্ঞানহারা হয়ে পড়তাম। অনেকক্ষণ ধরে আমি ব্যথা অনুভব করতাম এবং ভীত–সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তাম।

আমার ভয় হতো, আম্মা বুঝি অচৈতন্যের শিকারে পরিণত হতে চলেছেন। তাহলে আমার প্রাণটিও তো বেরিয়ে যাবে। কিন্তু দাদী তাঁর অভ্যস্ত গতিতে হেঁটে আম্মার দিকে এগিয়ে এসে পড়তে লাগলেনঃ বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম। হে প্রতিপালক, হে পথ-প্রদর্শক! সাহায্য করো।.....হে সাইয়্যেদ ঈসা আল-ইরাকী, মানুষের কুতুব। আপনার হাতটি একটু বাড়িয়ে দিন। ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর তিনি আমার আম্মাকে নাড়াতে এবং পাশ ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা করতেন। বিড়বিড় করে কিছু দোয়া-দুরূদ পড়তেন। কিছু সময় পর খুব আস্তে-ধীরে আম্মা চোখ দু'টি খোলার চেষ্টা করে কি হয়েছে তা জিজ্ঞেস করেন। যেন নতুন করে তাঁর মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হচ্ছে এমনিভাবে। আমি বুঝতাম আম্মা একটি কঠিন ফাঁড়া কেটে উঠছেন। সর্বান্তকরণে আমি আল্লাহর প্রশংসা করতাম এবং মসজিদে ছুটে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ সিজদায় পড়ে থেকে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতাম। ঘটনাটি সব সময় এভাবে অতিক্রান্ত হতো। দাদী কোনরূপ মন্তব্য করতেন না। মাঝে মাঝে সামান্য তিরস্কারের সুরে বলতেনঃ সুলায়মানের মা, নিজের জানের ওপর একটু দয়া করো। তুমি অসুস্থ, দুর্বল। তোমার শরীরের জন্যে বিশ্রাম প্রয়োজন। তারপর ঠোঁট দু'টি একটু বেঁকিয়ে বলতেন, কিন্তু কে পড়ে, আর কে-ইবা শোনে। আমার কথা তো হাওয়ায় উড়ে যায়। বেশী দুশ্চিন্তা মনের মধ্যে পুষে রাখলে, জীবন খাটো হয়ে যায়। সুলায়মানের মা, আমার কথা একটু শোন, একটু ভালো কাজ কর।

সে সময় মানুষ ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচার জন্যে নিজ নিজ জান হাতে নিয়ে শহর থেকে পালাচ্ছিল। মিসরের গ্রামে-গঞ্জে ফিরিঙ্গি পোশাক পরা লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এরই মধ্যে আমার ফরীদ চাচা কায়রো যাওয়ার জন্যে মনস্থ করলেন। তিনি মৃত্যুর পরোয়া করেন না, ধ্বংসের ভয় করেন না। তাঁর সারা জীবনে তিনি এ রকম বেপরোয়া ভাব দেখিয়েছেন। মনে করতেন, জীবন ও মৃত্যু ভাগ্যের হাতে। মানুষ যেমন বলে থাকে, 'আমার কপালে পালানো লেখা নেই'-এ কথায় তিনি দারুণভাবে বিশ্বাস করতেন।

আমার চাচার অনুভূতিটা ছিল একজন লক্ষ্যহীন গন্তব্যহীন লোকের মত, যার সামনে না থাকে পথের কোন দিশা কিংবা নির্দিষ্ট কোন মাইলপোস্ট। তিনি যখন গ্রাম ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন তাঁর পকেটে কয়েকটি টাকা মাত্র, যার তিনি মালিক। তাঁর সামনে প্রশস্ত, হৈহট্টগোল পরিপূর্ণ কায়রোর জগত। এ ভিড়ের মধ্যে তিনি আশা করছেন একটি বাড়ীর, তা যত সংকীর্ণই হোক না কেন। ভাবা যায়, তাঁর পরিণতি কি হতে পারে?

ভাগ্য কি তাঁর প্রতি প্রসন্ন হবে, তাঁর আশা কি পূর্ণ হবে এবং তাঁর হৃদয় কি একটু প্রশান্তি পাবে? না কাজের ধান্দায় ঘুরতে ঘুরতে তাঁর সীমিত টাকাগুলো খরচ করে ফেলবেন এবং শূন্য হাতে এমনভাবে রাস্তায় এসে দাঁড়াবেন যে, কোন টাকা পয়সা নেই, মাথা গোঁজার জায়গা নেই, খাবারও নেই?

এ রকম একটি মারাত্মক চিন্তা আমাকে দারুণভাবে নাড়া দিচ্ছে, আমার চিন্তার স্বচ্ছতাকে ঘোলাটে করে ফেলছে। এক মুঠো জীবিকার জন্যে চাচা যে কষ্ট ভোগ করবেন সে কারণে নয়, বরং অন্য একটি কারণে আমি তা ভালো করেই জানি। তিনি কখনো কারো কাছে হাত পাতবেন না। কোন পরিচিত জনের কাছে গিয়ে একটি রাত কাটানো বা এক গ্লাস পানি পান করা থেকে তিনি ভবঘুরের মত ক্ষুধাতৃষ্ণায় মৃত্যুকেই প্রাধান্য দিবেন।

চাচা, আল্লাহ আপনার সহায় হোন। আমি তাঁকে ভালোবাসি এত কিছু সত্ত্বেও। কারণ তিনি বড়ো ভালো, মহৎ এবং আমার প্রতি বড় দয়ালু। আমি জানি নেশাগ্রস্তরা খুব তাড়াতাড়িই রেগে যায় এবং তাদের মধ্যে সহজেই অনৈতিকতা ঢুকে পড়ে। আমার কল্পনায় তাদের যে ছবিটি ভেসে ওঠে, তা হলো বিক্ষিপ্ত গোঁফ, মরচেপড়া দাঁত, চোখ থেকে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে, হাতে মোটা লাঠি এবং রক্তাক্ত শরীর। কিন্তু আমার চাচার মধ্যে এমনটি কখনো দেখিনি।

সে দিনটির কথা কখনো ভুলতে পারবো না, যে দিন তিনি কায়রো যাত্রা করেছিলেন। আমি বসেছিলাম ক্লাসে। আরবী ভাষা শিক্ষকের বক্তৃতা শুনছিলাম। তিনি আমাদের সামনে একটি রচনার বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করছিলেন। রচনাটির শিরোনাম ছিল মিসরের শিল্প বিপ্লব। শিক্ষক তাঁর বক্তৃতার মাঝখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করলেন একথা বলে, 'বিদেশীরা আমাদেরকে বুঝিয়েছে, আমাদের এদেশটি কেবল একটি কৃষিপ্রধান দেশ। কিন্তু ছেলেরা, প্রকৃত সত্য এই যে, মিসরের প্রভূত সম্ভাবনা আছে শিল্প প্রধান দেশ হিসেবে গড়ে ওঠার। আমাদের আছে লোহা, পেট্রোল, অন্যান্য বহু খনিজ পদার্থ এবং বিদ্যুতের বহু উৎস–যা কিনা শিল্প বিপ্লবের মূল ভিত্তি।'

শিক্ষকের কথার ধারাবাহিকতা আমি কেটে দিলাম এই বলেঃ তাহলে সরকার শিল্প বিপ্লবের জন্যে কাজ করছে না কেন?

শিক্ষক মহোদয় মৃদু হাসলেন। সম্ভবত তিনি মনে করলেন, এ প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব নানান মুসিবতের দিকে তাঁকে ঠেলে দিতে পারে। তিনি বললেন, ইনশাআল্লাহ সেদিন বেশী দূরে নেই, যেদিন সব কিছুই হবে। হে ভবিষ্যতের যুবকবৃন্দ, তোমাদের সাহসের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত।

আমি আরেক বার কথা বলার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছি এমন সময় 'মুশরিফ' অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক ক্লাসের দরজায় মৃদু খটখট আওয়াজ করলেন। বললেন, সুলায়মান আবদুদ দায়েম।

–জী।

–একটু এসো, সুপারের সাথে কথা বল।

আমি সুপারের কাছে গিয়ে দেখতে পেলাম আমার চাচা অপেক্ষা করছেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর আরো কিছু বন্ধু–বান্ধব আছেন। তাঁরা তাঁকে রেল স্টেশনে বিদায় জানাতে এসেছেন। কায়রো যাত্রার প্রাক্কালে চাচা চেয়েছিলেন আমাকে এক নজর দেখতে।

–সুলায়মান, কেউ জানে না এরপর আর কখনো তুমি আমাকে দেখতে পাবে কি না। কথা কয়টি আমাকে একটু তফাতে ডেকে নিয়ে বললেন। বারবার তিনি আমাকে উপদেশ দিতে লাগলেন। তখন তাঁর দু'চোখে পানি টলমল করছিল। তিনি তাঁর পূর্বের কথার জের টেনে বলে চললেন, এ বছর তুমি প্রাইমারী সার্টিফিকেট অর্জন করবে। সামনের বছরে তুমি ইনশাআল্লাহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে থাকবে। তারপর তুমি হবে একজন পুরুষ। আর তুমি জান পৌরুষের অর্থ কি? অর্থাৎ তুমি হবে একজন বড় দায়িত্বশীল। আমি আশা করি, তুমি হবে আমার থেকেও খোশনসীব। প্রথম ও শেষ কথা হলো, তুমি তোমার পড়ার প্রতি যত্নবান হবে। মিথ্যা বিক্ষোভ মিছিল পরিত্যাগ করবে। খারাপ কাজ থেকে সব সময় দূরে থাকবে। সুলায়মান, তোমার কাছে আমার একটি আরজু, আর তা হলো, সব সময় আমাকে চিঠি লিখবে।

আমি ইচ্ছা করলাম, তার ঠিকানা জিজ্ঞেস করি। কিন্তু দেখতে পেলাম, তিনি দরজার কাছে পৌছে গেছেন। প্রশ্নটি আমার দু'টি ঠোঁটের মধ্যেই আটকে রইল। আবার একটু মোড় নিয়ে তিনি আমার মাথায় চুমু খেলেন অত্যন্ত দরদ ও উদ্বেলিত আবেগের সাথে। যখন আমার হাতে হাত মেলালেন, তখন আর ছাড়তেই চান না। আমি তখন হতভম্ব হয়ে পড়েছি। একটু রসিকতা করে তিনি বললেন, এখনো তোমার আঙ্গুলে কালি লেগে ময়লা হয়ে থাকে? তুমি তো এখন আর ছোট নও, সুলায়মান। যা হোক, কারণটি আমি জানি। এ কারণে খুব শিগগিরই তোমার জন্যে পরিষ্কার ও সুন্দর একটি ফাউন্টেন পেন পাঠিয়ে দেব। তবে একটি শর্ত, তোমাকে পাস করতে হবে এবং তালিকায় প্রথম দিকে তোমার নামও থাকতে হবে।

তিনি তাঁর পথের দিকে এগুনোর আগে পাঁচ গুরুশের একটি চান্দির মুদ্রা হাতে নিয়ে আমার পকেটে ফেলে দিলেন। আমি যখন সেটি ফিরিয়ে দিতে চাইলাম, তখন আমার কথাটি তাঁর সতর্ক কানটিতে গিয়ে পৌছলো না। চাচা চলে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ আমি হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। শুনতে পেলাম সুপার তার টেবিলে ঠকঠক আওয়াজ করে বলছেন, সুলায়মান আবদুদ দায়েম, ক্লাসে যাও।

সুপারের কক্ষ ত্যাগ করার পর আমি নিজেকে সম্বরণ করতে পারলাম না। আমার চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো বন্ধ করার শত চেষ্টা সত্ত্বেও। একটা চাপা আবেগে আমার সত্তা প্রবলভাবে কেঁপে উঠছিল। আমি খুব তাড়াতাড়ি টয়লেটে গেলাম। স্থানটি ছিল নির্জন। কারণ তখন ছিল ক্লাসের সময়। সেখানে আমি আমার নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিলাম। আমার দু'চোখ থেকে অনবরত অশ্রু ঠেলে বের হলো। আমি অনুভব করলাম শুধু আমার চোখ নয়, আমার অন্তরটিও যেন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আমি মুখ ধোয়ার চেষ্টা করলাম। ধোয়া শেষ হতে না হতে স্মরণ হলো চাচার সেই কথাটি, 'কেউ জানে না সুলায়মান, এরপর তুমি আমাকে আর দেখতে পাবে কি না।' আমি নতুন করে কাঁদতে শুরু করলাম। অবশেষে আমার ভয় হলো, ব্যাপারটি জানাজানি হয়ে যাবে। শেষ বারের মত মুখে পানি

দিলাম। তারপর ক্লাসের উদ্দেশে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম। সিঁড়ির মাঝখানে আবার চোখ থেকে অশ্রু বেরিয়ে এলো। খুব দ্রুত হাত দিয়ে তা মুছে ফেল্লাম। কারণ আমার কাছে তো রুমাল নেই। অনুমতি নিয়ে ক্লাসে প্রবেশ করলাম। এবং চেষ্টা করলাম শিক্ষকের দিকে না তাকাতে। তিনি যেন আমার ব্যাপারটি বুঝতে না পারেন। কিন্তু তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে আমার চোখের পাতার ফোলা ফোলা ভাব ও চেহারায় বিষাদের স্পষ্ট ছাপ গোপন থাকলো না। তিনি বললেন, সুলায়মান, তোমার কি হয়েছে?

শিক্ষকের সম্মানে উঠে দাঁড়ালাম। আমার দৃষ্টি তখন আমার পায়ের পাতার দিকে। মনে হলো, আমি আবার ভেংগে পড়বো। কিন্তু শিক্ষক আমাকে তাড়াতাড়ি বসতে বললেন। তারপর তিনি পড়াতে শুরু করলেন।

বিকেলে বাড়ী ফিরলাম। আমার চাচার দেয়া পাঁচ গুরুশের রুপোর চাকতিটি তখনো আমার পকেটে। যখনই আমি সেটি স্পর্শ করছিলাম, তখনই আমার মধ্যে একটা শিহরণ অনুভূত হচ্ছিল। আমার হতভাগ্য চাচার কথা স্মরণ হচ্ছিল। আমার চাচার পকেটের প্রতিটি পয়সার প্রয়োজনীয়তার কথা মনে করে আমি অন্তরে চাবুকের আঘাত অনুভব করলাম। নিজেকে আমার মনে হলো, অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও অকৃতজ্ঞ। এ অপরাধবোধ আমাকে ভীষণ উত্তেজিত করে তুললো। একবার চিন্তা করলাম, এ পয়সা পাঁচটি আমরা যে খালটি পার হই, তার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলি। কিন্তু তাতেও আমার কষ্টবোধ হলো। বাড়ীতে পৌঁছেই বুঝতে পারলাম গোটা বাড়ীটি শোকাভিভূত। বিষাদের একটা থমথমে পরিবেশ বাড়ীর চারপাশে যেন তাঁবু গেড়ে বসেছে। প্রথমেই আমার দাদীকে পেলাম। তাঁর সেই উৎফুল্ল ভাব ও দৃঢ়তা কোথায় যেন পালিয়েছে। দু'চোখ ফেটে তাঁর অশ্রু বিগলিত হচ্ছে। আব্বা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে আছেন। আর আম্মা তাঁর সেই অভ্যেস অনুযায়ী বুকের যন্ত্রণায় কাঁতরাচ্ছেন। আমি কোন কথা না বলে রুপোর চাকতিটি আম্মার ঘরে ছুঁড়ে মারলাম।

সাঈদ হাফেজ কিন্তু সব সময় আমাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করছিল। যদিও আজ আমি চাচাকে হারালাম দীর্ঘ সময়ের জন্যে, কিন্তু সে তো তাঁর বোন বাসীমাকে হারিয়েছে আরো আগে। এভাবেই বিপদগ্রস্তদের ওপর বিপদ জমা হতে থাকে।

পরের দিন সাঈদ আর আমি যখন স্কুলের পাশে ঢালু স্থানটিতে নামছিলাম, দেখতে পেলাম একজন বৃদ্ধলোক দু'চাকার একটি ঠেলাগাড়ী সামনের দিকে ঠেলছে। বিভিন্ন ধরনের বই–পুস্তক, পুরনো ম্যাগাজিন, পত্র–পত্রিকা ও পকেট সাইজের গল্প–উপন্যাসে গাড়ীটি ভরা। লোকটি তার এসব জিনিসের ফুলিয়ে–ফাঁপিয়ে প্রশংসা করছে এবং খুব চড়া দামের কথা বলছে। তার কাছে কি আছে তা জানার একটা ঔৎসুক্য আমাদের পেয়ে বসলো। ছোট্ট একখানি চটি বই সাঈদ হাতে তুলে নিল। বইটি লিখেছেন একজন এডভোকেট দানশুয়ার ঘটনাবলী ও তার রক্তাক্ত ট্রাজেডিসমূহ সম্পর্কে। সাঈদ বইটি

কেনার ইচ্ছা প্রকাশ করলো। কিন্তু সমস্যা হলো মূল্য নিয়ে। সাঈদ বললো, আমার কাছে মাত্র তিন মিলিম আছে। লোকটি বললো, আধা গুরুশে বইটি আমি তোমাকে দিতে পারি।

সাঈদের চেহারায় বিমর্ষের ছাপ দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি আমি বললামঃ সৌভাগ্যক্রমে আমার কাছে দু'মিলিম আছে। এ দিয়ে তো আমরা বই কিনতে পারি।

সাঈদ খুশি হলো। বইটি সে নিয়ে নিলো।

এ ধরনের বই পড়ার প্রতি সাঈদের সব সময় ঝোঁক ছিল। হয়তো তার পিতার পরামর্শের কারণেও এমনটি হতে পারে। তার পিতা রাজনৈতিক আলাপ–আলোচনায় কখনো ক্লান্তি ও বিরক্তি বোধ করতেন না। তার সেনা–অফিসার দাদার স্বভাব তার মধ্যে এসে যাওয়ার কারণেই এটা হতে পারে। তিনি বহু কষ্ট সহ্য করেছেন এবং বহু বিপদ–আপদের সম্মুখীন হয়েছেন।

এ কথাটি আমার মনে কখনো আসেনি যে, এই ছোট্ট পুস্তিকাটিতে এত সুন্দর একটি কাহিনী থাকতে পারে এবং সে কাহিনী সাঈদের চিন্তা–চেতনা ও অনুভূতি যা সর্বক্ষণ তার অভ্যন্তরে দগ্ধীভূত হচ্ছে, তার ওপর এভাবে আলোকরশ্মি ফেলতে পারে।

স্বাস্থ্যের শিক্ষক ক্লাসে ঢুকলেন। সব ছাত্রই হুড়মুড় করে উঠে দাঁড়ালো কিন্তু সাঈদ দাঁড়ালো না। শিক্ষক দেখেও যেন দেখলেন না। এভাবে ব্যাপারটি ভালোয় ভালোয় চলে গেল। পড়ার মাঝখানে শিক্ষক বড় একটা ছবি আঁকলেন মানুষের হৃৎপিন্ডের। নানা রকমের রং ব্যবহার করে ছবিটি এমন স্পষ্ট করে তুললেন যাতে আমরা মাংসপেশী ও শিরাসমূহের মধ্যে পার্থক্য করতে পারি। বিস্ময়ে শিক্ষক মহোদয়ের জিহবা আড়ষ্ট হয়ে গেল। কারণ তিনি একটা অস্পষ্ট কোঁকানি শুনতে পেলেন। তিনি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। আমাদের সবার মুখের দিকে বারবার দৃষ্টি ঘোরাতে লাগলেন। আমরাও এদিক–ওদিক তাকাতে লাগলাম। শিক্ষক সাঈদকে দেখতে পেলেন, পেছনের বেঞ্চিতে সে গুটিসুটি মেরে বসে আছে। যেমন বুকশেলফের পেছনে কেউ পালিয়ে থাকে। মাথাটি নীচু হয়ে তার দু'উরুর কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেছে। আমি আস্তে করে তার হাত দু'খানি ধরলাম। শিক্ষকও সাঈদের দিকে এগিয়ে এলেন। তিনি চেষ্টা করলেন তার দু'হাতে কি আছে তা দেখার জন্যে। কিন্তু দ্রুত সে বুককেসের মধ্যে লুকিয়ে ফেললো। মনে হলো, সাঈদ নিজেকে সামলে নিয়েছে। তার কান্নাও থেমে গেছে। শিক্ষক জোর করে বুককেসের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। তিনি একখানি বই পেলেন, তারপর সবকিছুই বুঝতে পারলেন।

সাঈদ বইটির মধ্যে এমনভাবে ডুবে গিয়েছিল যে, আশেপাশের কোন খবর তার ছিল না। কাহিনীটি সে পড়েই চলল। সে মনেপ্রাণে কাহিনীর সাথে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। যখন দু'জন ইংরেজ সৈনিক গেল কবুতর শিকারের জন্যে। তারপর গম জ্বালিয়ে দেয়া, যা কৃষকরা সারা বছরের জন্যে কষ্ট করে বপন করেছিল.... সেই মহিলাটির হত্যার ঘটনা, যে কি না রাশিকৃত গমের কাছে বসেছিল, স্থানীয় অধিবাসীদের দলে দলে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিল, প্রচন্ড গরমে একজন সৈনিকের মৃত্যু, তারপর প্রতিশোধের দিনটি.... সেই রক্তিম

বর্ণের প্রতিশোধের দিনটি–যেদিন প্রকাশ্য রাস্তায় ফাঁসিমঞ্চ তৈরী করা হয়েছিল, তার কাঠের সাথে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছিল দানশুয়ার নিরপরাধ সন্তানদেরকে...।

আর সেই বীর শহীদ যাহরান, যার বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রবাদে পরিণত হয়েছে, মনুষ্যত্ব ও মানবতাকে পদদলিত করে চাবুকের কশাঘাতের সেই ঘটনাবলী, অবশেষে সেই সব মানুষ যাদেরকে অন্যায়ভাবে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

বিস্তারিতভাবে সাঈদ এ ঘটনাগুলো পড়ছে। তার অনুভূতি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে, তার সত্তাকে দারুণভাবে নাড়া দিচ্ছে। সে যেন দেখতে পাচ্ছে, প্রবহমান রক্ত, চাবুকের কশাঘাতে ক্ষত–বিক্ষত পিঠ, সেই বিষাদের ছায়া যা নেমে এসেছে গ্রামটির ওপর- সেই হতভাগ্য দানশুয়া গ্রামটির ওপর, শিশুদের কান্নার রোল, মহিলাদের বিলাপধ্বনি। সাঈদ পারলো না নিজেকে সামলাতে। সে কেঁদে ফেললো। তার সেই কোঁকানি, সেই ফোঁপানির শব্দ বেড়ে গেল। আর স্বাস্থ্যের শিক্ষক তা শুনে ফেললেন। আর আমরা সকলে মুখোমুখি হলাম একটা ভীতি ও বিস্ময়ের। কারণ, এ ধরনের ঘটনা আর কখনো ঘটেনি আমাদের ক্লাসে।

স্বাস্থ্যের পড়া থেকে এভাবে অমনোযোগী হওয়ার কারণে শিক্ষক শাস্তি দেননি সাঈদকে। এমনকি তিনি নিজেই বাদ দিলেন হৃৎপিন্ড, মাংসপেশী ও শিরা–উপশিরাগুলোর অসমাপ্ত অংকন এবং ব্যাখ্যাও শেষ করলেন না। তিনি আমাদের বিস্তারিতভাবে বলতে লাগলেন। দানশুয়ার ঘটনা, ইংরেজদের নিষ্ঠুরতা, মোস্তফা কামিলের প্রতিবাদ এবং নির্দয় যুলুমের বিরুদ্ধে বিশ্ববিবেকের সোচ্চার হয়ে ওঠা ইত্যাদি সম্পর্কে। আর আমরা ছাত্ররা, আমাদের ওপর একটা ভীতি ও বিনীত ভাব শিকড় গেড়ে বসেছিল। আমরা শুনছিলাম আমাদের জাতীয় ইতিহাসের সেই অংশটুকু এমন স্থিরভাবে যেন আমাদের প্রত্যেকের মাথার ওপর পাখী বসে আছে। তা এজন্যে নয় যে, বছর শেষে এ বিষয়ে আমাদের পরীক্ষা দিতে হবে। বরং তা ছিল আরো বড় এবং আরো মহৎ।

বেল বেজে জানিয়ে দিল জাতীয় ইতিহাসের ঘন্টাটি শেষ হওয়ার কথা। শিক্ষক সাঈদের স্বদেশপ্রেমের প্রশংসা না করে ক্লাস থেকে বের হলেন না। তিনি তাকে উৎসাহ দিলেন বেশী করে এ ধরনের পুস্তক পাঠের জন্য, যাতে বিধৃত হয়েছে ঔপনিবেশিক শক্তি ও আমাদের জাতির মধ্যে সংঘটিত কঠোর সংঘাতের কাহিনী।

বাড়ী ফেরার পথে আমি বললাম, সাঈদ, তুমি আমাকে লজ্জা দিয়েছো। এভাবে কেউ কি কাঁদে? ছাত্ররা তোমার দিকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছিল।

–সুলায়মান, অনিচ্ছা সত্ত্বেও এমনটি হয়ে গেল। আমি কান্না রোধ করতে পারিনি।

–যাহরানের ব্যাপারটি তোমাকে এতই ব্যথিত করেছে?

–ইংরেজরা অপরাধী। সুলায়মান, তারা ভীষণ অপরাধী, তাদের অন্তরে দয়ামায়া নেই। তারা ন্যায়–নীতিও জানে না।

–আল্লাহ তাদের ওপর বিজয়ী করবেন, যারা তাদের থেকেও শক্তিশালী তাদেরকে।

–তুমি কি হিটলারের কথা বলছো?

–হাঁ।

–কিন্তু আমি তো শান্তি পাব না, যতক্ষণ না আমি নিজেই তাদের থেকে বদলা নেব।

–এটা শুধু তোমার মুখের কথা। মিটগামারে তো তুমি ভয় পাচ্ছিলে, তাদের দিকে তাকাতেও পারছিলে না।

–আজ থেকে তাদেরকে আমি আর ভয় করিনে।

–তুমি কি আনতারা ইবন শাদ্দাদের মত সকাল–সন্ধ্যায় রূপ পরিবর্তন কর?

–সুলায়মান, এভাবে তুমি আমাকে ঠাট্টা করো না।

–দুঃখিত। বইটি আমাকে দাও। আমিও তোমার মত পড়বো।

–না, তুমি নিতে পারবে না।

–কেন? আমিও তো দু'মিলিম দিয়েছি।

–তা দিলেও। আমি আরও একবার পড়বো। তারপর তোমাকে দেব।

সাঈদ তার বাড়ীর দিকে যাচ্ছে। ডান হাতে তার বই ও খাতাপত্রে ভরা ব্যাগটি। কিন্তু দানশুয়ার বইটি তার বাম হাতে। জোরে মুঠ করে ধরে রেখেছে, যেন কেউ ছিনিয়ে নিতে না পারে।

৬

আমার চাচার কায়রো যাত্রার পর দু'টি মাস চলে গেল।

একদিন সকালে স্কুলের পিয়ন এসে ক্লাসে শিক্ষকের নিকট একটি চিঠি দিয়ে গেল। শিক্ষকের দু'টি চোখ ক্লাসের সবার ওপর ঘুরে শেষমেশ আমার ওপর এসে স্থির হলো। শিক্ষক চিঠিটি আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। সেই মুহূর্তটিতে আমি দারুণ খুশে ও আনন্দ অনুভব করলাম। সেই সর্বপ্রথম আমি আমার নামে লেখা একটি চিঠি গ্রহণ করলাম। তাহলে আমি তো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বনে গেছি, আমার কাছে বিশেষ বিশেষ চিঠিপত্র আসে। আমি অনুভব করলাম, আমার সহপাঠী ছাত্ররা আমার এ বিশেষ মর্যাদায় ঈর্ষা পোষণ করতে থাকবে।

ক্লাসে পড়ার মাঝখানে চিঠিটি খুলে আমি পড়তে পারিনি, চিঠিটি পকেটে ঢুকিয়ে রেখেছিলাম এবং এমন অধৈর্যের সাথে ঘন্টা শেষ হওয়ার প্রতীক্ষা করতে লাগলাম, যেন আমি কোন অগ্নিশিখার ওপর বসে আছি। কিছুক্ষণ পরপর পকেটে হাত ঢুকিয়ে চিঠিটি ছুঁয়ে দেখতে লাগলাম। আড়চোখে একবার দেখে নিয়ে দ্রুত সেটি বের করে ওপরে লেখা আমার নামটি পড়ছিলাম– 'সুলায়মান আফেন্দী আবদুদ দায়েম।' গর্বে আমার সিনাটি ফুলে উঠছিল। কতবড় সৌভাগ্য আমার। চিঠিটি যে আমার চাচার নিকট থেকে এসেছে, সে

ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। ঘন্টা শেষ হলো। আমি খামটি খুলে পড়তে শুরু করলামঃ

".....। আমি এখানে কায়রোয় দু'মাস যাবত বহু কিছুই দেখলাম, বহু কিছুই শিখলাম। তুমি অবাক হবে না, যখন তোমাকে তা বলবো। মানুষের সব সময় জীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটনের প্রয়োজন আছে। যখন আমার কোন একটি চেহারা প্রকাশ হয়ে পড়েছে এবং আমার ধারণা হয়েছে, আমি চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছে গেছি, তখন অন্য একটি চেহারা আমার নিকট প্রকাশ হয়েছে, যা আরো অভিনব ও আরো গভীর রহস্যে পরিপূর্ণ। সুলায়মান, মানুষ এখানে পাগলের মত দৌড়াতে ব্যস্ত। এখানে তারা মারাত্মক সংঘাতে লিপ্ত। জঙ্গলের হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের সাথেই তাদের সাদৃশ্য বেশী। সভ্যতাগর্বী মানুষ তারা নয়। যুদ্ধের দাবানল তাদেরকে অধপতন, বিকৃতি ও ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছে। বেটা, তাদের উচিত ছিল নানা রকম বীভৎস ঘটনাবলী এবং রক্ত ও মৃত্যুর নানা রং দেখে শিক্ষা লাভ করা। সব জায়গায় উর্ধ মূল্যের ভূতটি তার ভয়াবহ চেহারাটি নিয়ে উঁকি মেরে দেখছে। তুমি তাকে দেখতে পাবে বেকার-ভবঘুরেদের নেকড়ার মত ছিন্নবস্ত্রে, তুমি তাকে লক্ষ্য করবে মিছিলে রাস্তায়। হাসপাতাল, মাঠ-ময়দান কোথাও তাকে অনুপস্থিত পাবে না। সবাই ভবিষ্যতের চিন্তায় শংকিত। আগামীকালের জন্যে সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। ব্যক্তিস্বার্থ সবকিছু মাপার যন্ত্র ও মাপকাঠিতে পরিণত হয়েছে। এরই ভিত্তিতে সকল সম্পর্ক লেনদেন গড়ে উঠেছে। বেটা, এতে তুমি বিস্মিত হয়ো না। সারা বিশ্বে যুদ্ধের যে দাবানল প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছে, তা অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়, বরং তা কেবল এ জন্যেই। অর্থাৎ লালসা চরিতার্থের প্রতিযোগিতা এবং উপনিবেশ ও আধিপত্য বিস্তারের ষড়যন্ত্র।

তোমার কাছে হয়তো এসব কথা বোধগম্য হবে না। কিছুটা বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন বলেও মনে হবে। কারণ, তোমার কল্পনায় কায়রো, কায়রোর সৌন্দর্য, তার প্রভাব ও তার শাসকবৃন্দের যে ছবি অংকিত হয়েছে, তা আমার এ বর্ণনার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমাকে বিশ্বাস করো, এদের প্রকৃত সত্য হচ্ছে, মওজুদদারী, পৈশাচিক লালসা, ঔদ্ধত্য বস্তুবাদিতা, আত্মপূজা ও নৈতিক বিকৃতি। যুদ্ধ ও ঔপনিবেশিক-এ দু'টিই হলো এ সবের মূল ভিত্তি।

এখানে প্রতিটি স্থানেই ইংরেজ রয়েছে। মাতালের মত তারা নিজেদের পায়ের ওপর দাঁড়াতে সক্ষম হচ্ছে না। আমি জানিনে, এসব কি হচ্ছে বাস্তব জগত ও যুদ্ধের যন্ত্রণা থেকে পলায়নের উদ্দেশ্যে, না অধপতনে আকণ্ঠ ডুবে থাকা ও বেপরোয়া মনোভাবের কারণে?

শহরে যত ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষই থাকুক না কেন, ইংরেজরা লাভ করছে উৎকৃষ্ট খাদ্য-সামগ্রী, চমৎকার চিত্তবিনোদন ও অঢেল অর্থ। কারণ, মিসর অত্যন্ত মহানুভব দেশ। এমন কি তার লুন্ঠনকারীদের প্রতিও।

আমি কেন এভাবে তোমাকে যুদ্ধ ও মানুষের কথা বলছি? তা কি এ জন্যে যে, তোমার নিজের বোঝার ওপর আমি আরেকটি বোঝা চাপিয়ে দিতে চাই? বেটা, আমাকে তুমি ক্ষমা

করো। অতীতে আমি এ ধরনের বিষয়ে কথা বলতে ভালোবাসতাম না। কিন্তু এখন আমি বাধ্য হচ্ছি। কারণ, তোমার কাছে যা কিছু আমি লিখছি, যেদিকেই আমি যাচ্ছি তার সাক্ষাৎ পাচ্ছি। আমার মনের মধ্যে নানা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। তোমার কাছে বলে আমার মস্তিষ্কের বোঝা কিছু হালকা করা ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই। তাতে মনে হয়, আমি কিছু শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করতে পারবো।

এবার আমার ব্যক্তিগত বিষয়ে আসি। আমাদের এলাকার নির্বাচিত প্রতিনিধি এস, বেগের কাছে গিয়েছিলাম, হাসিমুখেই তিনি আমাকে সাক্ষাতদান করেছিলেন। আমার সামনে আশার আলো দেখতে পেলাম। আমার অন্তর থেকে সন্দেহ ও ভীতির অন্ধকার বিদূরিত হলো। তিনি আমাকে আবারো সাক্ষাতদানের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

দিন যেতে লাগলো। সাক্ষাতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চললো। কিন্তু আমি আমার উদ্দেশ্যে সফল হতে পারলাম না, অথবা জীবন ধারণের মত কোন কাজ যোগাড় করতে পারলাম না। তাঁর সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এক ব্যক্তি কানে কানে আমাকে বললো, আপনার কাছে কি তিরিশটি টাকা নেই?

–মোটেই না। বেশী হলেও দু'মাস চলতে পারে এর অতিরিক্ত আর কিছুই আমার কাছে নেই।

–পঁচিশ টাকা?

–বেগ সাহেব, আমার অবস্থা আপনাকে জানিয়েছি। তিনি তো আমার অবস্থা ভাল করেই জানেন।

অবজ্ঞাভরে লোকটি তার দু'কাঁধ দুলিয়ে বললো– মনে হচ্ছে, আপনি আপনার কাজ পূর্ণ করতে চান না, শেষ করতে চান না। যাই হোক, আপনি স্বাধীন।

একথা বলে তিনি চলে গেলেন।

প্রথম প্রথম আমার কাছে অসম্ভব মনে হয়েছে যে, এস, বেগ ও তাঁর সঙ্গী–সাথীরা এমন মনোবৃত্তির হতে পারেন। আমি ধারণা করতে পারিনি যে, একটু উপকারের বিনিময়ে আমার কাছে এভাবে তিনি ঘুষ চাইতে পারেন। আমার যোগ্যতা, আমার ক্ষমতা সম্পর্কে কিছুই আমাকে জিজ্ঞেস করেননি। তিনি প্রথমেই নিশ্চিত হতে চেয়েছেন, আমার পকেটে কি পরিমাণ অর্থ আছে তা জেনে।

গত নির্বাচনী যুদ্ধের সময় এস, বেগের সব কথা আমি সরলভাবে বিশ্বাস করেছিলাম। তিনি দেশের জনগণ, আত্মমর্যাদা, স্বাধীনতা, স্বদেশপ্রেম ইত্যাদি সম্পর্কে কত কথাই না তখন আলোচনা করতেন।

আমার এক পরিচিত লোকের মাধ্যমে আমি গেলাম এক রেশন ইন্‌সপেক্টরের কাছে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, আমার প্রতি একটা উপেক্ষার ভাব দেখিয়ে তিনি তার একটি লাভজনক লেন–দেনে ব্যস্ত থাকলেন। তা সত্ত্বেও বলতে হয়, লোকটি আমাদের সম্মানিত নির্বাচিত প্রতিনিধি থেকেও কিছুটা ভালো। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আমার জন্যে

একটি কাজ তালাশ করবেন। আমি এখন সেই প্রতীক্ষায় দিন গুণছি।

বেটা সুলায়মান!

'আমি ধারণা করতে পারিনি, জীবন এভাবে আমার এত প্রতিকূলে যাবে। যদি আমি জানতে পারতাম, আমি যা কিছুর মুখোমুখি হচ্ছি তার অর্ধেকেরও মুখোমুখি আমাকে হতে হবে, তাহলে নিজেকে এভাবে ভ্রমণে বের করার ব্যাপারে ইতস্তত করতাম। তখন এ জীবন থেকে মৃত্যু আমার অধিক কাম্য হতো। কিন্তু যা চলে গেছে, তা আর কখনো ফিরে আসবে না। এখন সবর করা ছাড়া উপায় নেই। আল্লাহর কাছে আমি কামনা করি, তিনি যেন এ যাত্রা আমাকে তওফীক দেন।

সুলায়মান, তোমাকে আমি জানাচ্ছি, আমি এখন আর গাঁজা ও আফিমের নেশা মোটেই করি না। শুনে হয়তো তুমি অবাক হচ্ছো। আসলে, আমিও তোমার থেকেও অবাক হই। এ ধরনের নেশা একটা দুরারোগ্য ব্যাধি। এই নেশা থেকে মুক্ত হওয়া এত সহজ নয়। পনেরোটি টাকা ছাড়া আমার কাছে আর কিছুই নেই। বেশী দিন তাও আর পকেটে থাকবে না। তাই, নেশার পেছনে কিংবা তুচ্ছ, অনাবশ্যক প্রয়োজনে সেগুলো খরচ করে ফেলা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। সত্যি সত্যিই সুলায়মান, দুর্ভাগ্য ও দুর্বিপাক মানুষকে বহু কিছুই শিখিয়ে থাকে। আমি তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, তোমার পড়ার প্রতি নজর ও গুরুত্ব দেয়ার কথা। তোমার আব্বা, আম্মা, ভাই-বোন এবং আমার আম্মা-আল্লাহ তাঁদেরকে হিফাযত করুন, সবাইকে আমার সালাম জানিও।

তোমার চাচা।"

আরো একটা সময়সীমা- তা মোটেই কম হবে না- অতিবাহিত হলো। এর মধ্যে চাচা আর কোন চিঠিপত্র লিখলেন না। সম্ভবত তাঁর জন্যে মোটেই সুখকর নয় এমন সব সংবাদ পরিবেশন করে আমাদের বিরক্ত করা তিনি ভালো মনে করেননি। সব দুঃখ তিনি মনেই চেপে রাখার চেষ্টা করলেন। তিনি তাঁর এই কষ্টকর প্রবাস জীবনের যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশা ভগ্নহৃদয়ে একাই ভোগ করতে লাগলেন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর সম্পর্কে টুকরো টুকরো বিকৃত খবর বেশ কিছু দিন পরপর আমাদের কাছে পৌছাচ্ছিল, কায়রো থেকে প্রত্যাগত এক ব্যক্তি এসে বললো, সে আমার চাচাকে একটি কাঠের তখ্তা মাথায় করে বহন করতে দেখেছে। আর তখ্তার ওপর বেশ কিছু রুটি সাজানো। আর একজন এসে বললো, সে আমার চাচাকে দেখেছে, একজন কন্ট্রাকটরের অধীনে কাঠের গৃহনির্মাণ-সামগ্রী বহন করতে। তাঁর পরনে ময়লা, ছেঁড়া কাপড়, দাড়ি অযত্নে-অবহেলায় বিক্ষিপ্ত। এসব সংবাদ আমার অন্তরে এক গভীর ব্যথা ও ক্ষতের সৃষ্টি করতো। সত্যি এ এক দারুণ যন্ত্রণাদায়ক চিত্র যে, আমার চাচা এভাবে তুচ্ছ মানবেতর জীবন যাপন করছেন। যিনি কি না কুরআন হিফয করেছেন এবং বহু জ্ঞান অর্জন করেছেন। তিনি তাঁর প্রথম জীবনেই ভুল করেছেন, ডাক্তারী সনদ লাভে ব্যর্থ হয়েছেন।

আর এখন এমন একজন মাধ্যম ব্যক্তি খুঁজতে গিয়ে হোঁচট খাচ্ছেন, যে তাঁকে হাত ধরে তাঁর স্বপ্নের একটা শান্ত ও স্থির জীবনের দিকে পথ দেখিয়ে দিতে পারে।

হায়রে বিপদ! আমার চাচা কি রুটি বিক্রি অথবা গৃহ-নির্মাণ সামগ্রী বহনের মত কাজ করতে পারেন? তবে এটা ঠিক যে, অপরের কাঁধে বোঝা হয়ে থাকার অপমান থেকে, এ কাজ সম্মানজনক। কিন্তু এ তো অনেক অনেক বেশী।

যখনই আমি এসব খবর শুনতাম কোণার একটি থামের ধারে গিয়ে আশ্রয় নিতাম। এই ছিল আমার অভ্যেস। সেখানে গিয়ে চোখের পানি ছেড়ে দিতাম। অক্ষমদের প্রধান হাতিয়ারই চোখের পানি। এ ছাড়া আমি আর কিইবা করতে পারতাম? অবশ্য আমার হাতে যদি কিছু ক্ষমতা থাকতো, তাহলে আমি অনেক কিছুই করতে পারতাম।

দাদীর স্বাস্থ্য ভেংগে পড়েছিল। তিনি সব সময় এই পুত্রবাৎসল্যে অধীর হয়ে শোক প্রকাশ করতেন। আব্বাকে তিনি বললেন, ওরে আবদুদ দায়েম, তুই মিসর গিয়ে তোর ভায়ের খোঁজ-খবর নিবিনে?

-আম্মা, সে কোথায় থাকে তাতো আমি জানিনে। এখনো পর্যন্ত সে তার ঠিকানা আমাদেরকে জানালো না।

-তোর ভাই তোর দেহের একটি অংশ, আর তুই তার একটি অংশ, বুঝলি বেটা।

-আম্মা, আপনি ও সে দু'টি মানুষ আমার দু'টি চোখের মণি। আর আপনি তা ভাল করেই জানেন। তাকে আমি বারবার বলেছিলাম আমাদের সাথে থেকে যেতে, আমাদের সকলেরই রিযিকের দায়িত্ব তো আল্লাহর। কিন্তু সে ঘাড় বাঁকিয়ে চলে গেল।

-এটা কি সত্যি যে, সে রুটি বেচে আর দিন মজুরীর কাজ করে যাচ্ছে?

আব্বা হাঁ, না, কোন জবাব দিলেন না।

দাদী কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আবদুদ দায়েম, আমার ভয় হচ্ছে আমি মরে যাব। আর হতভাগা ফরীদকে এক নজর দেখে একটু নিশ্চিন্ত হয়েও মরতে পারবো না।

-ব্যাপারটি আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিন। আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন, অন্তরে কোন দুঃখ ও দুশ্চিন্তা জমা করে রাখবেন না।

-বেটা, তার জন্যে আমার অন্তর ক্ষত-বিক্ষত।

-ভবিষ্যতে সে একজন অফিসার হবে আম্মা, প্রত্যেকটি জিনিসের শুরুতে দুঃখ-কষ্ট থাকে। আর এ যুদ্ধটাই হচ্ছে সব অনিষ্টের মূল।

-ইয়া রব! আমার অবস্থা তোমার কাছে গোপন নেই। তোমার রহমত তো আমার চাওয়ার অপেক্ষা রাখে না।

যুদ্ধের খবর দারুণভাবে পাল্টে গেল। ইংল্যান্ড ও তার মিত্রশক্তির পাল্লা ঝুঁকে পড়লো। জার্মান বাহিনী পশ্চাদপসরণ করলো। কিন্তু তারা তাদের পশ্চাতে ছেড়ে এলো জান-মালের

ধ্বংসের বিরাট স্তূপ। রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে স্টালিনগ্রাদে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাতে রাশিয়া মরণপণ আক্রমণ চালিয়ে জার্মানীকে পরাজিত করে। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের পাল্লা এক দিকে ঝুঁকে পড়ার পেছনে এ যুদ্ধের প্রভাবই সর্বাধিক।

হাঁ, একের পর এক হিটলারের পরাজয় হতে লাগলো। বন্যার স্রোতের মত আমেরিকার সাহায্য ইউরোপে আসতে শুরু করলো। ফলে ইউরোপের অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে উঠলো। ইউরোপ তার ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের মত বহু সমস্যার সমাধানে অনেকটা সক্ষম হলো। ফ্রান্স দীর্ঘদিন যাবত পরাজয়ের গ্লানি ভোগ করে আসছিল। সে এবার নতুন প্রাণ ফিরে পেল। সে তার এই কলঙ্ক–চিহ্ন মুছে ফেলার জন্য নতুনভাবে নড়াচড়া শুরু করলো। দক্ষিণ আফ্রিকাকেই তার আগ্রাসনের প্রাথমিক ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিল। এদিকে ইংরেজ তার অধীনস্থ জাতিসমূহকে নানা রকম মিষ্টি মিষ্টি প্রতিশ্রুতি দিল। এ সকল জাতির সন্তানরা নাজী শক্তির বিরুদ্ধে ইংরেজদের পক্ষে লড়বে, তাদরকে রসদপত্র ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করবে, বিনিময়ে ইংরেজ তাদেরকে স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন দেবে। এ ধরনের অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি ইংরেজরা দিল।

স্বভাবতই শায়খ হাফেজ শীহাকে এসব সংবাদ মর্মান্তিক পীড়িত করলো। তিনি দারুণভাবে ব্যথিত হলেন। তিনি ধারণাই করতে পারেননি যে, এভাবে হিটলার পরাজয় বরণ করবে এবং মিত্রশক্তি আর তার ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া সঙ্গীরা এভাবে দু'পায়ের উপর আবার দাঁড়াতে সক্ষম হবে। হিটলারের এ পশ্চাদপসরণের ব্যাখ্যার জন্য শায়খ হাফেজ নানা ধরনের ওজর–আপত্তি আরোপ করার চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি এটাকে হিটলারের ধোকা, চালাকি ও সামরিক ট্যাকটিসের রূপ দিতে চেষ্টা করলেন। কারণ, যুদ্ধ মানেই তো ধোকা। এ জন্যে শায়খ হাফেজ সব সময় এ ধরনের খবরের অপেক্ষায় থাকতেন যে, কোন যুদ্ধে হিটলার একটু সুবিধে করতে পারলো কি না বা কিছু জায়গা পুনর্দখলে সক্ষম হলো কি না। তখন তিনি হৈচৈ করে গ্রামটা তোলপাড় করে ফেলতেন। বলতেন, জার্মানরা নতুন করে আক্রমণ পরিচালনা শুরু করেছে। দেখা যাক, ইংরেজ ও আমেরিকানরা ঠেলা এবার কিভাবে সামলায়। তাদের একজনকেও হিটলার এবার ছেড়ে দেবে না। তারা এবার বুঝতে পারবে কত ধানে কত চাল। কিন্তু অধিকাংশ সময় শায়খ হাফেজের ধারণা মিথ্যায় পর্যবসিত হতো। কারণ মিত্রশক্তির অগ্রগতি প্রায় সময়ই অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠতো এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূখন্ড থেকে জার্মানদের হাত গুটিয়ে নিতে হতো।

শায়খ হাফেজ একদিন তাঁর সঙ্গীদের সাথে বসে আছেন। যুদ্ধের পরিস্থিতি নিয়ে তিনি নানা ধরনের দর্শন তৈরী করছেন। তিনি তাঁর অভ্যেস অনুযায়ী বিস্ময় ও সম্মানসূচক নানা রকম প্রশংসার তকমা হিটলারের গায়ে এঁটে দিচ্ছিলেন। শায়খ হাফেজ বললেন, একথা সত্যি হিটলার রাশিয়া থেকে পিছনে হটে গেছে। তবে তোমরা ভুলে যেও না, প্রকৃতিই তাকে বাধ্য করেছে। শীতকাল সৈনিকদের জন্যে কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। সব জিনিসই জমে যাচ্ছিল। এমনকি গাড়ী ও প্লেনের তেল পর্যন্ত। শুধু তাই নয়, সৈন্যদের পেশী ও শিরা–

উপশিরার রক্তও।

–আশ্চর্য, এমন কি হয়?

–কেন হবে না?

অন্য একজন বলে উঠলো, আর রাশিয়ানরা? এত ঠান্ডার মধ্যেও কি তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে না?

–কিন্তু এ–তো তাদের দেশ ভাই। তারা সে দেশের আবহাওয়ায় অভ্যস্ত। রাশিয়া বিশাল আয়তনের দেশ। তারা লোহা–লক্কড় ও পাথর দিয়ে ব্যারিকেড সৃষ্টির পরিবর্তে মানুষের মৃতদেহ দিয়ে ব্যারিকেড সৃষ্টি করছে। রাশিয়ার জনসংখ্যা পাথর ও বালুকণার মত সীমা–সংখ্যাহীন। আল্লাহ হিটলারের পেছনে আছেন। তারা তো রাশিয়ায় মানুষের মত লড়ছে না। পশুর মত জীবন–মৃত্যুর পরোয়া না করে লড়ে যাচ্ছে।

–তবে আপনি কি মনে করেন, হিটলার স্টালিনগ্রাদ যুদ্ধে ফিরে আসবেন?

–কেন আসবেন না? হিটলার একজন লৌহমানব। তিনি কখনো পিছু হটবেন না, উপনিবেশবাদীদের কাছে নত হবেন না। সুতরাং তাদের ধ্বংস অবধারিত।

–শায়খ হাফেজ, আমি এ ব্যাপারে সন্দিহান।

–লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। সন্দেহ কেন? মিত্রশক্তি বিগত বছরগুলোতে ড্যাম ডিফিট খেয়ে এখন আবার জিততে শুরু করেছে। ফ্রান্সও হাত গুটিয়ে নেয়ার পর নতুন করে নড়াচড়া আরম্ভ করেছে। তাহলে মহান জার্মানীর কিছু জায়গা হারানোকে এত বড় করে দেখছো কেন? তুমি কি ভুলে গেছ, এসব অঞ্চল জার্মানী খুব অল্প সময়ে ঝড়ের গতিতে এসে দখল করে নিয়েছিল?

–আমেরিকা ও রাশিয়া যুদ্ধের গতিপ্রকৃতির উপর বিরাট প্রভাব ফেলেছে। আমেরিকার আয়ের উৎস অনেক। পক্ষান্তরে, জার্মানী যুদ্ধের সাজ–সরঞ্জামের দারুণ সংকটে ভুগছে।

–আচ্ছা, আপনারা কি একটুও চিন্তা করেন না? এ সবই ইংরেজদের নোংরা অপপ্রচার। হিটলারের যা মওজুদ আছে তাতে বহু বছর চলে যাবে। তোমরা কি DEPOT NO.-13–এর কথা শোননি? হিটলার তো অত্যন্ত দয়ালু মানুষ। তাই ইউরোপের ওপর তা তিনি প্রয়োগ করতে চান না। তাদের মধ্যে শুভবুদ্ধির উদয় হবে, এ আশায় তাদেরকে ঢিল দিচ্ছেন। তারা যদি তাদের নির্বুদ্ধিতার উপর বাড়াবাড়ি করতে থাকে, তাহলে এই মারাত্মক DEPOT NO. 13 তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হবে। হিটলার তো চান বিভিন্ন দেশ ও সে দেশের মানুষকে শাসন করতে- ধ্বংস ও পোড়া মাটি তিনি চান না। কি, তাই না?

অন্য এক সঙ্গী সায় দিয়ে বললো, শায়খ হাফেজ, আমরা সবাই তো হিটলারের জয় কামনা করি। কিন্তু তার এ পিছু হটার সংবাদে আমরা বেশ উদ্বিগ্ন।

–বেশ ভালো কথা। তাছাড়া আরেকটি জিনিস আছে, তা কি তোমরা শুনেছো?

–কি সেটা?

–আণবিক বোমা। এই বোমার একটি যদি লন্ডনের ওপর ফেলা হয়, তাহলে ধরাপৃষ্ঠ থেকে তার অস্তিত্বই একেবারে মুছে যাবে। মানুষ, জীব–জানোয়ার, গাছ–পালা কিছুই থাকবে না। কোন উপায় না দেখলে হিটলার তা ফেলবেন এবং যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটাবেন।

–কেন তার একটা ফেলে আমাদের মুক্তি দিচ্ছে না?

–কারণ, তিনি তো অত্যন্ত রহমদিল মানুষ।

–ওহে শায়খ হাফেজ, যুদ্ধে কি কোন দয়ামায়া আছে? কসাইখানার রক্ত তো সকাল–সন্ধ্যায় শুকাচ্ছে না। মানবতার কসাইখানা সর্বস্থানে। সুতরাং আপনি কেমন করে দয়ামায়ার কথা বলছেন?

তাদের এ সমালোচনায় শায়খ হাফেজ এবার একটু বিরক্তি বোধ করলেন। আসলে তারা সবাই কিন্তু অন্তরের অন্তস্তল থেকে হিটলারের বিজয় কামনা করে। তবে এই জীবননাশের জন্যে তারা ব্যথিত। তাদের এ আলোচনায় সেই ব্যথারই প্রতিধ্বনি ফুটে উঠেছে। কিন্তু শায়খ হাফেজ চান, হিটলারের বিজয় সম্পর্কে তাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র সন্দেহ–সংশয় না থাক। তিনি বরং এ বিজয়কে সন্দেহ–সংশয়ের উর্ধে নিশ্চিত একটা বিষয়ে পরিণত করতে চান। যদিও তিনি নিজের মনের মধ্যেও হিটলারের পরিণতি সম্পর্কে একই ধরনের ভয়–ভীতি ও সংশয় অনুভব করে থাকেন। এ কারণে তিনি গলাখাঁকারি দিয়ে মাথাটি নাড়লেন। যেন ঘটনার পরিণতি সম্পর্কে তিনি একজন অভিজ্ঞ পন্ডিত। তারপর বললেন, আমি যা বলছি, তা তোমরা একদিন মনে করবে। আমি আমার সব কিছু আল্লাহর ওপর সোপর্দ করছি। আল্লাহ তো বান্দার সব কিছু দেখছেন। কিন্তু খাদরা সব সময় ওঁৎ পেতে থাকেন শায়খ হাফেজের জন্য। যখনই রাজনীতি বিষয়ক আলোচনা তুঙ্গে ওঠে এবং তুমুল লড়াই শুরু হয়ে যায়, তখনই হঠাৎ করে তিনি এসে শায়খ হাফেজের সব মজা নষ্ট করে দেন।

শায়খ হাফেজ ধারণা করেন, তার সাথে খাদরার শত্রুতার কারণ, হিটলারকে খাদরার অপছন্দ। আর হিটলারকে অপছন্দ করলে তার শত্রু মিত্রশক্তিকে নিশ্চয় সে ভালবাসে। আমেরিকানরা যেমন বলে থাকে যারা আমাদের পক্ষে নয়, তারা আমাদের বিপক্ষে। এ কারণে শায়খ হাফেজ তাঁর স্ত্রীকে এমনভাবে দেখেন যেন সে হিটলার ও তার মহান প্রতিরোধের প্রতি আস্থা ভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত।

খাদরা শায়খ হাফেজের মজলিসে দেখা দিলেন এবং গলা ফাটানো চিৎকার করে বলতে লাগলেন, লক্ষ লক্ষ মুসিবত এ হিটলার ব্যাটা ও তার পক্ষের লোকদের জন্য। উঠুন, খন্দের এসে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে। উঠুন, এক নালা ভাত জোটে এমন কিছু করুন।

–হয়েছে, হয়েছে। বাজে কথা বলো না। আমি যদি উঠি। তাহলে উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়বো। বাড়ীতে যাও। হিটলারের তুমি কি বোঝ?

খাদরা তার একখানা হাত গালের উপর রাখলেন। মুখটি একটু ঝুঁকিয়ে ক্রোধভরা ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে বললেন, এ হিটলারই কি সাঈয়্যেদ আল–বাদাবীর

উপর বোমা ফেলেনি? যদি আল্লার রহমত না হতো, তাহলে মসজিদ, উঁচু উঁচু দালান-কোঠা সব ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেত। আজ সেখানে পেঁচা বাস করতো। তা সত্ত্বেও বলছেন, হিটলারের রহম আছে। হিটলার ইসলাম ভালোবাসে। হিটলার একজন মানুষ। তার মত মানুষ খুব কমই আছে! ওঠেন তো। যান দু'খান রুমাল বিক্রি করেন। ওখানে যারা ছিল তারা সবাই একযোগে হো হো করে হেসে উঠলো। জোরে জোরে হাতে তালি ও হৈচৈ শুরু করে দিল। একজন বললো, শায়খ হাফেজ শক্তিশালী যুক্তি উপস্থাপন ও সুবক্তা হিসেবে আপনার স্ত্রী আপনার থেকে বেশী না হলেও কিছুমাত্র কম নন, দেখছি।

-তার এ বাকপটুতার জন্য বিস্মিত হবেন না। কারণ, পুরুষের আছে অন্তর আর মেয়েদের জিহ্বা। কি, ঠিক বলিনি?

-না তা নয়, বরং রাজহাঁসের বাচ্চা সাঁতার কাটেই।

-হাঁ, তা বটে। তবে তার বাচ্চা, স্ত্রী নয়।

তারা সকলে নতুন করে হাসিতে ফেটে পড়লো। এর মধ্যে শায়খ হাফেজ স্থান ত্যাগের জন্যে উঠে পড়লেন। উঠবার সময় পত্রিকার পৃষ্ঠাগুলো সযত্নে গুছিয়ে ভাঁজ করে হাতে নিতে ভোলেননি। উঠেই তিনি বাড়ীর উদ্দেশে রাস্তা ধরলেন, যাতে অপেক্ষমাণ খরিদ্দারদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দিতে পারেন।

আহারের সময় আমরা শায়খ হাফেজ ও তাঁর স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া-ঝাটির ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছিলাম। আমি আম্মাকে জিজ্ঞেস করলাম, বাসীমার কোন খবর আসেনি?

-একটি মাসিক চেক ছিল তার ও তার আব্বার মাঝের একমাত্র যোগসূত্র। কিন্তু এ মাসে সেটিও বন্ধ হয়ে গেছে। কি কারণে তা কেউ জানে না। আর এটাই ছিল শায়খ হাফেজ ও তাঁর স্ত্রীর গতকালের ঝগড়ার কারণ।

-জরুরী একটা চিঠি লিখে তারা এর কারণ জানতে চাইছে না কেন?

-বাসীমার আব্বা একটি চিঠি পাঠিয়েছেন, কিন্তু কোন জবাব আসেনি।

-ব্যাপার কি?

-কেউ জানে না। মেয়েটির জন্যে তার মা বেচারী সব সময় কান্নাকাটি করছে। শায়খ হাফেজের জীবনে বিপদের উপর বিপদ নেমে এসেছে।

-এটা তো অবাক হবার মতন ব্যাপার।

-যা হোক, মনে হচ্ছে, শায়খ হাফেজ নিজেই ইস্‌কান্দারিয়ায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। বাসীমাকে এখানে নিয়ে আসবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

আমার আম্মার কথা আমার কাছে বোধগম্য ছিল। আমি লক্ষ্য করেছিলাম, শায়খ হাফেজের আর্থিক অবস্থা কিছুটা চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। তাঁদের ব্যবসাটাও বেশ খানিক প্রসার লাভ করেছে। খরিদ্দারও বেড়ে গেছে। এখন আর তিনি কাজ ছেড়ে বেশী অনুপস্থিত থাকেন

না। স্পষ্টতই মেয়েটির বিচ্ছেদে তিনি দারুণ ব্যথা পেয়েছেন। তাই এখন তিনি বেশী পরিশ্রমী ও কর্মতৎপর হয়ে উঠেছেন যাতে একটু মানসিক শান্তি লাভ করতে এবং মেয়েটিকে ফিরিয়ে এনে পারিবারিক সম্মান ও ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রাখতে পারেন। বিশেষত বাসীমার অনুপস্থিতি গোটা পরিবারের ওপর একটা বেদনার ছাপ ফেলে গেছে। গোটা পরিবারের মধ্যে একটা অধপতন ও অপমানের অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে।

কিছুটা এই আর্থিক সচ্ছলতার প্রতিফলনও ঘটেছে আমার বন্ধু সাঈদ হাফেজের ওপর। এখন সে প্রতিদিনই স্কুলে আসতে পারে।

আধা গুরুশ–পুরো পাঁচটি মিলিম প্রতিদিন সে সঙ্গে নিয়ে আসে। এ দিয়ে সে এখন তুরমুস, কেরব ফল অথবা কিছু পুরোনো বই–পুস্তক কিনতে পারে। এ কারণে শায়খ হাফেজ নিয়ত করেছেন, তাঁর মেয়েটি যেখানেই থাকুক, সেখানে তিনি যাবেন এবং শিগগিরই তাকে ফিরিয়ে আনবেন। কিন্তু তার আগে সেই মহিলাটির কাছে দ্বিতীয় একখানা চিঠি লেখা ভালো মনে করলেন, যে মহিলাটি মধ্যস্থতা করেছিল শায়খ হাফেজ ও যুদ্ধের ডামাডোলে ফুলে–ফেঁপে–ওঠা ধনী লোকটির মধ্যে– যার বাড়ীতে বাসীমা ঝির কাজ করবে বলে ঠিক করা হয়। লোকটি বলেছিল, কিছু দিনের মধ্যেই সে এসে দেখা করে যাবে। কিন্তু দ্বিতীয় পত্রটির কোন উত্তর মহিলাটি না দেয়ায় শায়খ হাফেজ খুব বেশী বিস্মিত হলেন। আমি আমার আম্মার কাছ থেকে জেনেছিলাম, বাসীমার কাছ থেকে শেষ যে পত্রটি এসেছিল তাতে সে তার একটি ছবিও পাঠিয়েছিল। বাসীমা তার গৃহস্বামীর স্ত্রীর একটি ছোট্ট বাচ্চা ছেলেকে কোলে করে আছে, তার দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসছে, আর তাকে সে একটি কলা এগিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু শায়খ হাফেজ স্ত্রীকে এ ছবি অন্য কাউক দেখাতে নিষেধ করে দিয়েছেন। কারণ, এ ছবিটি তাদের লজ্জা ও অপমানের একটি দলিল। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এটি একটি সুগভীর গর্তের তলায় পুঁতে রাখা উচিত। তবে মনে মনে আমি সংকল্প নিলাম, যেমন করেই হোক এ ছবি আমাকে দেখতে হবে। আমি ভাবনা–চিন্তা শুরু করলাম। তবে এ কথা আমার কাছে স্পষ্ট ছিল যে, বাসীমার আম্মা ছবিটি আমাকে কস্মিনকালেও দেখাবেন না। আর সাঈদের কাছে আমার চাওয়াটাও যুক্তিযুক্ত হবে না। তাতে তার সম্মান ও আত্মমর্যাদায় দারুণ চোট লাগবে। আর সেটা আমার জন্যে বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

আমি হতাশ হয়ে পড়তাম, যদি না বাসীমার সেই ফুফুটি থাকতেন। সেই বিধবাটি, যার কথা একটু আগেই বলেছি। বিশেষ একটি কাজে তিনি আমাকে ডাকলেন। কাজটি যে কি তা আমার অজানা নয়। পার্শ্ববর্তী গ্রামটিতে আমাদের স্কুল। সেখান থেকে আমি তাঁর জন্য কিছু সওদা–পত্র মাঝে–সাঝে এনে দিই। ঐসব জিনিস, আমাদের গ্রামে পাওয়া যায় না। যেমন কয়েক শিশি আতর, উন্নত ধরনের কিছু সুরমা বা এমনি ধরনের আরো কিছু জিনিস যা মেয়েদের প্রয়োজনে লাগে। শায়খ হাফেজের এ বোনটি সব সময় সেজেগুজে থাকতে দারুণ ভালোবাসতেন। উদ্দেশ্য, যেন কোন ভালো মানুষের দৃষ্টি তাঁর ওপর পড়ে

এবং তাঁকে বিয়ে করে ঘরে তুলে নেয়।

এই জিনিসগুলো কেনার ব্যাপারে তিনি সাঈদকে বিশ্বাস করেন না। তাঁর দৃষ্টিতে সাঈদ একজন অপচয়কারী। তাছাড়া ঐ জিনিসগুলো তিনি কিনেও থাকেন একেবারে গোপনে, যাতে খাদরা টের না পায়। এসব ছোট-খাট বিষয় নিয়ে প্রায় তাদের দু'জনের মধ্যে ঝগড়া লেগে যায়। শায়খ হাফেজের বোন আমাকে বললেন, শোন সুলায়মান, এক কৌটা গেরুয়া রঙের অর্নিশের প্রয়োজন আমার। হাট বসবে সেই আগামী পরশু। এক বান্ডিল সবুজ রেশমী সুতো ও তিন পয়সার পুঁতিদানা আমার দরকার।

কথাটি শুনে মুহূর্তে আমার মাথায় একটি দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেল। মনে হলো, আমার শয়তান বুদ্ধিটি আমার মাথায় তখনই ছেড়ে দিল। কাবু করার জন্য তাকে আমি বললাম, অনেক দেরীতে ছাড়া আমি তো স্কুল থেকে বের হতে পারবো না। তখন সময়ও তো খুব অল্প থাকবে কিভাবে এসব কিনবো?

-আশ্চর্য! সুলায়মান তোমার স্বভাব তো এমন নয়। সব সময় তো তুমি আমার কথা শুনতে।

-তাছাড়া, সব সময় সাঈদ যে আমার সাথে থাকে, এক মুহূর্তও আমার কাছ ছাড়া হয় না।

-কিভাবে কি করবে তা তুমিই ভালো জান। তোমাকে নিয়ে সব সময় আমি গর্ব করি। সবার কাছে বলে থাকি তুমি একজন চরিত্রবান ও সভ্য ছেলে। এমনি করেই কি তুমি আমার ধারণা পাল্টে দেবে? তুমি ছাড়া আর কাউকে আমি বিশ্বাস করি না।

-এবারের মত সাঈদকে বলুন।

-কি বললে? তুমি কি চাও হিটলারের মত খাদরা আমার সাথে এ বাড়ীতে যুদ্ধ বাধিয়ে দিক? এতো তোমার ও আমার মধ্যে একটি গোপন বিষয়-যা কেউ জানে না। তোমার মাকে জিজ্ঞেস করে দেখ, খাদরা সব সময় কিভাবে আমার সাথে হিংসা করে এবং সে চায় আমি কোন বনে-জঙ্গলে চলে যাই, তাহলে সে শান্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারে।

বলেই সম্মতির আশায় আমার কাঁধে একটি হাত রেখে তিনি বললেন, তোমাকে আমি একটি গুরুশ দেব! পাক্কা একটি গুরুশ। বুঝলে?

-না, আমি গুরুশ চাই না।

-তাহলে তুমি কি চাও?

-ইসকান্দারিয়া থেকে আসা চিঠির মধ্যে বাসীমার যে ছবিটি আছে আমি সেটি দেখতে চাই।

-শাবাশ সুলায়মান। তোমার দাবী তো খুবই সামান্য। তোমাকে সেই ছবিটি আমি দেখাচ্ছি। আর কি চাও?

-আপনার যা কিছু প্রয়োজন সবই আমি নিয়ে আসবো।

ছবিটি ধরতে গিয়ে আমার হাতটি কাঁপছিল। বাড়ীতে তখন আমি ও শায়খ হাফেজের

বোনটি ছাড়া আর কেউ ছিল না। আমার সাথে দেয়া অঙ্গীকার অনুযায়ী বাসীমাকে তখন মনে হচ্ছিল সম্পূর্ণ নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ। তার স্বভাবসুলভ মৃদু হাসিটি নীরব ও সুন্দর একটি প্রদীপ শিখার মত দীপ্তিময় হয়ে উঠছে। ছবিটি দেখে তার মুখে হাসি থাকা সত্ত্বেও আমার ভিতরে একটি চাপা ব্যথা এমনভাবে মোচড় দিয়ে উঠতে লাগলো যে, আমি কিছুতেই তা দমন করতে পারছিলাম না। এ ব্যথার উৎস আমার নিজের অভ্যন্তর ভাগেই বিদ্যমান, ছবিতে নয়। অনেক সময় আমরা এ বিশ্বকে অবলোকন করে থাকি আমাদের নিজেদের বিশেষ দৃষ্টি ও অনুভূতি দিয়ে। কলার ছড়াটি ছাড়া বাসীমা কি হাতে ধরার আর কিছুই পায়নি? সব সময় সে ফল ভালোবাসতো এবং ফলের স্বপ্ন দেখতো। তা না হলে সে এর পরিবর্তে অন্য কিছু যেমন একটি ফুল ধরলো না কেন? আমার চোখে পড়লো, প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশী প্রশস্ত তার গায়ের জামাটি। এতে আমি ধরে নিলাম জামাটি তার নয়, অথবা সেটি সে লাভ করেছে পরিবারের ছোট একটি মেয়ের কাছ থেকে অনুগ্রহস্বরূপ। আর এটাও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সে দু'বছরের একটি ছেলেকে কোলে করে রেখেছে, বয়সের তুলনায় যাকে বেশী মোটা ও নাদুস-নুদুস দেখাচ্ছে। এমনকি বাসীমার লম্বা চিকন শাড়ীটি যেন কাঁপছে, ভারসাম্য বজায় রাখতে পারছে না। এমন গভীরভাবে ছবিটি নিরীক্ষণ করতে লাগলাম এবং তার চারপাশের পরিবেশের মধ্যে এমনভাবে সাঁতার কাটতে লাগলাম যে, আমার আশে-পাশে কেউ আছে কি না সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়লাম। শায়খ হাফেজের বোন কি কাজে যেন বাইরে গিয়েছিলেন। ঘরের মধ্যে একাকী আমি ছবিটি গভীরভাবে দেখতে লাগলাম। আরো একটু স্বস্তির সাথে ছবিটি দেখতে পারি এ উদ্দেশ্যে যেই না আমি চোখ উঠিয়েছি, অমনি দেখি যে, সাঈদ আমার সামনে তার রক্ত-মাংসের দেহটি নিয়ে দাঁড়িয়ে। ঘটনার আকস্মিকতায় আমি বিমূঢ় হয়ে পড়লাম। হাতের ছবিটি পড়ে গেল। সাঈদ সেটি দ্রুত কুড়িয়ে নিল এবং এমন ক্রোধের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো যেন তীর ছুঁড়ে মারছে। সে বলল, এক্ষুণি এখান থেকে বের হয়ে যাও।

দ্বিধাগ্রস্তভাবে আমি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম, তারপর বাইরে যাবার জন্য পা বাড়ালাম, তখন আমার অবস্থা এমন যে, সামনে দেখার জন্য মাথাটি উঁচু করতেও পারছি না। এমন কি দরজার কাছে খাদরার সঙ্গে ধাক্কা খেলাম। তিনি দ্রুত ঘরে ঢুকছিলেন। বললেন, সুলায়মান, তুমি কি মাতালের মত হাঁটছো?

একটা দুঃখের অনুভূতি আমাকে তখন পেয়ে বসেছিল। অনুভূতিটি একজন চোরের, যে অপকর্মের জন্য হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছে। অথবা এক ব্যক্তির মত যে কোন বিশ্বাস ভঙ্গের কাজ করেছে এবং পরে তা স্বীকার করা ছাড়া কোন উপায়ান্তর পায়নি। আমি আপন মনেই বলতে লাগলাম, "হয়েছে কি তাতে?" আমার অপরাধ কি এ জন্য যে, আমি বাসীমার ছবিটি দেখেছি? যে ছবিতে সে তার গৃহপরিচারিকা হিসেবে ধরা পড়েছে? তাতে কি এমন অপরাধ হয়েছে? লোকে তো সবই জানে।

এ প্রশ্নগুলো আমার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। আমি উপলব্ধি করলাম বিষয়টি তো

আর গোপন নেই। তথাপি আমার গভীর অনুভূতি আমার সকল যুক্তিকে বিদ্রূপ করতে লাগলো এবং আমাকে একজন চোর অথবা বিশ্বাস ভঙ্গকারীর পর্যায়ে দাঁড় করিয়ে দিল। কারণটি এই হতে পারে যে, ছবিটি দেখার জন্য আমি একটা বাঁকা পথে অগ্রসর হয়েছিলাম।

ছবিটি দেখা এবং খাদরার বিনা অনুমতিতে তাঁর ঘরে জিনিসপত্র তালাশ করাকে কেন্দ্র করে খাদরা ও তার স্বামীর বোনের আগের চেয়েও বেশি ঝগড়া লেগে গেল। খাদরা তার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ তুললো। অবশ্যি পরিস্থিতির কারণে এ ঝগড়া খুব তাড়াতাড়িই স্তিমিত হয়ে পড়লো। সংক্ষেপে বলা যায়, বাড়ীর চার দেয়ালের মধ্যে এ ঝগড়া সীমিত থাকলো। যাতে করে বাসীমা যে সেবিকা হয়েছে– এ কথাটি পাড়ার লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে না পড়ে। শায়খ হাফেজের বোন সর্বপ্রথম আমার মার কাছে ছুটে গেলেন এবং ঘটনার আগাগোড়া তার নিকট বর্ণনা করলেন। এদিকে আমিও আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করি। অর্নিশ আতর, পুঁতির দানা, সুতা ইত্যাদি যা যা তিনি আনতে বলেছিলেন সবই তাকে এনে দিলাম।

এ ঘটনার যে ফল আমি আশা করেছিলাম, তেমন কিছু হয়নি। তবে এতটুকু হয়েছিল যে, সাঈদের সাথে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় আর তার সাথে ঝগড়া–ঝাটিও হয়।

তারপর থেকে আমরা দু'জন যার যার মতন পৃথকভাবে স্কুলে আসা–যাওয়া করতে লাগলাম। এর প্রতিদানস্বরূপ আমি ও সাঈদ দু'জনেই শায়খ হাফেজের হাতের দু'টি করে চড় লাভ করি। আর এ দু'টি চড়ই আমাদের দু'জনকে ঠিক পথে নিয়ে আসে, আমাদের মাঝে সদ্ভাব সৃষ্টি করে দেয়। পানি তার গতিপথ ফিরে পায়।

এ সময় আর একটি ঘটনা ঘটে। আমার মা যে সন্তানটি প্রসব করেন তা ছিল মৃত। অবশ্য আমরা জানিনে এর কারণ কি।

৭

শেষ পর্যন্ত আমরা দু'জন প্রাইমারী সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অত্যন্ত সাফল্যের সংগে কৃতকার্য হলাম। সাঈদ হাফেজ হলো স্কুলফার্স্ট। একটা বড় ধরনের খুশিতে আমাদের বাড়ীটি ডুবে গেল। চলতে লাগলো গেলাস গেলাস লাল শরবত। আমাদের পাড়ার নারী–পুরুষ–শিশুদের প্রতিনিধি দল একের পর এক আমাদের বাড়ীতে এসে অভিনন্দন জানাতে লাগলো। আমার আম্মা আনন্দ ও গর্বে টগবগ করছিলেন। এ সময় আমি তার মধ্যে বুকের সেই ব্যথার কোন কিছু দেখতে পেলাম না। তিনি তার ব্যথা ও যন্ত্রণা ভুলে গিয়েছিলেন। আমার সফলতা তার সব দুঃখ ও যন্ত্রণা দূর করে দিয়েছিল। এদিকে সাঈদ দু'কারণে আমার মত তার সাফল্যের জন্য আনন্দ–উৎসব করতে পারেনি। প্রথমত, বাসীমার অনুপস্থিতি। দ্বিতীয়ত, শায়খ হাফেজের বাড়ীতে না থাকা। কারণ, তিনি তার মেয়ে

বাসীমাকে আনার জন্য ইসকান্দারিয়া গেছেন। এ কারণে সাঈদের অনুষ্ঠানটি একটু দেরীতে হবে।

কয়েক দিন পর শায়খ হাফেজ ইসকান্দারিয়া থেকে ফিরলেন। কিন্তু বাসীমা তার সঙ্গে নেই। তার মুখটি মলিন ও কপাল কৌচকানো। দৃষ্টিতেও একটা উদাস উদাস ভাব। তাহলে বাসীমা কি মারা গেছে? নাকি সে তার আব্বার সাথে আসতে রাযী হয়নি?

শায়খ হাফেজের পরিবারের উপর একটি নীরবতা নেমে এলো। পরিবারের সদস্যরা হতভম্ব ও বিমর্ষ। তাদের সকলের চোখে-মুখে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন। শায়খ হাফেজ ভিতরের ঘরে চলে গেলেন। পরিবারের অন্য সদস্যরাও তার পিছে পিছে গেলেন। একটা ভীতি ও বিস্ময় তাদের জিহবাকে আড়ষ্ট করে ফেলেছে। শায়খ হাফেজ বসলেন। তার দু'গন্ড বেয়ে নীরবে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। একটা দ্বিধাদ্বন্দ্বে খাদরার মাথা ঘুরপাক খেতে লাগলো। জোরে চেঁচিয়ে তিনি বিলাপ করে উঠলেন, ওরে আমার মেয়ে.....। শায়খ হাফেজ কি হয়েছে তার?

হাউমাউ আর কান্নাকাটি মিলে একটা শোরগোল তৈরী হলো। ক্রমেই ভিড় বৃদ্ধি পেতে লাগলো। পাড়ার লোকে বাড়ীটি ভরে গেল। সবাই হতভম্ব। তারা কি করবে তা স্থির করতে পারছে না। তারা কি সমবেদনা জানাবে? তারা তো জানতে পারেনি বাসীমা বেঁচে আছে না মরে গেছে। তবে স্বভাবতই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, বাসীমাকে কেন্দ্র করে দুঃখজনক কোন কিছু নিশ্চয় ঘটেছে।

শায়খ হাফেজ বাড়ী থেকে যাত্রা করেছিলেন হৃদয়ভরা আশা নিয়ে। ইসকান্দারিয়া পৌছেই তিনি সেই মহিলাটির বাড়ীর দিকে রওয়ানা হলেন, যে বাসীমাকে তার তত্ত্বাবধানে রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। দরজার কড়া নাড়তেই বাড়ীটির কয়েক কদম দূর থেকে এক বৃদ্ধা খেঁকিয়ে উঠলো। সে শিশুদের জন্য সস্তা কিছু মিষ্টি বিক্রি করছিল। বললো, এখানে এসো। কাকে চাও?

শায়খ হাফেজ তাঁর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন। বিস্ময়ের সাথে বৃদ্ধা বললো, তুমি কি জীবিত! সে তো শেষ হয়ে গেছে। হতভাগিনী। রাস্তা থেকে আমরা তার ছিন্নভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো একত্র করেছিলাম।

-কি বললেন?

-জার্মানদের একটি হামলার সময় অত্যন্ত জঘন্যভাবে সে মৃত্যুবরণ করেছে।

শায়খ হাফেজের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়। তিনি চেঁচিয়ে বলে উঠেন, বাসীমা কোথায়? বাসীমা আমার মেয়ে?

-তাকে আমি চিনিনে। তার সম্পর্কে আমি কিছু জানিও না।

অত্যন্ত বিনীত ও অসহায়ভাবে তিনি বললেন, তের বছরের একটি মেয়ে, এখানকার একটি সম্ভ্রান্ত বাড়ীতে ঝিয়ের কাজ করতো।

বিরক্তির সাথে মহিলাটি বললো, আমি জানিনে। যাও তো, অন্য কোথাও জিজ্ঞেস

কর।

এক মুহূর্তে শায়খ হাফেজ ঠিকানা লেখা কাগজটি বের করলেন এবং হতভম্বের মত সেই বাড়ীটির খোঁজে সামনের দিকে অগ্রসর হলেন, যেখানে বাসীমা কাজ করত। বিক্ষিপ্ত চিত্তে ও কম্পিত হৃদয়ে তিনি সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন। আশে-পাশের কোন কিছুর প্রতি তাঁর কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। তিনি দালান-কোঠা, মানুষ, যান-বাহন, ট্রাম ইত্যাদি দেখছেন, কিন্তু সবই তার কাছে বাজে জিনিস বলে মনে হচ্ছে। বরং তিনি দেখতে পাচ্ছেন, এর সবকিছুই যেন বাসীমার জন্য গভীর শোকে শোকাভিভূত। সবাই যেন বাসীমার স্মৃতি তার সামনে ছুঁড়ে মারছে। কাগজের হকারের প্রতি আজ তার কোন মনোযোগ নেই। হকার লোকটি জোরে জোরে হাঁক দিচ্ছে, এই যে মিসরবাসী, পিরামিডের দেশের অধিবাসী। জার্মান বাহিনী পশ্চাদপসরণ করেছে-মিত্রশক্তির বিজয় হয়েছে।

শায়খ হাফেজ কেবল বাড়ীর নম্বরগুলো পড়ছেন। প্রতিটি স্থানেই ধ্বংসের চিহ্ন। যেন এই বাড়ীঘরগুলো ধ্বংস করা হয়েছে সেখানে নতুন নতুন অট্টালিকা নির্মাণের জন্য।

শায়খ হাফেজ একটি নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে থামলেন। নিজে নিজেই বললেন, এটা হলো ২১ নং বাড়ী, আর ঐটা ২৯ নং। তাহলে ২৩ নং বাড়ীটি কোথায়। অবশ্যই এই দু'টি বাড়ীর মাঝখানেই হবে।

শায়খ হাফেজ একজন পথচারীকে জিজ্ঞেস করলেন। লোকটি বেশ অবাক হলো। সম্ভবত সে ধারণা করলো, শায়খ হাফেজের মধ্যে কিছুটা বুদ্ধির স্বল্পতা আছে। বললো, এই ধ্বংস কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন না।

শায়খ বললো, হাঁ, দেখতে তো পাচ্ছি।

লোকটি বললো, এখানে ২৩, ২৫, ২৭-এই নম্বরগুলো তালাশ করুন। জনাব, আপনি কি এই জগতে আছেন? হামলার চোটে কিছুই আর স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। এই তিনটি বাড়ীও ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। জার্মান হামলায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

-আপনি কি সত্যি বলছেন?

-ঠাট্টার ভঙ্গিতে লোকটি তার দু'কাঁধ দুলিয়ে কোন জবাব না দিয়েই হাঁটা দিল। শায়খ হাফেজ তার পেছনে যেতে যেতে অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে বাসীমা কোথায়? সে ২৩ নং বাড়ীতে চাকরানীর কাজ করতো।

কোন প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে অত্যন্ত রুক্ষভাবে লোকটি বললো, হায় আল্লাহ, তাকে এ দুনিয়ার দুর্ভাগ্য ও কষ্ট থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং কোন একটি হামলায় তাকে নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন। না হয়, পরিবারের অন্য লোকদের সাথে এখান থেকে অন্য কোথাও চলে গেছে।

এই বলে লোকটি শায়খ হাফেজকে পেছনে ফেলে দ্রুত হাঁটতে লাগলো। যাতে তিনি আর অযথা প্রশ্ন করে বিরক্ত করার সুযোগ না পান। যুদ্ধের কঠোরতা ও ভয়াবহতা মানুষের

অন্তরে যেন এক প্রকার রুক্ষতা, দুশ্চিন্তা ও ব্যস্ততার বীজ রোপণ করে দিয়েছে। এই লোকটি কি জানে না, তার এই কথা শায়খ হাফেজের কলিজাকে ধারালো ছুরির ন্যায় টুকরো টুকরো করে ফেলেছে?

শায়খ হাফেজ এই ধ্বংসস্তূপটির পাশ দিয়ে বারবার আসা-যাওয়া করতে লাগলেন। তিনি কি সেই ধ্বংস স্তূপের মাঝে বাসীমাকে সন্ধান করছেন? নাকি তিনি এই ঠাসা দুর্গের মধ্যে বাসীমার গায়ের গন্ধ শুকছেন, নাকি প্রাচীন আরব কবিদের ন্যায় ধ্বংসাবশেষের পাশে বসে কান্নাকাটি করছেন?

প্রতিবেশীদের বারবার জিজ্ঞেস করে তাঁর মনোকষ্ট হাজার গুণ বেড়ে গেল। আর পুলিশের কাছে রিপোর্ট করতে গিয়ে দুঃখের বোঝার ওপর আরো একটা বোঝা চেপে বসল।

এভাবে একটা চাপা ব্যথা নিয়ে শায়খ হাফেজ গ্রামে ফিরলেন। তিনি ফিরলেন এ কথাটি না জেনেই-সত্যিই কি বাসীমা মারা গেছে, নাকি এখনও সে জীবিত আছে? জানতে পারলে হয়তো তার স্মৃতি ভুলে যাওয়ার তিনি চেষ্টা করতেন। আর যদি জানতে পেতেন সে জীবিত আছে, তাহলে তার সন্ধানে পথে পথে যদি জীবনটিও কেটে যেত, তাই-ই করতেন। এই অনিশ্চয়তাই সবচাইতে বেদনাদায়ক এমন কি মৃত্যুর চেয়েও বেদনাদায়ক।

তিনি হতাশা ও নৈরাশ্যের প্রাবল্যে এ পৃথিবী আর পৃথিবীর মানুষকে অভিশাপ দিলেন। তিনি অভিশাপ দিলেন সেই অর্থের- যা তার কন্যাকে ঝিয়ের কাজে নিয়োগের জন্য বাধ্য করেছিল। যুদ্ধ ও যুদ্ধের উস্কানিদাতাদেরও তিনি অভিশাপ দিলেন। এবার তিনি হিটলার, মুসোলিনী কাকেও বাদ দিলেন না। নাজী ও মিত্রশক্তি এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য করলেন না।

তাঁর এ দারিদ্র্যের মূল কারণও এই যুদ্ধ। তার কন্যার এ সর্বনাশ এবং মৃত্যুর জন্য দায়ীও এই যুদ্ধ। যুদ্ধের ব্যাপারে এটাই হলো তাঁর নতুন সিদ্ধান্ত। যুদ্ধকে এখন তিনি নিজের বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছেন। এই বিপদের পর থেকে শায়খ হাফেজ সব সময় নিজের বাড়ীতেই অবস্থান করছেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তিনি মানুষের চোখের আড়ালে থাকছেন। তখন থেকে কেউ আর তাঁকে জুমার দিন নামাযের দু'ঘন্টা আগে থেকে মসজিদের সামনে হিটলার প্রেমিকদের সংগে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাজনীতি বিষয়ে কথা বলতে দেখে না। তার ছোট্ট দোকানটির দেখাশোনার ভার তার স্ত্রী ও ছেলে সাঈদের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। যখনই আমি তার বাড়ীতে ঢুকতাম, দেখতাম মাথা নিচু করে কি যেন ভাবছেন। আর একের পর এক বিড়ির শলা মুখে পুরছেন। তার চোখের দৃষ্টিও যেন অনেকটা কমে গেছে। তাছাড়া কথা খুবই কম বলতেন।

এমনিভাবে খাদরার ঝগড়াঝাঁটিও আর নেই। ননদিনীর সাথে তার মতপার্থক্যও কমে গেছে। আর এই সময় তার আর্থিক অবস্থাও বেশ উন্নতির দিকে। এদিকে সাঈদের মাধ্যমিক স্কুলে বিনা বেতনে ভর্তির বিষয়টিও তখন সুনিশ্চিত।

এমনি সময় হঠাৎ একদিন আমরা একটি সংবাদ শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম।

আম্মা ঘরে ঢুকে আব্বাকে বললেন, শায়খ হাফেজ তার বাড়ীটি বিক্রির জন্য ক্রেতা খুঁজছেন।

আশ্চর্য্য হয়ে আমার আব্বা জিজ্ঞেস করলেন, শায়খ হাফেজ তার বাড়ী বিক্রি করবেন কেন?

আম্মা বললেন, শুধু বাড়ী নয় দোকানটিও।

–এর চেয়ে সুন্দর কোন বাড়ী এবং ব্যবসার জন্য অধিক উপযুক্ত স্থান কি পেয়েছেন?

–না, না। সে সব কিছু না।

–তা হলে এর রহস্য কি?

–তিনি সপরিবারে গ্রাম ছেড়ে একেবারেই চলে যাবেন।

আব্বা বিস্ময়ে হাঁ করে রইলেন। বললেন, কোথায়? তুমি কিসব আজগুবি কথা বলছো?

–লোকেরা বলাবলি করছে, তিনি নাকি আল–কুরাশিয়্যা শহরে চলে যাবেন। সেখানে তার নিজ পরিবার ও তার বিতাড়িত সেনা–অফিসার পিতার পরিবারের লোকেরা আছে।

–আশ্চর্য কথা! বিষয়টি এমনই আকস্মিক যে, কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। দীর্ঘকাল বসবাসের পর আমাদের এ গ্রাম ছেড়ে চলে যাবেন!

আম্মা আস্তে আস্তে বললেন, তার মেয়েটি হারানোর পর থেকে অনেক ব্যাপারেই তিনি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। পরিবারের সব দায়–দায়িত্ব তিনি স্ত্রীর উপর ছেড়ে দিয়েছেন। বেচারী দোকান ও ঘর কোন রকম সামাল দিচ্ছেন। আবদুদ দায়িম, এ খুব অবাক ব্যাপার। তার মাথায় কি কিছু হলো?

আব্বা একটু সহানুভূতির ভঙ্গিতে মাথাটি দুলিয়ে বললেন, কখখনো না। তবে হয়তো তিনি এখান থেকে দূরে কোন কিছু দেখতে পাচ্ছেন। তিনি হয়তো মনে করছেন, এ স্থান ত্যাগ করলে কিছুটা শান্তি পাবেন এবং বাসীমাকেও ভুলতে পারবেন। কিন্তু আফসোস!

–তিনি এসব করছেন কেন? শুধুমাত্র বাসীমার জন্যই? আল্লাহ আগামীতে বাসীমার পরিবর্তে আর একটি মেয়েও তো দিতে পারেন?

–আল্লাহ তাকে ধৈর্য ধরার শক্তি দিন। কিন্তু তার স্ত্রী এ সংকল্প থেকে তাকে বিরত রাখতে পারলেন না?

–এ ব্যাপারে তিনি কোনরূপ সমালোচনা ও প্রতিবাদই শুনছেন না। তিনি বরং স্ত্রীকে বলে দিয়েছেন, এ ব্যাপারে তুমি যদি কথা বন্ধ না কর, তাহলে পরিবারের অন্যদেরকে নিয়ে আমি আল–কুরাশিয়্যা চলে যাব। তুমি এখানে যা খুশি তাই করো।

–তার বোন? সেও কি তার সাথে যাওয়ার জন্য একমত হয়েছে?

–স্বাভাবিক। এখানে থেকে গেলে কে খেতে দেবে। তাছাড়া সেখানে গেলে কোন বরও খুঁজে পেতে পারে। এ ধরনের একটি আশা সব সময় তার অন্তরে জীবন্ত।

–হাফেজ বড় হতভাগ্য! এই মন্দকপাল ও যাযাবর জীবন উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর পিতার কাছ থেকে তিনি লাভ করেছেন।

–যে ব্যক্তি ত্রিশ দিন কোন সম্প্রদায়ের সংগে এক সাথে বসবাস করে, সে তাদেরও একজন হয়ে যায়। ভবিষ্যতে তিনি হয়তো আল–কুরাশিয়্যাতেই স্থায়ী হয়ে যাবেন, আর পেছনের কথা ভুলে যাবেন। তবে অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তাঁকে ভুলবেন না।

এই আকস্মিক বিচ্ছেদের সংবাদে আমি এতই দুঃখ পেয়েছিলাম যে, একমাত্র সাঈদ হাফেজ ছাড়া আর কেউই সেটা বুঝতে পারেনি। তবে আমার দুঃখের ভার কিছুটা লাঘব হলো, যখন আমরা দু'জনে এ ব্যাপারে একমত হলাম যে, আমরা তান্‌তা আধুনিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হব এবং এক সাথে লেখাপড়া করব।

মাত্র অল্প ক'দিনের মধ্যেই শায়খ হাফেজ তাঁর সকল ঝামেলা মিটিয়ে ফেললেন। বাড়ী ও দোকানটি বিক্রি করে দিলেন। এভাবে আল–কুরাশিয়্যা যাত্রার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করলেন। একদিন প্রত্যুষে মহল্লার একজন কৃষকের একটি উটের উপর যাবতীয় জিনিস বোঝাই করে পরিবারের লোকেরা দল বেঁধে উটের পিছে পিছে রওয়ানা দিল।

শায়খ হাফেজের পরিবার সৌভাগ্যের সন্ধানে তাদের নতুন বাসস্থানের দিকে চললো।

বিদায় বেলা সাঈদ হাফেজ আমাকে ঘুম থেকে জাগানোর চেষ্টা করেনি। সে হয়তো এই কঠিন মুহূর্তের ব্যথা, অনুভূতি ও অশ্রুর কথা স্মরণ করেই আমাকে ডাকেনি। তবে আমি জেনেছি, আমার আব্বা–আম্মা তাদের বিদায় বেলায় উপস্থিত ছিলেন। আমার আম্মা সাঈদের মাথায় চুমু দিয়ে বলেছিলেন–মাআস সালামাহ–শান্তি ও নিরাপদে থাক।

উত্তরে সাঈদ অতিকষ্টে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেছিল, সুলায়মানকে আমার সালাম বলবেন। আমি আশা করি ছুটি শেষ হওয়ার আগেই সে আমাদের ওখানে যাবে।

৮

আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর মোড় দ্রুত পরিবর্তন হতে লাগল। মিত্রশক্তি একযোগে জার্মানীর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালালো। তাদের হাতে অনেক শহরের পতন ঘটলো। তারপর তারা বার্লিন অবরোধ করলো। বার্লিন শহরটি আগুনের কুন্ডলীতে পরিণত হলো। জার্মান

বাহিনীও সর্বশক্তি দিয়ে মোকাবিলা করতে লাগল। হিটলার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত অত্যন্ত বীরের ন্যায় লড়লেন। পাশ্চাত্য শক্তিসমূহ এবং রাশিয়া প্রতিযোগিতায় নেমে গেল শত্রুভূমির সর্বাধিক অংশ দখলের জন্য। তারপর সর্বশেষ ঘটনা– বার্লিনের পতনের পর হিটলারের আত্মহত্যা।

মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে আমি সাঈদকে বললাম, হিটলারের গৌরব ভূলুণ্ঠিত হয়ে গেল। জার্মানী এখন শত্রুর কবযায়, অথচ একদিন সে ছিল সবার উপরে। আর এখন সে এমন একটি শিকারে পরিণত হয়েছে যে, নেকড়ের পাল তাকে ছিঁড়ে খামচে খেতে শুরু করেছে। সে তার গৌরবের চূড়া থেকে এত নিচে নেমে গেছে যে, মিত্রশক্তির যোদ্ধাদের জুতো চুমো দিচ্ছে। আমার ধারণা, নিশ্চয় তোমার আব্বা ভীষণ দুঃখ ও ব্যথা পেয়েছেন।

–সত্যিই সুলায়মান! তিনি বসে বসে একাকী জোরে জোরে তর্কবিতর্ক করেন, ঝগড়া করেন এবং বিপ্লবী ভাব প্রকাশ করতে থাকেন। এখনও তিনি Depot No-13–এর প্রতীক্ষায়। কিন্তু মনে হচ্ছে, এটা একটা কল্পনা।

–শেষমেশ তোমার আব্বা কি এ সত্যটি স্বীকার করেছেন?

–মোটেই না। তিনি যেদ ধরে বসে আছেন, যুদ্ধ নাকি এখনও শেষ হয়নি।

–লালফৌজ ও পাশ্চাত্য শক্তিসমূহের প্রবেশ এবং সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের পর আর কিসের যুদ্ধ? যুদ্ধ–অপরাধীদের বিচার অনুষ্ঠানের খবর কি তিনি পড়েননি?

–এসব খবরের কোন কিছুই তাঁর বাদ পড়েনি। তবে তিনি কোন একটি পত্রিকায় নাকি পড়েছেন, হিটলার এখনও জীবিত এবং পাল্টা আক্রমণের উদ্দেশ্যে তিনি কোন এক অজ্ঞাত স্থানের দিকে পালিয়ে গেছেন। অপারেশনের মাধ্যমে তিনি নিজের চেহারা পাল্টে ফেলেছেন। এমনি সব আজগুবি ধরনের খবর। আর আমার আব্বা নানাভাবে চেষ্টা করেন প্রকৃত সত্য থেকে পালাবার জন্য। তিনি বলেন, হিটলার পরাজিত ও নিহত হয়েছে।

–আমরা ধরে নিলাম হিটলার এখনও জীবিত। তাহলেই বা তিনি কি করতে পারবেন? সেনাবাহিনী, জনসাধারণ ও নেতৃবৃন্দ তো তার সাথে নেই। জার্মানীর বিজ্ঞানী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও তো গনীমাত ও লুণ্ঠনের শিকার। তাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মস্কো, লন্ডন ও ওয়াশিংটনে।

–সত্যি সত্যিই ব্যাপারটি মাথা খারাপ করে দেবার মত। এভাবে হিটলার গৌরবের চূড়ায় উঠে তারপর একেবারে পতনের শেষ ধাপে গিয়ে পৌছলো? আমিও আমার আব্বার মত চেয়েছিলাম ইংরেজদের পরাজয়।

–এসব চিন্তা ছেড়ে দাও। মিত্রশক্তি বিজয়ী হয়েছে, ব্যাপারটি চুকে গেছে। আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটি তা হলো এই প্রশ্নঃ বিজয় সঙ্গীতের উঁচুতানে ও শান্তির বাণীর এ কোলাহলে দুর্বল জাতিসমূহের কণ্ঠস্বর কি তলিয়ে যাবে? তাদের আশার আলোটুকু কি লাল ও সবুজ বিজয়ের বেষ্টনীতে বাঁধা পড়ে যাবে?

–আমার আব্বা ইংরেজদের উপর একটুও বিশ্বাস করেন না। তিনি জোর দিয়েই বলেন, তারা বন্ধুত্ব, সততা এবং বিভিন্ন জাতির আশা–আকাংখা ও স্বাধীনতার মর্যাদা দানের যোগ্য নয়।

–এসব সম্মেলন ও ঘোষণা কি তাহলে শুধুমাত্র মানুষকে ধোকা দিয়ে বিভ্রান্ত করার জন্য?

–এটাই আমার বিশ্বাস। বলতে পার, আমার আব্বার বিশ্বাসও তাই।

–তাহলে তো আমাদেরকে আরেকবার পাশ্চাত্যের ঔপনিবেশিক অভিশাপের হাতে বন্দী হতে হবে।

–শিগ্‌গিরই আমাদেরকে নতুন করে বিদ্রোহ, প্রতিবাদ ও রক্তদান শুরু করতে হবে।

–তাহলে তো তুমি খুশিই হবে। কারণ, তুমি তো আঘাতের দিনটিকে ঈদের দিন বলে গণ্য কর।

–স্বাধীনতার পথ বড় দীর্ঘ, কন্টকাকীর্ণ এবং ব্যথা–বেদনা ও আত্মত্যাগে পরিপূর্ণ।

–১৮৮২ সালে ইংরেজদের আধিপত্যের দিন থেকে আজ পর্যন্ত– লম্বায় তা কি এতখানি হবে?

–এর থেকেও বেশী।

–ফরাসী আগ্রাসন তো বেশী দিন টেকেনি।

–তখন ছিল এক বিশেষ পরিবেশ ও পরিস্থিতি। ইংরেজ উপনিবেশ তার থেকেও সুদৃঢ় ও সুপরিকল্পিত।

আমরা 'তানতার' পৌরসভা ময়দানে 'আল–গাওয়া আত–তিজারিয়া' রেস্টুরেন্টে এসে গেলাম। এখানে গাড়ী থামে এবং সাঈদ ও তার সঙ্গীরা প্রতিদিন 'আল–কুরাশিয়্যা–তানতা ও তানতা আল–কুরাশিয়্যা' যাতায়াত করে। শায়খ হাফেজ তাঁর ছেলেকে তানতায় একাকী রাখার পরিবর্তে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। তাঁর ব্যবস্থার পেছনে কিছু যুক্তিও আছে। বাসীমাকে হারানোর পর সাঈদের প্রতি তাঁর আকর্ষণ বেড়ে গেছে। তার আরাম, রক্ষণাবেক্ষণ ও তার দাবী পূরণের জন্য তিনি সব রকম পন্থা অবলম্বন করে থাকেন। তাঁর এ

স্নেহ ও ভালোবাসা অনেকটা বাড়াবাড়ি ও পাগলামির পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছে। অনেক সময় তিনি তাঁর ছেলের সঙ্গে বাড়ী থেকে তানতা পর্যন্ত চলে আসেন, শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, তার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকবেন এবং যথাসম্ভব একটু বেশী সময় তার পাশে কাটাতে পারবেন। এমনকি তিনি স্কুলের গেটে ছেলের জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতে থাকেন। এ কারণে তাঁর ও স্কুলের দারোয়ান 'আম্মে ফারাজের' মধ্যে গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তারা পরস্পর বিড়ি বিনিময় করেন এবং নিজেদের সুখ-দুঃখ ও পারিবারিক গোপন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকেন। কোন কোন সময় তিনি গাড়ীর ড্রাইভারের কাছে এসে গাড়ীর ইঞ্জিনের প্রতি যত্নবান হতে, পুরাতন যন্ত্রাংশ পাল্টিয়ে নতুন যন্ত্রাংশ লাগাতে এবং চালানোর সময় অধিক সতর্ক হবার জন্যে উপদেশ দিতেন।

হাঁ, বাসীমার ট্রাজেডি যেন ঘন্টার ধ্বনি হয়ে সব সময় শায়খ হাফেজের কানে প্রতিধ্বনিত হতো এবং তা অন্তরে এক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল। এ কারণে একমাত্র সন্তান সাঈদের প্রতি তাঁর স্নেহ, ভালোবাসা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে গিয়ে পৌছে। সাঈদও তার আব্বার আচরণে বেশ ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হতো। কিন্তু তার করার কিছুই ছিল না। একদিন সে রেস্টুরেন্টের সামনে থেকে গাড়ীতে উঠতে উঠতে আমাকে বললঃ আব্বা আমার সঙ্গে আগামীকাল তানতা আসবেন কিছু জিনিসপত্র কেনাকাটার জন্য। কাল বৃহস্পতিবার, স্কুলও হাফ। তুমি কি আমাদের সঙ্গে থাকতে পারবে?

-ইনশাআল্লাহ। খোদা হাফেয।

-খোদা হাফেয।

নিয়মমত গাড়ীটি আল-কুরাশিয়্যার দিকে চলতে শুরু করল।

এদিকে আমি তানতায় থেকে পড়াশুনা করাটাই ভালো মনে করলাম। কারণ, আমাদের বাড়ী থেকে তানতার দূরত্ব অনেক। তাছাড়া সেই সময় যোগাযোগ ব্যবস্থাও ছিল অত্যন্ত অনুন্নত ও দুরূহ।

গ্রামের জীবনে আমি অনেক কষ্ট সহ্য করেছি। এই প্রথম বারের মত আমি নিজেকে স্বাধীন বলে অনুভব করলাম। যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। আমার পকেটে মাসিক খরচের টাকাও থাকে, যেভাবে ইচ্ছা তা খরচও করতে পারি। খেলাধুলা বা পড়াশুনা-দু'টিই আমার নিজের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই স্বাধীনতার উপর আমি অনেকটা বিরক্ত হয়ে পড়েছি কিংবা বলা যায় দারুণভাবে ঘৃণা করতে শুরু করেছি। যেভাবেই হোক,

আমি এ স্বাধীনতা থেকে মুক্তি পেতে চাই। এ স্বাধীনতাকে আমার মনে হয় যেন একটি ভীতিপ্রদ-অপচ্ছায়া। আমার সামনে দাঁড়িয়ে তীরের ফলা হয়ে আমার শরীরে বিঁধছে। এর কারণ কি এই যে, এখনও আমি আমার কাঁধে অর্পিত দায়িত্বের বোঝা বহনের যোগ্য হইনি? অথবা এর কারণ কি ছিল আমার অল্প বয়স? আজ এ সবের স্মৃতিচারণ শুধুমাত্র অলস মুহূর্তগুলো কাটানো। তা যে বেশ আনন্দ-ব্যথায় ভরপুর তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আমার মনে আছে, একবার আমি 'তাকিয়াতুল ইখফা' ছবিটি দেখার জন্য প্রেক্ষাগৃহে গিয়েছিলাম। দেখতে পেলাম, অনুজ্জ্বল আলোয় অনেক মানুষ ছায়ামূর্তির মত চুপচাপ বসে আছে। আমাকে যে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল, সে ছিল একজন শ্রমিক। সে যে শ্রমিক, তা তার শরীর দেখেই বুঝা যেত। তাই প্রেক্ষাগৃহের লোকেরা তাকে সর্বনিম্ন শ্রেণীতে পাঠিয়ে দিল। পথ দেখার জন্য সে মাঝে মাঝে ম্যাচের কাঠি জ্বালানো সত্ত্বেও আমি এটা-ওটার সাথে টক্কর খেতে লাগলাম, একটি বেঞ্চ পার না হতেই আর একটি বেঞ্চের সাথে ধাক্কা খেলাম। কিন্তু শেষমেশ কোন খালি জায়গা পেলাম না। লোকটি আমাকে কোণের একটি থামের কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'এখানে দাঁড়া। এখান থেকেই পর্দায় ছবি দেখতে পাবি। কোন সিটই খালি নেই।'

এর আগে আর কখনও আমি প্রেক্ষাগৃহে যাইনি। এ কারণে পর্দার কাছেই দাঁড়াতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করেছিলাম।

চলমান ছবি, রেকর্ডকৃত শব্দ ও থেকে থেকে জোকারদের চিৎকার মিলেমিশে এমন অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছিল যে, আমি কাহিনীর কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। আস্তে আস্তে অন্ধকারে আমার চোখের ঘোর কেটে গিয়ে হলের মধ্যে বসা দর্শকদের দেখতে সক্ষম হলাম। আমি পর্দা ছেড়ে আমার উপরে-নিচে, সামনে ও পেছনে বসা লোকদের দিকে তাকাতে লাগলাম। ধন ও ঐশ্বর্যের জৌলুস যাদের শরীরে বিদ্যমান, এমন সব ব্যক্তিদের পেছনের দিকে বসে থাকতে দেখে আমি দারুণ বিস্মিত হলাম। হঠাৎ এক সময় আমি একটি শূন্য আসন দেখতে পেয়ে বসার ইচ্ছা করলাম। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমার পা টনটন করছিল। যেই না আমি বসতে গিয়েছি অমনি আমার ডান দিক থেকে একজন যুবক ও বাম দিক থেকে অন্য একজন সজোরে আমাকে গুঁতা মারলো। কোন কথা বলার আগেই আমি আগে যেখানে ছিলাম, সেখানে গিয়ে পড়লাম। আমার আত্মমর্যাদা দারুণভাবে চোট খেল। এ সময় আমি তাদের একজনকে বলতে শুনলাম, কাহিনীর আসলই একটা হ-য-ব-র-ল-তুমি নিজেই ভেবে দেখ, আসনটি তো মালিকশূন্য।

কেউ তার বন্ধুর জন্য আসন রিজার্ভ করে রাখতে পারে-যে আসতেও পারে আবার নাও আসতে পারে, একথা আমার জানা ছিল না। বিশেষত তৃতীয় শ্রেণীর দর্শকরা। কিন্তু

পরে একথা আমার বিশ্বাস হয়েছে।

সিনেমা থেকে যখন ফিরলাম, তখন আমি অত্যন্ত ব্যথিত ও দুঃখ ভারাক্রান্ত। আমার দু'চোখ বেয়ে টপটপ করে পানি গড়িয়ে পড়ছে। আমি যেন বড় কোন অপরাধ করে বসেছি। আমি কি দুঃখিত ছিলাম আমার খরচ করা সেই পঁচিশটি মিলিমের জন্য? আমি কি দুঃখিত ছিলাম সেই সময়টুকুর জন্য, যে সময় আমি পড়াশুনা না করে সিনেমা দেখে কাটিয়েছিলাম? আমি কি দুঃখিত ছিলাম সেই রূঢ় শ্রমিকের কঠোর আচরণ এবং সেই যুবকদ্বয় যারা আমাকে দূরে নিক্ষেপ করেছিল তার জন্যে? না, এই কারণে যে, আমি যখন সিনেমা দেখে চিত্তবিনোদন করছি, তখন আমার আম্মা তাঁর বুকের যন্ত্রণায় ছটফট করছেন, অথবা আমার আব্বা চাষবাস কিংবা পানি সেচের জন্য মাঠে রাত কাটাচ্ছেন, বা লায়লা ও মাহমুদ এক টুকরো রুটি হাতে নিয়ে কিছু হালুয়া ও একটি ফলের আশায় কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে?

সম্ভবত আমার এ দুঃখ ও অন্তর্দ্বন্দ্বের মূলে ছিল এর সবকিছুই। এ ব্যথা ও যন্ত্রণা সত্ত্বেও আমি আমার নিজের মধ্যে দ্বিতীয় বার ছবি দেখতে যাওয়ার জন্য একটা তীব্র ইচ্ছা ও আগ্রহ অনুভব করতাম। কারণ সেখানে আমি এক আকর্ষণীয় জগতের সন্ধান লাভ করেছিলাম–যা আমার জ্ঞান–বুদ্ধিকে ছিনিয়ে নিয়েছিল এবং আমার কল্পনার জগতে প্রাধান্য বিস্তার করে বসেছিল। আমি সেই সময়টুকুতে আমার প্রবাস জীবনের একাকীত্বের অনুভূতি ও পড়ালেখার একঘেয়েমি থেকে কিছুটা মুক্তিও পেতাম। আমার সেই আযহারী বন্ধু–যে আমার সাথে থাকত, তাকে ফাঁকি দিয়ে মাঝে মাঝে আমি সেখানে চলে যেতাম। সে মাঝে মাঝে সামান্য ছুঁতানাতা নিয়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া বাধাতো এবং আমাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করত। এতে আমার পড়ালেখায় বিঘ্ন ঘটত এবং আমার মন–মেযাজ বিগড়ে যেত। ফলে আমার নিম্নমানের জীবনযাত্রা আরও করুণ হয়ে উঠতো।

এ সময়ে আমি অনেক বিকৃত চরিত্রের প্রবাসী ছাত্র ও দেহ–ব্যবসায়ী নারীদের সাথে তাদের অবৈধ সম্পর্কের কথা জানতে পারি। তারা এমন সব খারাপ জায়গায় রাত কাটাতো, যেখানে চলতো মদ, তাড়ি, গাঁজা ও জুয়ার আড্ডা। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করতাম এসব দুশ্চরিত্র ছাত্র থেকে দূরে থাকতে। একটা কল্পিত অপরাধ–অনুভূতি যা সময় সময় আমাকে তাড়া করে ফিরতো, এই দিক দিয়ে আমার জন্য অত্যন্ত উপকারী হয়েছে। সুতরাং সামান্য অধপতন, ত্রুটি–বিচ্যুতি আমার অনুশোচনা ও দারুণ মনোপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়াতো। এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, এতে আমি বেশ মানসিক কষ্ট অনুভব করতাম। কিন্তু তা অধপতনের অতল গহবরে নিয়ে যাবার দুঃখ ও কষ্ট থেকে অনেক কম। অকৃতকার্য হয়ে এক বছর পিছিয়ে পড়লে তার খরচ বহনের ক্ষমতা আমার আব্বার নেই। এ

কারণে, শুধুমাত্র অকৃতকার্যতার কথা চিন্তা হতেই ভয়-ভীতিতে আমার অন্তর কেঁপে উঠতো। সাথে সাথে আমি পড়ালেখায় মনোনিবেশ করতাম। শুধুমাত্র ফুটবল খেলা-যা আমি খুবই ভালোবাসতাম, সেই সময়টুকু ছাড়া আমি মোটেই বই ছেড়ে উঠতাম না।

আমি অনেক সময় সাঈদ যে সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে, সে সম্পর্কে ভাবতাম। সে প্রশান্ত চিত্তে তার পরিবারবর্গের সাথে রাত্রিযাপন করে। আমি যে সব মানসিক দ্বন্দ্ব ও যন্ত্রণা ভোগ করে থাকি, সে তা থেকে মুক্ত। খাবার ও নাশতা তৈরির যে ঝামেলা আমাকে পোহাতে হয়, তা তার নেই। অলসতাবশত অধিকাংশ সময় সামান্য কিছু খাবার অথবা 'ফূল', ভূষি মিশ্রিত আটার একটি রুটি ও এক টুকরো পনির খেয়েই আমি চালিয়ে দিই। এ কারণে সত্যি সত্যিই সাঈদকে হিংসা করার হক আমার আছে।

সেই দিনটির কথা আমি ভুলতে পারিনে। আমি 'সাইয়্যেদ বাদাবী'র মসজিদে বসে বসে পড়া মুখস্থ করছিলাম। মসজিদটিতে সব সময় লোক গিজগিজ করত। হঠাৎ আমি অনুভব করলাম, পকেটে আমার টাকার পার্সটি নেই। দুর্ভাগ্যক্রমে সে সময় আমার সেই আযহারী বন্ধুটি ও আমার মাঝে মনকষাকষি চলছিল। আমি সেই শহুরে মোটা, পুরো দু'টি শক্ত রুটি শুধুমাত্র লবণ দিয়ে খেয়ে চালিয়ে দিই। আমার আত্মমর্যাদা তার কাছে টাকা ধার চাইতে বাধা দেয়। আর ঘটনা তার জানা থাকা সত্ত্বেও সেও নিজে উপযাচক হয়ে কিছু অর্থ আমাকে দেয়ার চেষ্টা করেনি।

সাঈদই আমাকে এ দুরবস্থা থেকে উদ্ধার করে। যে সব কঠিন অভিজ্ঞতা আমার চাচা লাভ করেছেন এবং যে সব পরিস্থিতির তিনি সম্মুখীন হয়েছেন, সে মুহূর্তে তা আমার স্মরণ হলো।

বৃহস্পতিবার স্কুল ছুটি হলো। শায়খ হাফেজ আমাদের প্রতীক্ষায় ছিলেন। তিনি তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী দারোয়ান আম্মে ফারাজের সাথে কথা বড্ড লম্বা করছিলেন। আমি আর সাঈদ তাঁর ডানে ও বামে গা ঘেঁষে দাঁড়ালাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি আমাদের সঙ্গে করে 'আল-খান' স্ট্রীট থেকে 'আল-বুরসা' স্ট্রীটে এসে পড়লেন। সেখানে আমরা 'আল-বাদাবী'র মাযার যিয়ারত শেষ করে 'সিদী ইজ্জুর রিজালে'র মাযারটি যিয়ারত করলাম। এর মধ্যে শায়খ হাফেজ তাঁর দোকানের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে নিলেন। মনে হলো, আমাদের গ্রাম অপেক্ষা আল-কুরাশিয়্যায় তাঁর তেজারতী ভালোই জমেছে। কারণ, যে সব জিনিস তিনি কিনেছেন, তার পরিমাণ অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় অনেক

বেশী। তাঁর থলেভর্তি টাকার যে বান্ডিল দেখলাম, তা যে কোন লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শায়খ হাফেজকে দরাযহস্ত বলে মনে হলো। তিনি আমাদেরকে একটি অভিজাত হোটেলে নিয়ে গিয়ে গোশত ও সবজির তৈরি উৎকৃষ্ট খাবার খাওয়ালেন। এতেও তিনি তুষ্ট হলেন না। আমাদেরকে তিনি 'আত-তিজারিয়্যা' রেস্টুরেন্টে নিয়ে গেলেন এবং অত্যন্ত সুস্বাদু পানীয় পান করালেন। তারপর বললেন, বাবারা শোন! রেস্টুরেন্টে বসা শুধুমাত্র অর্থ ও সময়ের অপচয়। সুতরাং তোমরা এর ধারে-কাছেও যাবে না।

আমরা মাথা ঝাঁকিয়ে তাঁর কথার প্রতি সমর্থন জানালাম। এমন নসীহতের প্রয়োজন কিন্তু আমার ছিল না। কারণ, রেস্টুরেন্টে বসার মত যথেষ্ট পয়সাই আমার পকেটে থাকতো না। আগের কথার সূত্র ধরে শায়খ বলতে লাগলেন, আর তোমরা রাজনীতি থেকে দূরে থাকবে। তোমাদের বয়স এখনও অল্প। রাজনীতির রহস্য তোমরা বুঝবে না, তার বক্র পদ্ধতিসমূহ তোমাদের বোধগম্য হবে না। ভবিষ্যত জীবনে যখন তোমরা অনেক কাজ করবে, তখন রাজনীতির মধ্যে প্রবেশ করবে।

আমি জানিনে, হিটলারের পরাজয় ও আত্মহত্যার পর শায়খ হাফেজ কি রাজনীতি থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছেন? নাকি দীর্ঘ অভিজ্ঞতা তাঁকে মিসরের রাজনীতি ও এমন সব রাজনৈতিক নেতাদের সম্পর্কে কু-ধারণা পোষণ করতে বাধ্য করেছে, যাদের মধ্যে কেবল বক্তৃতা ও সস্তা শ্লোগান ছাড়া আর কিছুই নেই?

শায়খ হাফেজের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আমি দেখতে পেলাম তাঁর পকেটে পত্রিকা আছে এবং তার একাংশ বের হয়ে আছে। আদবের সাথে সাঈদ বলল, রাজনীতির প্রতি গুরুত্ব দেব না তা কেমন করে হয়, অথচ আমরাই তো ভবিষ্যতের যুবক এবং দেশের ভাবী পরিচালক?

শায়খ হাফেজ জোরে হেসে উঠলেন। সম্ভবত সাঈদের কথায় মনে মনে তিনি কিছুটা পুলকিত হয়েছিলেন, যা তাঁর দীর্ঘ হাসিতে ফুটে উঠেছিল। বললেন, এ তো রচনা ও বক্তৃতার কথা, যা ক্লাসে তোমাদের শিখানো হয়। কিন্তু বড় হয়ে তোমরা যখন প্রকৃত সত্য অবগত হবে, তখন অত্যন্ত বেদনাদায়ক বিষয়ের মুখোমুখি হবে।

-আব্বা, হুবুল ওয়াতান মিনাল ঈমান-দেশকে ভালোবাসা ঈমানের অঙ্গ।

-আমি তোমার দেশকে ভালোবাসতে নিষেধ করছিনে। এটা তো অবশ্যকর্তব্য। কিন্তু আমি তোমাদের অতিরিক্ত আবেগ-উচ্ছ্বাসকে ভয় পাই। তোমাদের সাথে পুলিশের আচরণের কথা একটু স্মরণ রেখ। তোমাদের বিক্ষোভকে তারা অত্যন্ত কঠোর হস্তে দমন করবে।

-আপনি কি বলতে চান, তারা আমাদের উপর কঠোরতা করবে এবং আমাদের প্রতি

গুলীবর্ষণ করবে?

নিশ্চয়ই। তোমরা তখন ভীত-সন্ত্রস্ত ছোট্ট ভেড়ার বাচ্চার মত পালাতে থাকবে। একথা বলতে বলতে শায়খ হাফেজ হো হো করে হেসে উঠলেন। কিন্তু সাঈদ স্বীয় অবস্থানে অটল থেকে দৃঢ়তার সাথে বলল, তারা হয়তো সময় সময় আমাদের উপর বাড়াবাড়ি করবে, তাতে আমাদের কিছু লোক যখম অথবা শহীদ হবে। তবুও আমাদের গর্বের জন্য এইটুকু যথেষ্ট যে, আমরা স্বাধীনতার জন্য জীবন দিতে পারি।

-সাঈদ, এত উত্তেজিত ও আবেগপ্রবণ হলে চলবে না। তোমাকে ভুললে চলবে না যে, পুলিশের লোকেরাও তোমার মত মিসরের নাগরিক। তাদের কেউ কেউ তোমার থেকেও বেশী দেশপ্রেমিক। তাদের কারো কারো ছেলে-সন্তান ও ভাই-বোন তোমাদের মধ্যে আছে। কিন্তু বেটা, ক্ষেত্রবিশেষে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ তাদের অবশ্যকর্তব্য হয়ে পড়ে।

-আমি যতটুকু জানি, তারা অত্যাচারের উপকরণ এবং স্বৈরাচারী শাসকদের হাতিয়ার।

-বেটা, সব দোষ গিয়ে পড়ে সেই উপনিবেশকারীদের ঘাড়ে। তারাই আমাদের জীবনকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। আমাদের মাঝে তারা সন্দেহের বীজ বপন করেছে এবং জাতির বিভিন্ন দল-উপদলের মধ্যে ফিতনার সৃষ্টি করেছে। এ সবের উদ্দেশ্য হলো, তাদের এবং আমাদের মাঝে যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত চলছিল, তা আমাদের নিজেদের মধ্যে সংক্রমিত করে দেয়া।

মনে হলো, একথা সাঈদের মনোপূত হলো না। সে তার হাতের বইখানি অনর্থক নাড়াচাড়া করতে লাগলো এবং পৃষ্ঠা উল্টাতে লাগলো। এরই মধ্যে শায়খ হাফেজ আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আর সুলায়মান, তুমি? আমার এ কথার ব্যাপারে তোমার মত কি?

জবাব দেয়ার আমি কিছুই পেলাম না। ভদ্রতার খাতিরে বললাম, আপনার উপদেশ আমরা শুনবো এবং তা মেনে চলার চেষ্টা করব। ইনশাআল্লাহ।

-তুমি সাঈদের চেয়ে অনেকটা শান্ত এবং আচার-আচরণে অধিক অগ্রসর।

শায়খ হাফেজ আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, সুলায়মান, তোমার কি হয়েছে? তোমার কি কোন রকম কষ্ট হচ্ছে?

আমি যে কষ্ট অনুভব করছিলাম, তা গোপন করার আপ্রাণ চেষ্টা করতে করতে বললাম, দ্বিতীয় ঘন্টা থেকে আমি সামান্য পেটে ব্যথা অনুভব করছি। ও কিছু না, শিগগিরই সেরে যাবে, এই ভেবে আমি এতক্ষণ গুরুত্ব দিইনি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, একটু একটু করে যেন বাড়ছে।

আসলে এই সময় আমার মনে হচ্ছিল কেউ যেন একটি ধারালো ছুরি দিয়ে আমার ডান পাশ কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলছে। আমার চেহারায়ও ব্যথার চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। এই কারণে আমি চুপচাপ ছিলাম। সাঈদ ও তার আব্বার আলোচনায় অংশগ্রহণ করিনি। সাঈদ ও তার আব্বাকে হাসিমুখে বিদায় দেয়ার উদ্দেশ্যে আমি আমার ব্যথা চেপে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিলাম। তাদেরকে ছেড়ে আমি আমার আবাসস্থলে চলে যাই, এটা শোভনীয় ছিল না। কারণ, তারা তো আমার মেহমান। সাথে সাথে শায়খ হাফেজ কোথা থেকে এক পিয়ালা বাকল ভিজানো পানি নিয়ে এলেন। তাঁর ধারণা, এতে আমি যে শূল–বেদনা অনুভব করছি, তার পরিসমাপ্তি ঘটবে। খাবার সময় আস্তে আস্তে আমাকে বললেন, সুলায়মান, শোন! তোমরা তোমাদের নিজেদের উপর নিয়ন্ত্রণ রেখ, যাতে তোমাদের পরিবারের কষ্ট ও দুশ্চিন্তার কারণ না হয়ে দাঁড়াও। এতে আল্লাহ তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং কামিয়াবী দান করবেন। তোমার ভাই সাঈদ অত্যন্ত কঠোর ও আবেগপ্রবণ। পরিণাম বুঝতে পারে না। তুমি সব সময় তার পাশে থাকবে এবং তাকে শান্ত রাখবে। সে তোমার বন্ধু। তোমার কথা শুনবে এবং তোমার কোন অনুরোধ সে ফেলবে না।

একটা ভীতি ও শংকার সাথে শায়খ হাফেজ কথাগুলো বলছিলেন। মনে হচ্ছিল, সেই মুহূর্তে যেন হতভাগিনী বাসীমার ছবি ও তার বিয়োগাত্মক ঘটনা স্মৃতিতে উপস্থিত করার চেষ্টা করছিলেন, যা তাঁর অন্তরকে ভেঙ্গে খানখান করে দিয়েছিল। দিবারাত্র যে ঘটনার কথা চিন্তা করতে করতে তাঁর মুখমন্ডল ও কপালে বার্ধক্যের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একথা সত্যি যে, বিগত দু'টি বছরে তিনি এত পাল্টে গেছেন, যা বহু বছরেও হয় না। সত্যি সত্যিই বাসীমার ব্যাপারটি ছিল কঠিন বেদনাদায়ক। তিনি তা স্মৃতি থেকে মুছে ফেলার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। যতই সে চেষ্টা বৃদ্ধি পাচ্ছিল সাঈদের প্রতি তার স্নেহ ও ভালোবাসার মাত্রাও প্রবল হচ্ছিল। কোন একটা বিপদের আশংকায় সব সময় তিনি তাকে সতর্ক করতেন।

আমি আমার আবাসস্থলে ফিরে এলাম। আমার ব্যথা আগের মত একই রকম তীব্র ছিল। আমি কিছু খেতে বা পান করতে পারছিলাম না। যে কষ্ট আমি পাচ্ছিলাম, তাতে ঘুমানোও সম্ভব ছিল না। আমি আমার বিছানায় গড়াগড়ি যাচ্ছিলাম, আর আহ্ উহ্ বলে কোঁকাচ্ছিলাম। আর এদিকে আমার রুমমেট আযহারী বন্ধুটি তার চেয়ারে বসে এত জোরে জোরে পড়া মুখস্থ করছিল যে, আমার সব কান্নাকাটি ও হাহুতাশকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। যখন আমার কান্নাকাটি আরও বেড়ে গেল, আমার দিকে একটু অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বলল, ইংরেজী লবণের এক গ্লাস শরবত দেব কি?

–তাতে পেটের ব্যথার কোন উপশম হবে না।

আমার বন্ধু, আল্লাহ তাকে মাফ করুন, আবার আগের মত উচ্চস্বরে পড়া শুরু করলো। আমি যে একজন মানুষ চেঁচামেচি করছি, আমার প্রাণটি বের হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে, সে যেন এক কামরায় অবস্থান করেও টের পাচ্ছে না।

সামান্য কিছু ব্যক্তিগত মতপার্থক্যের কারণে আমার রুমমেটের এহেন রূঢ় আচরণে আমার সকল অনুভূতি বিদ্রোহী হয়ে উঠল। সেই মুহূর্তে অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে সবচেয়ে বেশী একাকীত্ব অনুভব করলাম। আমি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লাম।

মন আমাকে বলল, এ সময় যদি আমি আমার আব্বা, আম্মা ও দাদীর কাছে থাকতাম, তাহলে দৈহিক যন্ত্রণার সাথে যে মানসিক যন্ত্রণা পাচ্ছি এবং যার দরুন আমার ইচ্ছ হচ্ছে জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করি, তা কি পেতাম? আমার কোঁকানি–কাতরানির শব্দ আশপাশের লোকদের কানে গিয়ে পৌছলো। আমার রুমমেট উত্তেজিত হয়ে বলল, চিল্লানি শেষ হবে কি? তুমি কি আমাকে এখানে লজ্জা দিতে চাও?

আমার শিরা–উপশিরায় রক্ত গরম হয়ে উঠল। অশ্রুতে আমার দু'চোখ ভরে গেল। আমার ইচ্ছে হলো আমার বিছানার পাশে জানালার ধারে মেটে কলসে যে পানি রাখা আছে, তা তার মাথায় ঢেলে দিই। কিন্তু আমি নিজেকে সংযত করে নিই। মনে মনে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকি, তিনি যেন আমার ব্যথা প্রশমিত করেন।

হায় আফসোস! আমি কি এভাবে ছটফট করতে করতে শেষ হয়ে যাব?

আমাদের পাশের কামরায় একজন মিলিটারী পুলিশ আর তার স্ত্রী থাকত। তারা আমাকে দেখার জন্য ও আমার অবস্থা জানার জন্য দৌড়ে এলো। পুরুষটি বলল, তোমাকে এখনই ডাক্তার দেখানো দরকার।

ডাক্তার! ডাক্তারের ভিজিট দেয়ার মত পয়সা আমার কোথায়? আমার সারাটি জীবনেও তো ভিজিট দিয়ে ডাক্তার দেখানো ঘটেনি। কত বছর যাবত আমার আম্মা বুকের ব্যথায় ভুগছেন, তবুও একটি বারের মত তাঁকে ডাক্তারের কাছে পাঠাবার চিন্তাও আমরা করিনি। আমি যে বিস্ময়ের মধ্যে আছি সম্ভবত লোকটি তা বুঝতে পেরে বলল, অ্যাম্বুলেন্স ডেকে আমরা তোমাকে 'আল–আমীরী' হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু সাথে সাথে তার স্ত্রী প্রতিবাদ করে বলে উঠল, না। কোন ফ্রী হাসপাতালেই দায়িত্ব ও নিষ্ঠা সহকারে চিকিৎসা করা হয় না। সেখানে যাওয়া অপেক্ষা মৃত্যুকেই আমি শ্রেয় মনে করি।

–কিন্তু সেগুলো তো মানুষের চিকিৎসা ও আরামের জন্যই রয়েছে।

–শোন, আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়নি, আমি কিছুতেই একে সেখানে নিয়ে যেতে দেব না। তারপর আমার দিকে চেয়ে বললঃ

–শোন, সুলায়মান! তোমার যদি অর্থের প্রয়োজন পড়ে, তোমার আব্বা না আসা পর্যন্ত আমরা তোমার জন্য খরচ করব। তোমাকে কিছুই করতে হবে না। তুমি অনুমতি দিলেই আমরা এখনই কোন বিশেষ হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে তোমাকে পরীক্ষা করানোর ব্যবস্থা করব।

যখন কথাবার্তা চলছিল, সে সময় আমার সেই বন্ধুটি নির্বোধ ও শান্তশিষ্ট মানুষের মত চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু যখন সে বুঝতে পারল ব্যাপারটি বেশ জটিল, তখনই সে তার নির্বুদ্ধিতা ও শান্তশিষ্ট ভাব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি আমার আব্বার সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করল এবং আমাকে ডাক্তারের কাছে নেয়ার জন্য গাড়ীও ডেকে আনল। অতঃপর খুব দ্রুত আমাকে আমেরিকান হাসপাতালে নিয়ে গেল অপারেশনের জন্য।

অপারেশন সফল হলো। আমি আমার সংজ্ঞাহীন অবস্থা থেকে চেতনা ফিরে পেয়ে আমার পাশে উপবিষ্ট আমার পরিবারের লোকদের প্রতি চোখ মেলে তাকালাম। তারা বসে বসে কান্নাকাটি করছে। আব্বা, আম্মা ছোট লায়লা ও মাহমুদ। এমনকি আমার দাদীও। তিনি তাঁর অভ্যাস মত খুব দরদের সাথে আমার কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। সম্ভবত অপারেশন কিভাবে সফল হলো, তাই তিনি ভীত–শঙ্কিতচিত্তে পর্যবেক্ষণ করছিলেন।

দু'টি সপ্তাহ কেটে গেল লোকজনের দেখা–সাক্ষাত, আনোগোনা, আমার দ্রুত সুস্থতার জন্য দোয়া ও শুভ কামনার মধ্য দিয়ে। এ দিনগুলো সাঈদের দারুণ উৎকণ্ঠা ও পেরেশানির মধ্যে কাটে। এমন একটি দিনও যায়নি, যেদিন সে আমার সাথে দেখা করেনি।

হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বের হওয়ার পর দেখতে পেলাম, স্কুলে আমার চাচার একটি চিঠি আমার প্রতীক্ষায় পড়ে আছে। আমার চাচা লিখেছেনঃ

বাবা সুলায়মান,

আমার জীবনের এ সংকটময় সময়ে আমার তাকদীরে ছিল নানা রকম দুর্যোগ ও দুঃখ–কষ্টের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করা। কায়রো আসার পর থেকে আমি একের পর এক কাজ পরিবর্তন করে চলেছি। কনস্ট্রাকশন, ঠিকাদার ও রুটির কারখানায় দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে শ্রমিকের কাজ করেছি। যার মজুরির পরিমাণ কয়েকটি গুরুশের বেশী নয়। এ সময় আমার মুখের গ্রাস ছিল আমার মুখমন্ডল, পরনের কাপড় ও মাথায় চুলের মত সম্পূর্ণ ধূলিমলিন। সূর্যের গনগনে উত্তাপে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে কাজ করার সহ্যশক্তি আমি অর্জন

করেছি। তবুও আমি একটু নিরিবিলি ও প্রশান্ত জীবনের নিশ্চয়তা পাইনি। সব সময় ঘাড় ধাক্কার শিকার হয়েছি। আমার সম্মুখের রাস্তা বড় বন্ধুর। তার সূচনাটিও দারুণ কষ্টদায়ক। তবুও নতুন করে আমি আমার ভবিষ্যত গড়তে চাই। অন্য কথায় শূন্য থেকে যাত্রা শুরু করব। বেটা! মনে হচ্ছে, কঠিন কাজ আমাকে ভোগ-বিলাসিতার কথা ভুলিয়ে দিয়েছে। আর রাত জাগার কথা? আমি তো এক বা দু'ঘন্টাও রাত জাগার শক্তি আমার মধ্যে পাইনি। সারাদিন কঠিন কাজে নিমগ্ন থাকার কারণে রাতে শোবার সাথে সাথে মধুর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ি। আমি আমার সেই অতীতের কথা স্মরণ করি, যখন এটা-সেটা না খেলে বা পান করলে আমার ঘুমই আসতো না। আমার ধারণা, তুমি আমার কথার তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারছ।

ফুল, তেল ও লবণ মিশ্রিত একখানা রুটিই এখন আমার ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণের জন্য যথেষ্ট। প্রতিদিনের আহার সংগ্রহের মধ্যে আমার সকল চিন্তা ও শ্রম নিবদ্ধ থাকে। এখন আমার সমস্যা দেখা দিয়েছে জুতো ও পোশাকের। অথচ দীর্ঘদিন কাজ করে তা একেবারেই ছিঁড়ে গেছে।

সুলায়মান! রমযান মাস তো এসে গেছে। মনে পড়ে রহমত ও রুহানিয়্যাতের তরঙ্গ প্রতিবছর আমাদের সেই ছোট্ট শহরটিকে কিভাবে প্লাবিত করে। আরও মনে পড়ে ছোট্ট ছোট্ট ছেলে-মেয়েরা শা'বানের শেষ দিন আসরের পর কিভাবে আনন্দে হৈহুল্লোড় শুরু করে দেয় এবং মিষ্টি সুরে তারা কোরাস গাইতে থাকে 'আস-সিয়াম বুকরাহ ইয়া ইবাদাল্লাহ'-আল্লাহ্‌র বান্দারা, আগামীকাল সিয়াম। আরও মনে পড়ে সেই বড় মসজিদটির কথা। কৃষকরা তাতে যেন গিজগিজ করত। দোয়া, তাকবীর ও তাসবীহের আওয়াযে একটি চিত্তাকর্ষক ও মিষ্টিমধুর আবহের সৃষ্টি করত। মসজিদের তেলের বাতিগুলোর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেত। ছোট ও বড়দের একটি দল গ্রামের এক মাথা থেকে অন্য মাথা পর্যন্ত তাকবীরধ্বনি দিয়ে মানুষকে সাহরীর সময় ঘুম থেকে জাগাতো। আমার মনে পড়ে, তখন তুমি খুব ছোট্ট। ঘুম থেকে জেগে ঘুমবিজড়িত চোখে ঘর থেকে বের হয়ে আসতে। অতি কষ্টে দু'চোখের পাতা খুলে সেই দলটিকে দেখার চেষ্টা করতে এবং তাদেরকে ক্ষীণ শিখার তেলের বাতির আলোর কাছে আসার জন্য ডাকতে। এ নগর এবং তার শোরগোল ও চাকচিক্য সেই সরল ও অনাড়ম্বর প্রকৃতিগত সৌন্দর্য এবং সেই অপূর্ব মনোরম জীবন্ত চিত্র যার মাঝে আমি দীর্ঘকাল কাটিয়েছি, তা থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছে। এ কারণে, আমি একটি মসজিদে আশ্রয় নিয়ে ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে দোয়া-দুরূদ ও নামায আদায়ের মাধ্যমে সময় অতিবাহিত করছিলাম। কিন্তু ঈদের দিন আমার স্নায়ু শক্তিহীন হয়ে পড়লো। কারণ, সেদিনই অনুভব করলাম আমি সত্যি সত্যিই

একজন প্রবাসী। মানুষ একে অপরের সাথে কোলাকুলি করছে, শুভেচ্ছা বিনিময় করছে এবং একজন আরেকজনের সাথে সাক্ষাত করছে। আর আমি? আমি যেন সুন্দর একটি উদ্যানের মাঝে কাঁটাওয়ালা একটি বৃক্ষ, যার গায়ে কেউ হাত ছোঁয়াচ্ছে না এবং কেউ তার ধারে–কাছেও যাচ্ছে না।

এ কথা সত্যি, আমি নতুন জুতো ও জামা–কাপড় লাভ করতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু তার বিনিময়ে আমাকে যে কত কষ্ট ও ধকল সহ্য করতে হয়েছে, তা তোমাকে বুঝানো যাবে না। কিন্তু যে সত্যটি আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি তা হলো, ঈদ তাদের জন্য নয়, যারা কেবল নতুন জামা–কাপড় পরছে, খোশবু মেখেছে এবং কাজ ছেড়ে দিয়েছে।

এত কিছু সত্ত্বেও আমি আত্মতৃপ্তি লাভ করে থাকি। কারণ, পরিশ্রম করে আমি যা কিছু অর্জন করি, তাতেই আমার পেট চলে যায়। কিছু পাওয়ার আশায় কারও কাছে হাত পাততে হয় না। তাছাড়া আর একটি জিনিস যার নাম সম্মান–যেখানেই আমি যাই আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। আর এ জিনিসটি অথবা প্রতীকটি আমাকে ধৈর্য, সৌভাগ্য ও আশার মাধ্যমে প্রচুর শক্তি যুগিয়ে থাকে। সুলায়মান, তুমি হয়তো মনে করছ আমাদের মত মানুষের জন্য সম্মান নিহিত থাকে মাটি, পাথর ও ষ্টেশনে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের মধ্যে। তুমি হয়তো ধোকায় পড়ে এরূপ ধারণা করতে পার। কিন্তু তা নয়, সুলায়মান! আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তুমি এই প্রতীক তথা আত্মসম্মানকে কঠোরভাবে আঁকড়ে ধরবে। তাহলে তা থেকেই অনেক সান্ত্বনা লাভ করবে এবং দুর্যোগ ও কঠোরতাকে সহ্য করার অনেক শক্তি পাবে।

তুমি হয়তো অবাক হচ্ছো, আমার যা বিদ্যাবুদ্ধি আছে তার সাহায্যে আমি কেন ভালো একটি কাজ তালাশ করি না। কিন্তু আমি তোমাকে বলি, মেডিকেল সার্টিফিকেটে অযোগ্যতাই আমার প্রধান প্রতিবন্ধক। অবৈধ কোন পথ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে এ বাধা অতিক্রম করতে আমি সক্ষম নই। আর তুমি তো জান প্রতিদিনের খাবারটুকু ছাড়া আর কোন পয়সাই আমার কাছে থাকে না। তাছাড়া এ অবৈধ পন্থাকে আমি দারুণভাবে ঘৃণা করি। সুতরাং যারা এ কাজ করে তাদের সাথে শরীক হয়ে তাদের অপবিত্র পথে কিছু করার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

এ মাসে আল্লাহ তাআলা আমাকে একটু প্রশান্তি ও স্থিরতা দান করেছেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের গুদাম বিভাগে ছোট্ট একটি কাজ জোগাড় করতে সক্ষম হয়েছি। দৈনিক বারো গুরুশ মজুরির ভিত্তিতে পাহারাদার হিসেবে নিযুক্তি লাভ করেছি। আমি অর্ধেক দিন পাহারা দিই–এক সপ্তাহ রাতে, আর এক সপ্তাহ দিনে। আমি বিশ্বাস করি এতটুকুই আমার জন্য যথেষ্ট। এর জন্য সকল প্রশংসা আল্লাহর। এখন আমি যা আশা করি তা হলো, আল্লাহ

তাআলা যেন আমাকে একটি সতী–সাধ্বী পুণ্যবতী স্ত্রী দান করেন। যে আমার বার্ধক্যের কাছাকাছি বয়সের উপযোগী হবে এবং আমার প্রবাস জীবনের একাকীত্ব দূর করবে। সুলায়মান! আমি আর মোটেও বৈরাগীর জীবনযাপন করতে সক্ষম নই।

এখন থেকে তুমি এ ঠিকানায় চিঠিপত্র লিখতে পারঃ

'কিলআতুল কাবাশ'

শারে' আত–তুলুনী

নং(.....)

তোমার তাওফীক ও কামিয়াবীর জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করছি।

৯

এ বছর গরমের ছুটিটি ছিল অত্যন্ত আনন্দদায়ক। উপকূলীয় কোন শহরে ছুটিটি কাটাবো, এ কথা শোনার কারণে আনন্দ নয়। সেটা তো আমার জন্য অসম্ভব। আমার আনন্দের মূল কারণ হলো, পরীক্ষায় আমার সফলতা। সাঈদ হাফেজের মত বেশী পরিশ্রম করে পড়ালেখা করতে পারিনি। শত বাধা–বিপত্তি ও অসুস্থতা এবং পারিবারিক নানা সমস্যা সম্পর্কে সর্বক্ষণ আমার দুশ্চিন্তা, যা স্কুলে আমার পাঠের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এত কিছু সত্ত্বেও আমি বেশ ভালো ফল করেছিলাম।

একদিন আমি যুবকদের অবসর সময়ের সমস্যা এবং বিদেশে তারা কিভাবে অবসর কাটায়, সে সম্পর্কে পড়ছিলাম। অবসর সময়ে তারা কল্যাণকর কাজ করে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু সংখ্যক যুবকের ছবি আমি গভীরভাবে দেখতে লাগলাম। এ সময় তারা নার্সিং হোমে, রেস্টুরেন্টে অথবা বিশেষ কোন বিষয়ের উপর বক্তৃতা দানের মাধ্যমে কয়েক ঘন্টা কাজ করে থাকে। বিষয়টি আমি গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করলাম। তারপর আব্বার কাছে গেলাম। আমার আম্মাও তখন সেখানে ছিলেন। বললাম, এ বছর আমার নতুন পোশাকের প্রয়োজন। আমি খাটো প্যান্ট পরা ছেড়ে সুফীদের মত লম্বা পাজামা পরা শুরু করতে চাই। কারণ, এখন তো আমি বড় হয়েছি। কি তাই না আব্বা?

–সুলায়মান, আল্লাহ সব ব্যবস্থা করবেন। স্কুল খোলার এখনও তিন মাস বাকী।

–বিষয়টি সম্পর্কে এখনই চিন্তা করতে আপনার কোন বাধা আছে? এ ব্যাপারে আমি আপনার কাছ থেকে কথা নিতে চাই।

আমাদের দু'জনের কথার মাঝখানে আমার মা হঠাৎ করে বলে উঠলেন। বলতে বলতে তিনি তাঁর সেই অভিশপ্ত বুকের ব্যথায় আক্রান্ত হয়ে পড়লেন।

–বিষয়টি আল্লাহর ওপর ছেড়ে দাও। এখন থেকেই মাথার মধ্যে দুশ্চিন্তা ঢুকিও না। তোমার সব কিছুই আমরা ব্যবস্থা করব।

আব্বা তাঁর বাকী কথাটুকু শেষ করতে সাহায্য করলেন, যাতে তার কষ্ট কিছুটা লাঘব হয়। বললেন, অবশ্যই। আমরা অভুক্ত ও উলঙ্গ থেকে হলেও তোমার সবকিছু ব্যবস্থা করে দেব। তোমার দাবী অত্যন্ত পবিত্র।

–আব্বা! এ দুনিয়ার জন্য এমনভাবে কাজ করুন যেন চিরকাল এখানে বসবাস করবেন, আর আখিরাতের জন্য এমনভাবে কাজ করুন যেন আগামীকালই আপনি মৃত্যুবরণ করবেন। আমি জানি, আর্থিক অবস্থা আশানুরূপ নয়। তাহলে এখনই কেন বিষয়টির সমাধান বের করে ফেলি না?

–তুমি কি বলতে চাচ্ছ?

–এ তিনটি মাসের জন্য, নতুন করে ক্লাস শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত, বড় কোন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে একটি কাজ আমি যোগাড় করে নিই না কেন?

বিস্ময়ের সাথে আব্বা বলে উঠলেন, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান? না, না। সুলায়মান! আল্লাহ আমাদেরকে তা থেকে দূরে রাখুন।

সাথে সাথে আমি বললাম, আমি আমার সময় কাজে লাগাই এবং কিছু জুনাই অর্জন করে তা দিয়ে আমার বই–পুস্তক ও পোশাকাদি ক্রয় করি তা কি হারাম? তাতে আপনাদের বোঝা কিছুটা লাঘব হবে। তাছাড়া দেনার অর্ধাংশের জন্য আমরা এখনও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কিভাবে তা পরিশোধ করব, তা আমাদের জানা নেই। মুরসে আবু আফার সব সময় আমাদের উপর চাপ দিচ্ছে এবং বিষয়টি আদালতে উঠাবার ভয় দেখাচ্ছে।

কোন উত্তর না দিয়েই আব্বা তাঁর আসনে অস্থিরভাবে একটু নড়েচড়ে বসলেন। রোগ ও ব্যথার কথা ভুলে গিয়ে আম্মা চিৎকার করে উঠলেন, আবদুদ দায়িম, এমন কথা শুনেও আপনি কি করে চুপ থাকলেন। নির্দয় যন্ত্রপাতির মধ্যে কাজ করার জন্য আপনি কি আপনার ছেলেকে ছেড়ে দেবেন? একবার যদি দুর্ঘটনা ঘটায়, তাহলে শেষ, নইলে চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয়ে আমাদের কাছে ফিরে আসবে। এভাবে আমাদের সকল ত্যাগ–তিতিক্ষা চিরতরে শেষ হয়ে যেতে দেবেন?

সংগে সংগে আমি উত্তর দিলাম, আম্মা, যা হবার তা তো হবেই। তাছাড়া, আমাদের এ শহরের যে সব ছেলে বড় ধরনের কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে, তাদের কেউই তো কোন দুর্ঘটনার শিকার হয়নি।

–সুলায়মান, তোমার আম্মার কথা শোন। জীবনে সফল হবে। বেটা, অন্য কোন ভালো কাজ কর। এ বিষয়ে আলোচনা ছেড়ে দাও। আমাদের রেযেকের দায়িত্ব আল্লাহর উপর।

হাঁপানির ভিতরে নিঃশ্বাস নেয়ার জন্য আম্মা কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। তারপর বললেন, বাসীমার কাহিনী কি ভুলে গেছ? আল্লাহ তার মা–বাবাকে সাহায্য করুন।

আমি পুরো এক সপ্তাহ ধরে আম্মাকে সাধাসাধি করলাম যাতে তিনি রাযী হন। কিন্তু কোনই ফল হলো না। বাসীমার করুণ পরিণতি ছিল তাঁদের প্রমাণ, যা তাঁরা সবসময় আমার সামনে উপস্থাপন করতেন। আমি বুঝতে পারলাম, যেসব পোশাক আমি চাই, আব্বা তা আমাকে দিতে চান, কিন্তু যে পদ্ধতির আমি আশ্রয় নিতে চাই, তাতে তিনি রাযী নন। অবশেষে আমি একটি সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলাম।

আব্বা আমাকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যেতে নিষেধ করেন তাঁর রক্ষণশীল আত্মসম্মানবোধ এবং চিরাচরিত কিছু প্রথার কারণে, যে প্রথা কেবল তাদেরই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যেতে অনুমতি দেয়, যাদের জীবিকার অন্য কোন উৎস নেই।

আমার জীবনের আশংকায় আম্মা আমাকে যা খুশি তা করতে দিতে চান না। আমার আব্বার সেই তথাকথিত আত্মসম্মানবোধ, আমার দৃষ্টিতে যা সঠিক কোন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তা আমি মেনে নিতে পারিনে। নতুন বছরে আমি কি স্কুলে যাব জোড়াতালি দেয়া পোশাক পরে? তাতে কি আমার আত্মমর্যাদা বাড়বে? আব্বার দুর্বল আর্থিক অবস্থারও বোঝা হয়ে থাকা এবং আমার প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয়ের জন্য তাঁর কাছে আব্দার করাও তো একটা যুলুম। যন্ত্রপাতি ও মেশিনের বিপদাপদ থেকে আমাকে রক্ষার জন্য তিনি যে যেদ ধরে বসে আছেন, তা অবশ্য মেনে নেয়া যায়। কিন্তু আমার জীবনের পরিচালক তো আমি নিজেই। অত্যন্ত সতর্কতা ও গুরুত্বের সাথে আমি সে জীবন অতিবাহিত করবো। আমি এ ছুটিতে কিছু কাজ করে আমার অধপতিত অবস্থার উন্নতি করতে চাই কিন্তু শত মিনতি ও কান্নাকাটি সত্ত্বেও আমি কাজের উদ্দেশ্যে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার অনুমতি পেলাম না।

সেখানে যাওয়ার জন্য সামান্য কিছু পয়সা এবং কোন বাহানা খুঁজে পেতে তেমন কোন কষ্ট আমার হয়নি। আমি খুব তাড়াতাড়ি একটি কোম্পানীতে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত আমার এক পরিচিত ব্যক্তির কাছে গেলাম। চমৎকার একটি কাজে আমাকে লাগিয়ে দিতে তিনি মোটেই কার্পণ্য করলেন না। যতটুকু আমার মনে পড়ে দুই অথবা তিন দিন যেতে না যেতেই হঠাৎ করে একদিন আমার আব্বা এসে উপস্থিত। তাঁর চোখ–মুখ থেকে ক্রোধ যেন তখন উপচে পড়ছে। আমার আকস্মিকতার ভাব কাটতে না কাটতেই আমার মুখে সজোরে

এক থাপ্পড় বসিয়ে দিয়ে তিনি বলতে লাগলেন, পিতা-মাতার আনুগত্য সম্পর্কে স্কুলে কি তোমাকে এই শিখিয়েছে? স্কুল যদি তোমাকে সঠিক তরবিয়্যাত না দিতে পেরে থাকে, তাহলে আমি নিজেই সে দায়িত্ব পালন করব। কথা বলো! মুখ খোল! এখানে আসার জন্য কে তোমাকে অনুমতি দিয়েছে?

আব্বা তখন এত উত্তেজিত ছিলেন যে, আমি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না। তাঁর ছিল অনড় বক্তব্য। কোনভাবেই তাতে নড়চড় হওয়া সম্ভব ছিল না। আর আমি ছিলাম আমার চিন্তায় স্থিরপ্রতিজ্ঞ। উত্তেজনা কমিয়ে তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য আমি চুপ থাকাই ভালো মনে করলাম। আব্বা তাঁর চারপাশে চোখ বুলিয়ে দেখলেন, আমি যে ঘরে থাকি, তার দুরবস্থা ও সেখানে রক্ষিত ভাঙ্গাচোরা কফ-থুথুতে পরিপূর্ণ নোংরা জিনিসপত্র। তারপর সবশেষে আমার চার সঙ্গীর দিকে তাকালেন। তাদের কেউই অপরিচিত ছিল না। কারণ, তারা আমাদের গ্রামেরই কৃষক সন্তান। রাগের সাথে বললেন, সত্যিই, গরু, মহিষ ও গাধা ছাড়া আর কোন কিছুই তোমার উপকারে আসেনি। আর এদিকে আমরা চেষ্টা করছি তোমাকে মানুষ করতে এবং বড় অফিসার বানাতে। কিন্তু তুমি যেদ ধরে বসে আছ নিজেকে এই পুঁতিগন্ধময় স্থানে নিক্ষেপ করার জন্য।

তিনি আমার কাছে এগিয়ে এলেন। তখনও তিনি দারুণভাবে উত্তেজিত। তারপর এ কথা বলতে বলতে আমার বাহু ধরে টান দিলেন, আমার আগে আগে শহরের দিকে চল, বেয়াদব কোথাকার!

আব্বার উত্তেজনা ও ক্রোধ কিছুটা প্রশমনের পর আমার যে আত্মীয় আমাকে কাজ সংগ্রহ করে দেয়ার ব্যাপারে সাহায্য করেছিল, তার মাধ্যমে আমি তাঁকে বুঝালাম। যা কিছু ঘটেছিল বিস্তারিত সব তাঁকে খুলে বললাম। মেডিকেল ও ফিটনেস সার্টিফিকেট যোগাড় করার জন্য আমাকে যে বেগ পেতে হয়েছিল, তাও তাকে অবহিত করালাম। আমি তাঁর কাছে নত হলাম, তাঁর হাতে চুম্বন করলাম এবং বিষয়টিকে হালকা করার জন্য আমার কাছে যত যুক্তি ছিল সবই উপস্থাপন করলাম। কিন্তু কোনই ফল হলো না।

আমরা যখন আমার সেই আত্মীয়ের কাছে গেলাম তার চেষ্টার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাতে এবং আমাকে এভাবে ধরে আনার ব্যাপারে ক্ষমা প্রার্থনা করতে, তখন সম্পূর্ণ বিষয়টি আমার দিকেই মোড় নিল। এ আত্মীয়টির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদার। আমাদের সব কিছু তিনি জানতেন। আমার পরিষ্কার দৃষ্টিভঙ্গিও তার কাছে গোপন ছিল না। মৃদু হেসে তিনি আমার

আব্বাকে বললেন,

–আবদুদ দায়িম, তাতে কি হয়েছে?

–জনাব বেগ সাহেব, এতো একটা অপমান।

–কখ্খনও না। হালাল পথে গায়ের ঘাম ঝরিয়ে অর্থ উপার্জন করা তা কখ্খনও অপমান নয়।

–সুলায়মান এখনও অল্পবয়স্ক। কষ্টের কাজ সে করতে পারবে না।

–সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান। তার দায়িত্ব সে বোঝে।

–কিন্তু----।

আমার আব্বার কথা কেটে দিয়ে তিনি বললেন,

–আমাদের ছাত্ররা ছুটির দিনগুলো যে অলস হয়ে বসে বসে কাটাতে অভ্যস্ত, আমি মোটেই তা পছন্দ করি না।

–আজ আমি যে ঘরে তাকে পেয়েছি, তা যেন অবিকল জীবজন্তুর খোঁয়াড়। বেগ সাহেব! তার এ দুরবস্থা এবং নোংরা শ্রমিকদের সাথে তার এ অবস্থান কি আপনি মেনে নিতে পারেন?

–ও, এই ব্যাপার? আমার পরিচিত একটি ভদ্র পরিবারে তার সুন্দর থাকা–খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেব। তাদের একটি সন্তানের মত সুলায়মান তাদের সাথে বসবাস করবে। আর কাজের দিক থেকে আপনার সুলায়মানকে একজন অফিসার হিসেবে গণ্য করা হবে। কারণ, তার তো প্রাইমারী স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা পাসের সনদ আছে। আর আমার বিভাগের সাথে গভীরভাবে জড়িত লেখাপড়ার কাজের দায়িত্বই তাকে দেয়া হয়েছে। এরপর আর কি চান আপনি?

মনে হলো তার এ বাক্য "আপনার ছেলেকে একজন অফিসার হিসেবে গণ্য করা হবে। কারণ, তার প্রাইমারী স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা পাসের সনদ আছে"–আমার আব্বার বুকটাকে শীতল করে দিল। আর আমার এ কাজের কারণে তিনি যে লজ্জা ও অপমান বোধ করছিলেন, তা দূর হয়ে গেল। নরম সুরে তিনি বললেন,

–বেগ সাহেব! আল্লাহ আপনাকে কল্যাণ দান করুন, আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন এবং আপনার দ্বারা আমাদের উপকৃত করুন।

লোকটি আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি ও স্নেহের সুরে বললেন,

–শোন সুলায়মান! এখানে আমি তোমার আব্বার মত। যখনই কোন কষ্ট বা অসুবিধা বোধ করবে, তা সে তোমার কাজের ব্যাপারে বা থাকার ব্যাপারেই হোক না কেন, কোন দ্বিধা–সংকোচ না করে সরাসরি আমার সাথে যোগাযোগ করবে। ইনশাআল্লাহ, আমার

সাধ্যমত তোমার ইচ্ছা পূরণের চেষ্টা আমি করব। কারণ, আমি কর্মঠ ও সচেতন ছাত্রদের খুব ভালবাসি।

এই বড় ব্যবসায়িক কোম্পানীতে আমি এই যে তিনটি মাস কাটালাম, তা আমার মন–মানসের ওপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। এ সময়ে আমি জীবিকা অর্জনের স্বাদ ও একমুঠ আহারের জন্য কঠোর শ্রমের যে সৌন্দর্য, তা উপলব্ধি করি। আমার থেকে বয়সে ও মর্যাদায় বড় অফিসারদের সাথে আমি কাজ করেছি, সহকর্মীদের অনেক আজেবাজে কথার আমি সম্মুখীন হয়েছি। বিশেষত আমার মত যাদের জীবনের ঘাত–প্রতিঘাতের কোন অভিজ্ঞতা নেই এমন ছন্নছাড়া সঙ্গীদের থেকেই বেশী দুর্ভোগ পেয়েছি।

কিন্তু আমার সেই আত্মীয়টি ছিলেন প্রতিরক্ষা বর্মের মত। তিনি তাদের ধোকাবাজি, তামাশা ও কর্মচারীদের জীবনে যে সব কর্ম থাকে, তা থেকে সব সময় আমাকে রক্ষা করেছেন।

আমি অসংখ্য শ্রমিকের সাথে মিশেছি, তাদের পানাহারে শরীক হয়েছি। তাদের যত সব জটিল সমস্যাসমূহ অনুধাবন করেছি। আমি স্বচক্ষে দেখিছি তাদের অসংখ্য মারামারি ও ঝগড়া–ফাসাদ। বিশেষত আর–কোবরী–আস–সুফলা'র যে মারামারিগুলো হতো। এখানে 'আল–মানুফিয়ার' ছেলেরা 'আল–গারবিয়্যার' লোকদের প্রতীক্ষায় ওঁৎ পেতে থাকতো । অতি তুচ্ছ কারণে তারা ছুরি ও খঞ্জর চালিয়ে দিত।

তারা তাদের নিম্নমানের সংকীর্ণ আবাসস্থানগুলোতে অসংখ্য জিনিসপত্র ছড়িয়ে – ছিটিয়ে আবর্জনাময় করে তুলতো। সম্ভবত তাদের বাসস্থানের সংকীর্ণতা তাদের মনের ওপর প্রতিফলিত হয়েছে। তাই তারা এত একগুয়ে ও হিংসুটে। তাছাড়া স্বাস্থ্য সম্পর্কে তাদের উদাসীনতা, মূর্খতা এবং নিম্নমানের খাবারও এর কারণ।

শেষ বারের মত গ্রামে ফিরে আসার প্রায় দু' সপ্তাহ পূর্বে আমার এক বন্ধু আমাকে খবর দিল যে, আব্বার অভ্যাস মত আমার জন্য তিনি কিছু খাদ্য–খাবার পাঠিয়েছেন। সেই সংগে দু'টি মুরগীও। সেগুলো একজন শ্রমিকের নিকট আছে। আর সেই শ্রমিকটি আমার বন্ধুও। কিন্তু আমি যখন সেই জিনিসগুলো আনার জন্য তার কাছে গেলাম, সে আমার সাথে এমন অভদ্র আচরণ করল যে, এর আগে আর কখনও তাকে এমনটি করতে দেখিনি। এমন কি সে আমার মুখে খালি বাসনপত্র এবং কয়েকটি রুটি ছুঁড়ে মারল। কোন প্রতিবাদ না করে চুপচাপ বেরিয়ে আসা ছাড়া আমার আর করার কিছুই ছিল না।

কয়েক ঘন্টা পর আমি মহল্লার প্রধান সড়কে পায়চারি করছিলাম। দেখলাম, আমার সেই বন্ধুটি যেন রক্তস্নাত। একজন পথচারী ধরে রেখেছে। হাসপাতালে নেয়ার জন্য একটি অ্যাম্বুলেন্সের প্রতীক্ষায় বসে আছে। তখনই আমার মনে হলো, এটা হচ্ছে মূর্খতা ও তারা যে

সর্বনাশা জীবন যাপন করে থাকে, তারই অনিবার্য পরিণতি।

আমি গ্রামে ফিরে এলাম। আমার সংগে তখন নিজের জন্য এবং পরিবারের অন্যদের জন্য নতুন কাপড়-চোপড়। তাছাড়া আমার সংগে তখন বেশ কয়েকটি টাকাও। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, আমার আব্বার ধারণার বিপরীত ফল ফলতে দেখা গেল। গ্রামে আমার পরিচিত লোকদের নিকট আমি সম্মানের পাত্রে পরিণত হলাম। এই মহৎ চিন্তা ও পরিকল্পনায় আমার কৃতকার্যতা দেখে আমার বন্ধুরা আমাকে ঈর্ষা করতে লাগলো। তাদের কারো কারো মাকে আমি প্রায়ই বলতে শুনতাম,

-আবদুদ দায়িমের ছেলে সুলায়মানকে দেখ। এমন নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকতে তোর লজ্জা করে না?

কিন্তু পরিবেশ আমার এ আনন্দ নিষ্কলুষ থাকতে দিল না। ঋণ পরিশোধে টালবাহানার অভিযোগ এনে মুরসে আবু আফার আমার আব্বার বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দিল। বিষয়টির ফলাফল ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। হয় আমার আব্বা দেনা পরিশোধ করবেন, না হয় আইনের ফয়সালা মাথা পেতে নিতে বাধ্য হবেন।

এবার আমার আব্বা গেলেন মুরসের কাছে। কারণ, বিষয়টির মূল নায়ক তো সেই সে পারে এর একটি রফা করতে। অন্যথায় বিচারের ছুরি তো আব্বার ঘাড়েই পড়বে।

আব্বা বললেন,

-মুরসে, তুমি জান এ পর্যন্ত আমি আমার অর্ধেক দেনা শোধ করেছি, আর এর বেশী এ বছর শোধ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

-আবদুদ দায়িম, আমার অপরাধটি কোথায়? প্রত্যেক মানুষই তার হক চাইতে পারে।

-এ ব্যাপারে আমি দ্বিমত করছিনে। আরও কিছু সময় দাও, এটাই আমি আশা করছি।

-আমি তা পারবো না আবদুদ দায়িম। আপনি জানেন এসবই মানুষের মালামাল, আমি নিজে এর এক কপর্দকেরও মালিক নই। আমাকে মাফ করবেন। আমি বাধ্য হয়েই এমনটি করেছি।

ক্ষুব্ধ হয়ে আব্বা বললেন,

-আমি তোমাকে হাজার বার বলেছি, এগুলো তোমার কি অন্যের মাল তা আমার

জানার দরকার নেই। তবে অবস্থাটি তোমার বুঝা উচিত। তুমি কি মানুষ নও?

–আবদুদ দায়িম, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। বিপদের সময় যে তোমাকে সাহায্য করেছে এ কি তার প্রতিদান?

–মুরসে, এ কেমন সাহায্য? তুমি আমার রক্ত চুষে চুষে জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছ। যা আমি ধার নিয়েছিলাম, তার সিকি পরিমাণ সূদ তুমি গ্রহণ করেছ। তুমি বড় নির্দয়।

–আপনি এখানে ঝগড়া করতে এসেছেন, না দেনা পরিশোধ করতে? আবদুদ দায়িম, এভাবে আমরা কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছতে পারবো না।

আমার আব্বা বুঝতে পারলেন তিনি একটু বেশী রেগে গেছেন। এমন পরিস্থিতিতেও শান্ত থাকার প্রয়োজন; কিন্তু তা তিনি ভুলে গেছেন। পক্ষান্তরে মুরসে বেশ শান্ত ও ধীরস্থীর। তাই ব্যাপারটি হালকা করার জন্য আব্বা বললেন,

–আসতাগফিরুল্লাহ, আউযুবিল্লাহ! মুরসে মনে কোন কষ্ট নিও না। তুমি আমার পাওনাদার।

– না, না, ও তেমন কিছু না। প্রকৃত অবস্থা যদি জানতেন, তাহলে হাজার বার আমাকে মাযুর মনে করতেন।

–মুরসে, আমার স্থানে তুমি হলে কি করতে?

–আবদুদ দায়িম, আমিও আপনার মত একজন। বিরাট এক পরিবারের খেয়ে–পরে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আমার কাঁধে। আপনি কি মনে করেন দায়িত্বের বোঝা কেবল আপনারই কাঁধে? একমাত্র আল্লাহ জানেন, আমি আপনার থেকেও অধিকতর হতভম্ব ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

হাঁ, আল্লাহ জানেন, মুরসে মিথ্যাবাদী। যুদ্ধের কালোবাজারে সে ফুলে–ফেঁপে উঠেছে। এখনও তার গুদামগুলো নানা রকম খাদ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ। তার ব্যাগটি টাকায় এমন ভরপুর যেন তা ফেটে যাবে। ভাল কয়েক একর জমির মালিকও সে হয়ে গেছে। কিন্তু আমার আব্বা মুরসের মিথ্যা ধারণা ও তার নাটকীয় ভঙ্গিমা সত্ত্বেও দেনা পরিশোধের সময়সীমা বৃদ্ধির ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন। দুঃখের বিষয়, তিনি মুরসের সাথে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলেন না। শেষমেশ তিনি বললেন,

–এখন তাহলে আমাকে কি করতে বল? একটি কথা বল।

–আমার কথা আপনার পছন্দ নাও হতে পারে।

–কি কথা? যা তোমার মনে আসে বলে ফেল। আমি আমার অন্তরের অন্তস্তল থেকে

তোমার উপদেশের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব।

মুরসে কিছুক্ষণ ইতস্তত করলো। তারপর আব্বার চেহারার দিকে একবার গভীরভাবে তাকিয়ে বলল,

–একটা পন্থা যতদিন আপনি অবলম্বন না করবেন, ততদিন আপনি দেনা শোধ করতে পারবেন না।

–সে পন্থাটি কি?

–আমার কাছে কি আপনি আধা একর জমি বিক্রি করতে পারেন?

এ কথাটি শোনার পর আমার আব্বার সারা দেহের শিরা–উপশিরাগুলো যেন অবশ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। তাঁর ইচ্ছা হলো, মুরসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। তিনি চিৎকার করে উঠলেন,

–হায় মুরসে, ওরে নরাধম। এই কি তোমার পরামর্শ? যদি আমি অপমানের ভয় না করতাম, তাহলে পরামর্শ কেমন হয়, তা তোমাকে শিখিয়ে ছাড়তাম। আমি আদালতের ভয় করছি। ওরে কমিনা ছোটলোক, জাহান্নামে যা।

বিষয়টি আমার আব্বা সহজভাবেই গ্রহণ করতেন যদি তা কোন একটি মহিষ, গাভী, আমাদের গরু–ছাগল রাখার জন্য যে অতিরিক্ত ঘরটি আছে, সেটি বা চাষবাসের কোন উপকরণাদি বিক্রির সাথে জড়িত হতো। কিন্তু আমার চাচার নিকট থেকে জমি ক্রয় করতে গিয়ে আমার আব্বাকে যে সীমাহীন কষ্ট ও বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়েছে, সেই জমি বিক্রির কথা স্বপ্নেও আমার আব্বা ভাবতে পারেন না। তাছাড়া বাপ–দাদার আমল থেকেই যে জমি তাঁর, সে জমি তিনি কিভাবে অপবিত্র করার জন্য মুরসের মত মানুষকে ছেড়ে দিতে পারেন? তাই মুরসের প্রস্তাবটি ছিল আমার আব্বার অনুভূতি ও আত্মসম্মানের উপর সরাসরি আঘাত। কারণ, তিনি সবকিছু হারাতে রাযী হলেও জমি ছাড়তে রাযী নন।

১০

আমি তানতায় চলে এলাম। এবার কিন্তু অন্য কারো সাথে থাকার পরিকল্পনা নিয়ে আসিনি। অতীতে আমার যে শিক্ষা হয়েছে তাই আমার জন্য যথেষ্ট। এবার আমার দাদীও আমার সাথে এসেছেন। তিনি আমার খাবার তৈরি করেন, কাপড়–চোপড় পরিষ্কার করেন, আমার সুখ–স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি সর্বক্ষণ দৃষ্টি রাখেন, আর আমি সামান্য একটু অসুস্থতা অনুভব

করলেই তিনি বিভিন্ন নবী–রসূল ও ওলীদের মাধ্যমে আমার জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকেন। আমার বড় সৌভাগ্য বলতে হয়, তিনি তানতায় কোন জাযযার ইবনুল জাযযারকে চেনেন না। নইলে তার দ্বারা আমার ঘাড়ের ভূত ছাড়িয়ে দিতে চেষ্টার ত্রুটি করতেন না। ফলে আমি আমার অন্তরে কিছুটা প্রশান্তি ও স্থিরতা অনুভব করলাম। আমার লেখাপড়া নিয়েই আমি অধিক ব্যস্ত থাকতাম। আর মাঝে–মধ্যে সিনেমা দেখতে যেতাম। কিন্তু আমার দাদী চাইতেন আমি যেন একটি যন্ত্র হয়ে যাই– যাতে আমার কাজে সামান্যতম ত্রুটি না হয়। আমার ছোট–বড় সব ধরনের কাজের তিনি হিসেব নিতেন। বাড়ী থেকে কিছুক্ষণ অনুপস্থিত থাকলে বা একটু দেরীতে বাড়ী ফিরলে তার জন্য আমাকে জবাবদিহি করতে হতো। তাঁর ধারণা মতে আমি অপব্যয় করে থাকি, কিন্তু কোথায় তা আমি করি, তা খুঁজে বের করা তাঁর দরকার। এমনকি আমার একমাত্র প্রিয় খেলা ফুটবল সেটাও তিনি মনে করতেন সময়ের অপচয় এবং ছোট ছেলেদেরই তা উপযোগী। একদিন আমি তাঁকে বললাম–দাদী, সুস্থ দেহেই তো সুস্থ বুদ্ধিমত্তা গড়ে ওঠে। আর শারীরিক ব্যায়াম দেহকে শক্তিশালী ও মনকে প্রফুল্লতা দান করে।

–ব্যায়াম? সুলায়মান, এই বাজে কথা ছেড়ে দাও। গোশতের একটি টুকরা অথবা এক বাটি মাখনের মত সুন্দর ও শক্তিশালী খাবার যদি তুমি খাও, তবে তাই বয়ে নিয়ে আসবে তোমার সব সুস্থতা।

–খাদ্য গুরুত্বপূর্ণ, একথা ঠিক, কিন্তু তাই বলে খাদ্যই সবকিছু এ কথা ঠিক নয়, দাদী!

–এসব বকবকানি ছেড়ে দিয়ে আমি যা বলি তাই শোন। তুমি কি আমাকে বুঝাতে চাও যে, নাচানাচি ও দৌড়ঝাঁপও শরীরকে শক্তিশালী করে? বেটা, আমার চুল পেকে গেছে। এসব জিনিস মানুষের আয়ু কমিয়ে দেয় এবং মানুষকে হাসির খোরাকে পরিণত করে।

আমি হেসে উঠে বললাম, দাদী, আপনার চিন্তাধারা বড্ড সেকেলে। আপনি খুব রক্ষণশীলা। একথা বলে আমি সোফা থেকে এক লাফে দাদীর বিছানায় গিয়ে পড়লাম এবং তাকে জড়িয়ে ধরে কিছু ব্যায়ামের অনুশীলন শুরু করলাম। তিনি ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরে বিদ্রোহী ও বুদ্ধিভ্রষ্ট এ প্রজন্মের– যারা এভাবে অবহেলায় শক্তিক্ষয় করছে– চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে লাগলেন। আমার এ কৌতুকে কিছুক্ষণ পর মনে হলো তিনি একটু ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তিনি আমার বেষ্টনী থেকে বেরোনোর চেষ্টা করতে করতে বললেন, এভাবে তুমি বিড়ালের মত হালকা–পাতলা হয়ে যাবে। সুস্বাস্থ্যের কোন চিহ্নই তোমার মধ্যে দেখা যাবে না– যত দিন না তুমি এসব বাজে কাজ থেকে বিরত হচ্ছো।

আমি তাকে খুশী করার উদ্দেশ্যে বললাম, দাদী খুব শিগগিরই আমি ব্যায়াম ছেড়ে

দিচ্ছি। আসুন আমার কাছ থেকে যাবেন না।

–না, আমি তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি যাতে তুমি একটু পড়ালেখা করতে পার। এ পড়ালেখায়ই তোমার কল্যাণ আসবে। সুলায়মান, পরীক্ষার সময় মানুষের সম্মান ও অসম্মান নির্ধারিত হয়ে যায়।

–আজ রাতে আমি পড়ালেখা করবই না।

বিস্ময়ের সুরে তিনি বললেন, কেন, আল্লাহ তোমার ঘাড়ের শয়তানটাকে দূর করুন! কি হয়েছে তোমার?

আমি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বললাম, দাদী শুনুন, আমি আপনার কাছে একটি অনুরোধ রাখবো। আমাকে কিন্তু নিরাশ করবেন না।

–বল, বল।

–আমার সংগে একটি সুন্দর ছবি দেখতে যাবেন?

–সিনেমা?

–হাঁ। দাদী, ছবিটি খুবই সুন্দর।

তিনি একটু হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, সুলায়মান, বেহায়া কোথাকার! তোমার মাথায় কি ঢুকেছে? তুমি কি ন্যাংটা মেয়ে লোকদের গান–বাজনা শুনতে যেতে চাও?

–তাতে কি হয়েছে? আমরা কি আনন্দ–ফূর্তি করব না?

–এ হচ্ছে ধ্বংসের সূচনা। শুনে রাখ, হাসি–তামাশার হলেও এমন কথা আমি দ্বিতীয় বার তোমার মুখ থেকে শুনতে চাইনে।

–দাদী, আমি সত্যি সত্যিই বলছি।

–চুপ কর, বেয়াদব, পাপাচারী কোথাকার!

–দাদী, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। এভাবে আপনি আমাকে বকাবকি করছেন? আমি এখন খাওয়া–দাওয়া সব ছেড়ে দিলাম। আর এখন থেকে আপনার সাথে আমার কথাবার্তাও বন্ধ।

কিছুক্ষণ পর দাদী আসলেন এবং আমার পাশে বসে বললেন, সুলায়মান, আমি তোমার জন্যে আজ রাতে সুন্দর খাবার তৈরি করেছি। গোশত, ভাত ও গোল আলু দিয়ে।

গোল আলুর প্রতি আমার যে একটা অতিরিক্ত টান আছে, তা আমার দাদী জানতেন। কিন্তু আমি তাঁর কথার কোন জবাব দিলাম না। ভাবটি যেন এই রকম যে, এখনও আমি তাঁর কথায় ক্ষুব্ধ হয়ে আছি। অতএব, আমাকে খুশি করার জন্য আমার মাথায় ও পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বলতে লাগলেন, প্রভু হে! তুমি তাকে হতাশায় কষ্ট দিও না, সুলায়মানের আশাকে ব্যর্থ কর না। হে আল্লাহ! তুমি তাকে দীর্ঘজীবী কর, তাকে একটি বড় চাকুরে

বানাও।

পরের দিন স্কুলে গিয়ে আমি দেখতে পেলাম ছাত্ররা রাজনৈতিক তর্কবিতর্কে লিপ্ত। স্কুল প্রাঙ্গণের কর্নারের একটি পিলারের পাশে আমার কতিপয় নেতৃস্থানীয় বন্ধু দাঁড়িয়ে। তারা যেন ঝগড়ায় লিপ্ত। তাদের একজন বলল, তারা আমাদের মিথ্যা বলেছে। তারা বলেছিল, যুদ্ধের পর তোমরা স্বাধীনতা লাভ করবে। আর এখন দেখা যাচ্ছে সেই একই অবস্থা বরং পূর্বের থেকেও দুরবস্থা।

অন্য একজন বলল, ভাই, ইংরেজ তার দীর্ঘ ইতিহাসে আমাদের কাছে মিথ্যা বলা আর অঙ্গীকার ভঙ্গ করা ছাড়া কিছুই করেনি। আমাদের সাথে তাদের এ খেল নতুন নয়।

তৃতীয় একজন বলল, জনগণের প্রকৃত মতামত ছাড়াই সিদকী পাশা যে দিন ক্ষমতায় আসে, সেদিনই আমাদের বুঝা উচিত ছিল এখানে ধোকাবাজির রাজনীতি চলছে এবং জাতির অগোচরেই চলছে তাদের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র।

–সত্যিই বলেছ। আমরা এখন দু'টি জ্বলন্ত অঙ্গারের মাঝখানে। না পারছি বলতে বিদেশে স্বায়ত্তশাসনের কথা, আর না সহ্য করতে পারছি ভেতরের রাজনৈতিক ও সামাজিক যুলুম–নিপীড়ন। আমাদের করণীয় কি, সে সম্পর্কে এখন আমরা দিশেহারা।

–এখন করণীয় হচ্ছে সিদকী ও রাজ–প্রাসাদ যা চেয়েছে তাই। উভয় পক্ষের প্রতিনিধিবৃন্দের যাতায়াত, আলোচনা ও বিশ্লেষণ। অতপর আবার নতুন করে প্রতিনিধিদের যাতায়াত, আলোচনা ও বিশ্লেষণ। এভাবে তারা আমাদের মাথার উপর চক্রাকারে ঘুরতে থাকবে।

–যে বিষয়টি আমার মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করে তা হচ্ছে, সিদকী পাশা নিজে জাতির মুখপাত্র সেজে বসেছে এবং জাতির নামেই সে বড় বড় জাতীয় সমস্যার কথা বলে থাকে। আমি জানিনে এ অধিকার তাকে কে দিয়েছে।

–অবশ্যই রাজা। কিন্তু কথা হচ্ছে, ব্যাপারটি কি এভাবে এই অপমানকর অবস্থাতেই চলতে থাকবে?

–আমাদের পঙ্গুরা ছাড়া আর কারও উপর এ অবস্থা চলতে পারে না। আজ থেকে ইংরেজের সাথে কোন প্রকার চুক্তি বা সন্ধি করা যাবে না। তাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক থাকার অর্থই হচ্ছে আমাদের ধ্বংস। সিদকী পাশাকে তার এ অপকর্ম চালিয়ে যেতে দেব না। তোমরা কি ইতিহাস পড় না? তোমরা কি ভুলে গেছ, এ সিদকীই শাসনতন্ত্র বাতিল করে দিয়ে জাতিকে এ বিপদ আর যন্ত্রণার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে? তা সত্ত্বেও সে তার

পার্টিকে জাতীয় পার্টি ও পত্রিকাটিকে জাতীয় পত্রিকা নামে আখ্যায়িত করেছে। না, আমরা কখ্খনো চুপ থাকবো না।

–সিদকীর পশ্চাতে আছে শক্তি। সে শক্তি প্রয়োগ করেই আমাদের চুপ করিয়ে দেবে।

–সমগ্র জাতি তার প্রতি দারুণভাবে ক্ষুব্ধ।

–রাজা এবং ইংরেজ তাকে রক্ষা করবে।

–এটা তো আমাদের কাছে নতুন কিছু নয়। তবে আমাদের দেশে আমরা তাদেরকে শান্তি ও নিরাপদে থাকতে দেব না। ফলে তারা বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণ করবে।

–এই শ্লোগান, গরম গরম বক্তৃতা ও তানৃতার রাজপথে মিছিল করে তোমরা কি করবে?

–আমাদের অন্তরের কথা এভাবে আমরা শাসকদের মুখের উপর ছুঁড়ে মারবো। তারা চাক বা না চাক, তাদের কর্ণের বদ্ধ দুয়ারে আঘাত হানতেই হবে।

এভাবে তাদের মধ্যে উত্তপ্ত আলোচনা চলছে। প্রত্যেকেই অপরের যুক্তিকে খন্ডনের চেষ্টা করছে। স্কুল প্রাঙ্গণে ছাত্রদের বিভিন্ন জটলায় যেমনটি হয়ে থাকে এ জটলাও ঠিক তেমনি। কিন্তু যেই না ঘন্টা বেজে উঠলো, অমনি হাততালি ও শ্লোগান শুরু হয়ে গেল এবং ধর্মঘটের নেতারা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেই ব্যালকনির দিকে যাবার জন্য ছাত্ররা প্রতিযোগিতা শুরু করে দিল।

কেউ একজন গলা ফাটিয়ে শ্লোগান দিতে লাগলো–আজ লেখাপড়া বন্ধ।

রক্ত দিয়ে ইংরেজ তাড়াও! সাম্রাজ্যবাদ ও তার লেজুড়দের পতন হোক! আলোচনার রাজনীতি শেষ হোক।

হৈচৈ ও চেঁচামেচি তুঙ্গে উঠলো। হাততালি ও বই–খাতায় হাত দিয়ে পিটানোর শব্দ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। একদল অন্য দলের সাথে মিলিত হচ্ছে। একজন নেতা গলা সপ্তমে চড়িয়ে তেজোদ্দীপ্ত বক্তৃতা করছেন। কথাগুলো যেন তার অন্তর ফেটে বের হচ্ছে, কপাল থেকে তার দরদর ঘাম ঝরে পড়ছে। তার মাথার চুল বিক্ষিপ্ত উস্কখুস্ক। একবার ডানে একবার বামে তিনি হাত ছুঁড়ছেন। তার কন্ঠ থেকে যেন আগুনের অঙ্গার গড়িয়ে পড়ছে, আর তাতে দগ্ধীভূত হযে শ্রোতারা উত্তেজিত হয়ে উঠছে।

কিছুক্ষণ পর স্কুলের বেঁটে সুপার তাঁর অভ্যাস মত ঠোঁটে মুসকি হাসি লাগিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে বিক্ষোভ, উত্তেজনা ও হাততালি বেড়ে গেল। তারপর সুপারকে কথা বলার সুযোগ দানের জন্য আস্তে আস্তে শোরগোল কমে গেল। সুপার বললেন,

–আমার সন্তান তুল্য ছাত্ররা। দেশপ্রেমিক ও ইংরেজ–বিদ্বেষী হিসেবে আমি তোমাদের থেকে কোন অংশে কম নই। কিন্তু.....।

এতটুকু বলার পর একজন ছাত্র হেঁড়ে গলায় চিৎকার দিয়ে উঠলো, দেশপ্রেমিক সুপার দীর্ঘজীবী হোন। অন্য ছাত্ররাও সেই সুরে সুর মিলিয়ে প্রতিধ্বনি করলো। সুপার হাত উঠিয়ে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, ধন্যবাদ। তারপর বলে চললেন, আমার সন্তানেরা, কিন্তু তোমরা জেনে রাখ, তোমাদের এ সময়ের ও এ স্থানের কর্তব্য হলো জ্ঞানার্জন। প্রথম জ্ঞানার্জন.....।

এতটুকু বলার পর একজন ছাত্র চেঁচিয়ে উঠলো 'পড়ালেখা আজ বন্ধ'।

সুপারের চোখে–মুখে রাগ ও ক্ষোভের চিহ্ন ফুটে উঠলো। তিনি নিজেকে সংযত করে নিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কে আজ পড়ালেখা বন্ধ ঘোষণা করেছে? এ তোমাদের ভুল ধারণা। আমরা অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকলে, যে কোন আহবানকারীর অনুসরণ করলে, হরতাল–বিক্ষোভে সন্তুষ্ট হলে এবং আমাদের রাজনৈতিক পরিবেশ–পরিস্থিতি ও সমস্যা সম্পর্কে আমাদের মূর্খতা পরিস্ফুট করে তোলে এমন সব অনর্থক কর্মে আমরা লিপ্ত হয়ে পড়লে সাম্রাজ্যবাদীদের অন্তর শীতল হয়ে যায়। তোমরা পড়ালেখা চালিয়ে যাও এবং তোমাদের সাধ্য অনুযায়ী জ্ঞানার্জন কর। আর এ অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমেই তোমরা সক্ষম হবে তোমাদের মাতৃভূমি থেকে বিদেশীদের তাড়িয়ে দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে। আর এ হৈচৈ ও চেঁচামেচিতে কোন ফল হয় না। এতে শুধু সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সুদৃঢ় হয় এবং সহায়ক হয় তাদের লক্ষ্যে পৌছার'। ছাত্রনেতা অত্যন্ত ক্ষোভ ও যেদের সাথে চেঁচিয়ে উঠলো,

–রক্তের মাধ্যমে মাতৃভূমি স্বাধীন হয়। আমাদের জীবন মিসরের জন্য উৎসর্গিত।

সুপার তাঁর কথায় বাধা দিয়ে বলে চললেন,

এ তোমাদের কাজ নয়। সম্পূর্ণভাবে এ কাজ জাতীয় নেতৃবৃন্দের। জীবনদানের প্রয়োজন যদি দেখা দেয়, তাহলে তাঁরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে তোমাদের কাছে আবেদন জানাবেন। তোমাদের ভালোর জন্যই আমি আবারো বলছি। আশা করি, তোমরা আমার কথা মেনে নিয়ে নিজ নিজ ক্লাসে ফিরে যাবে। আসসালামু আলাইকুম।

আমি একটু দূর থেকে এ দৃশ্য দেখছিলাম। আমার চাচার উপদেশগুলো তখন আমার মাথায় স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। কারণ, স্কুল–সুপার আজ যা বললেন, তার সাথে সেই উপদেশগুলো হুবহু মিলে যাচ্ছে। এ কারণে, সংগে সংগে ক্লাসে ফিরে যওয়াটাই আমি শ্রেয় মনে করলাম। যে স্বাভাবিক অনুভূতি আমার নিজের মধ্যে কাজ করছিল এবং আমাকে হৈচৈ ও রাজপথের মিছিলে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করে তুলছিল, তা আমি দমন করে ফেললাম। তবে ছাত্রদের মধ্যে নতুন করে উত্তেজনা ও বিক্ষোভ সৃষ্টি হলো। পরিণতি সম্পর্কে কোন প্রকার চিন্তাভাবনা ছাড়াই রাজপথে প্রকাশ্য বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য তারা

হয়ে উঠলো অনমনীয়। কারণ আবেগ মানুষকে অন্ধ করে দেয় এবং বিদ্রোহী ভাব মানুষকে এনে ছাড়ে রাস্তায়। এ বিদ্রোহী ও উত্তেজিতদের প্রথম সারিতে আমি সাঈদকে দেখতে পেলাম। যে সকল ছাত্র ক্লাসে যেতে চাচ্ছে, সে তাদেরকে বুঝিয়ে নিজেদের মতে আনার চেষ্টা করছে। যারা তার কথা না শুনছে, তাদেরকে সে বিশ্বাসঘাতক, কাপুরুষ ও শিশু বলে আখ্যায়িত করছে। ফলে ছাত্ররা দু'দলে বিভক্ত হয়ে গেল। একদল ক্লাসে যাওয়ার পক্ষে এবং তারা সংখ্যালঘু। অন্য দল বিক্ষোভ মিছিলের পক্ষে, তা সে যা কিছুই ঘটুক না কেন। কিন্তু প্রথম দলের ভূমিকা ছিল দ্বিতীয় দলের ভূমিকা অপেক্ষা অধিকতর দুর্বল। দ্বিতীয় দলের ছাত্ররা ছিল উন্মত্ত, উত্তেজিত। তারা স্কুলের জিনিসপত্র ভাংচুর শুরু করে দিল। আমি সাঈদকে দেখলাম রাগে-ক্ষোভে সে সিঁড়ির কাঠের রেলিংটি ধরে ঝাঁকাচ্ছে। তারপর স্কুলের ডেস্ক, ব্লাকবোর্ড ইত্যাদি এখান-ওখান থেকে টেনে-খিঁচে বের করতে লাগলো। আমি একটু এগিয়ে তার পেছনে গেলাম এবং তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করলাম। বললাম,

-সাঈদ, তুমি কি পাগল হয়েছ? এ ভাংচুর করে লাভ কি? ক্ষয়ক্ষতি ছাড়া তো আর কিচুই হবে না।

রাগের সাথে আমার দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে সে বলল,

-তাতে তোমার কি? তোমার মত কচি খোকাদের সাথে তুমি ক্লাসে যাও। আমাদের যা ইচ্ছা তাই আমরা করবো।

বুঝলাম, সে এখন অত্যন্ত উত্তেজিত। তার সাথে বুঝাপড়ার কোন উপায় এখন নেই। আমি তার থেকে একটু দূরে সরে এসে তার পাগলামিপূর্ণ কাজ-কর্ম দেখতে লাগলাম।

আমাদের অন্য এক সঙ্গী তাকে থামাতে চেষ্টা করলো। কিন্তু সাঈদ কাঠের একটা ডান্ডা উঁচিয়ে তার পিছে করলো আঘাত। যদি সেই সঙ্গীটি সংগে সংগে নিচু হয়ে দূরে ছিটকে না পড়তো, তাহলে ভীষণভাবে আহত হতো।

ঘটনা খুব দ্রুত কল্পনাতীত গতিতে অগ্রসর হলো। বিক্ষোভকারীরা সলাপরামর্শ করলো। তারা ভীরু, কাপুরুষ- যারা ক্লাসে যেতে চায়, তাদেরকে ভালো মত ধোলাই দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল। আমিও সেদিন দু' একটা চড়-থাপ্পড় থেকে রেহাই পাইনি। এ উত্তেজিত অবাধ্যদের পুরোভাগে সাঈদও ছিল। যদিও সে আমার ওপর কোন প্রকার বাড়াবাড়ি করেনি, তবে যাদের সাথে তার পরিচয় বা বন্ধুত্ব নেই, তাদেরকে সে ছাড়েনি। অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়ায় স্কুল-সুপার সেদিন স্কুল ছুটি দিয়ে দেন এবং সবক'টি দরজা খুলে দিয়ে আমাদেরকে বের হওয়ার নির্দেশ দেন। স্রোতের মত ছাত্ররা বেরিয়ে পড়লো এবং জোরে জোরে শ্লোগান দিতে লাগলো। স্কুল থেকে আমরা সামান্য দূরে যেতে না যেতেই কয়েকটি পুলিশের গাড়ী দেখা গেল এবং সংগে সংগে মাথায় লোহার হেলমেট

পরিহিত সৈনিকরা নেমে পড়লো।

বিক্ষোভকারী নেতৃবৃন্দের সাথে তারা একটা সমঝোতায় আসার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। ছাত্ররা মনে করলো এটা হতে পারে না। কারণ, পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রণে, পুলিশের নয়। মুহূর্তের মধ্যে আমরা চারিদিকে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লাম। অবিরামভাবে পুলিশের লাঠি পড়তে লাগলো আমাদের পিঠে। আমাদের কিছু ছাত্রকে তারা গ্রেফতার করতে সক্ষম হলো এবং গ্রেফতারকৃতদের তারা তাদের গাড়ীতে নিয়ে ভরলো। এই নিরাপত্তামূলক আটককৃতদের মধ্যে সাঈদও ছিল।

আমি ঘামভিজা অবস্থায় হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ীর দিকে দৌড়াচ্ছিলাম আর এই সংকটপূর্ণ দিনটিতে কি কি হারালাম মনে মনে তার একটা হিসেব করছিলাম। যে জিনিসটি আমাকে সম্পূর্ণ তাক লাগিয়ে দিয়েছিল, তা হলো সাঈদের ব্যাপারটি। সে ছিল এক ধ্বংসাত্মক বিপ্লবী। বড় নিষ্ঠুর ও নির্দয়ভাবে সে সবকিছু ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলছিল। সে যা কিছু করছিল, তাতে তার দৃঢ় আস্থা ও আত্মপ্রত্যয়ের ভাব ফুটে উঠছিল। সে তার কাজের মধ্যে যেন সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গিয়েছিল। ডেস্ক, চেয়ার, টেবিল, জানালা–দরজা যা কিছু সে ভাংচুর করছিল, তা যেন কাষ্ঠের নির্মিত নয়, বরং সেগুলো যেন কোন ইংরেজ সৈনিক।

সাঈদ কি তার এ কাজের মাধ্যমে তার দাদা বা তার হারিয়ে যাওয়া ছোট বোন বাসীমার প্রতিশোধ নিচ্ছিল? নাকি যুদ্ধের প্রতি অথবা যুদ্ধের কারণে তার আব্বা যে দুঃখ–যন্ত্রণার শিকার হয়েছেন, তার প্রতি সে ক্ষোভ প্রকাশ করছিল?

সাঈদ ছিল একটা অত্যাচারিত পরিবেশের সশব্দ অভিব্যক্তি। আমি মনে করতাম, সে তার আব্বারই একটা যথার্থ অংশ– যিনি তাঁর সারাটি জীবন কাটিয়েছেন রাজনীতি চর্চা করে। এমনকি এখনো পর্যন্ত তাঁর সব কথার বিষয়বস্তু হচ্ছে রাজনীতি। আমার বিশ্বাস, সে তার বিতাড়িত বিদ্রোহী সামরিক অফিসার দাদারই প্রতিচ্ছবি এবং এ বিক্ষোভ ইংরেজদের বিরুদ্ধে পরিচালিত তার দাদার অসংখ্য যুদ্ধেরই একটি যুদ্ধ যেন।

এখন করণীয় কি? সাঈদের জন্য কোন কিছু করতে তো আমি সক্ষম নই। তবে আজকের দিনের মত তার জন্য কিছু কাবার ও জিনিসপত্র আমি পাঠাতে পারি। তারপর খুব তাড়াতাড়ি কুরাশিয়া গিয়ে তার আব্বাকে সংবাদটি পৌছাতে পারি।

আমি কুরাশিয়ায় শায়খ হাফেজের বাড়ীতে পৌছলাম। বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তিনি আমার দিকে তাকালেন। আমার সংগে সাঈদ নেই, এ কারণে তাঁর অন্তরে একটা আশঙ্কা ও ভীতির

চমক খেলে গেছে।

–সুলায়মান! সাঈদ কোথায়? কোন কিছু ঘটেছে কি?

কথাগুলো বলতে বলতে তিনি গভীর আবেগ ও উৎকণ্ঠায় কেঁদে ফেলার উপক্রম করলেন। আর তাঁর চোখে–মুখেও এর প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। আমি বললাম,

–শান্ত হোন। এত উদ্বিগ্ন হওয়ার মত তেমন কিছু ঘটেনি।

আমার এ কথায় তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। তিনি এতই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন যে, আমাকে ভেতরে গিয়ে বসার কথা বলতেও ভুলে গেলেন। তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার কথা শেষ করার এবং বিষয়টির বিবরণ শুনার অপেক্ষা করতে লাগলেন। কে জানে? হয়তো বাসীমার পরিণতির কথা তাঁর নতুন করে স্মরণ হয়েছিল এবং একটা অশুভ চিন্তা তার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। খুব দ্রুত তিনি প্রশ্ন করলেন,

–শুনলাম, আজ তানতার স্কুলগুলো ও জামে আহমাদীর ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। সাঈদের কোন দুঃসংবাদ আছে কি?

শায়খ হাফেজকে আমি ঘটনা খুলে বললাম। প্রথমত তাঁর চেহারায় একটা দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠলো। কিন্তু আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, একটু পরেই শায়খ হাফেজের অন্তর দুয়ার খুলে গেল। একটা আনন্দ ও গর্বের অনুভূতিতে তিনি যে তখন হাবুডুবু খাচ্ছিলেন, তা আমার দৃষ্টি এড়ালো না। সাঈদ এখন তার আব্বার দৃষ্টিতে একজন দেশপ্রেমিক ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে। আর এটা গর্বের বিষয় যে, সে গ্রেফতার হয়েছে এবং দেশের খাতিরে ও ইংরেজদের অবৈধ শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের কারণে তাকে নিরাপত্তামূলক আটক করা হয়েছে। ভাগ্য শায়খ হাফেজকে বঞ্চিত করেছে ইংরেজদের নিকট থেকে প্রতিশোধ নেয়া থেকে যেমন ইতিপূর্বে তাঁর আব্বাকে বঞ্চিত করেছে বিজয়ের সুফল থেকে। সম্ভবত যা তাঁরা পারেননি, তাই বাস্তবায়িত হতে চলেছে তাঁর ছেলে সাঈদের হাতে। হিটলার! যে হিটলারের ওপর ছিল তাঁর অগাধ বিশ্বাস। একমাত্র সে–ই পারত এসব গুন্ডা ও নির্বোধদের ঠ্যাংগায়ে সোজা করতে। কালের প্রবাহে সেও ভেসে গেছে। জার্মানীর বিভিন্ন অঞ্চলের বিরান ধ্বংসস্তূপের মধ্যে তার কিছু বিষাদময় স্মৃতি ছাড়া এখন আর কিছুই নেই।

সেই দিনই যখন আমরা তান্তার দিকে যাচ্ছি, পথিমধ্যে শায়খ হাফেজ আমাকে বললেন–এ কিছুই না। খুবই সামান্য ব্যাপার। জেলা সদরে বহু অফিসার ও কর্মচারীর সংগে আমার হৃদ্যতা আছে। তাদের অনেকের আবার জেলা প্রশাসকের সাথে খুবই জানাশোনা। আমি আশা করি খুব শিগ্‌গিরই সাঈদ ছাড়া পাবে–ইন্‌শাআল্লাহ।

আমার ধারণা ছিল শায়খ হাফেজ আমার ভূমিকার প্রশংসা করবেন। কারণ, এ

হট্টগোল থেকে আমি দূরে ছিলাম, ছাত্রদের বিক্ষোভে আমি যোগ দিইনি এবং এমন একটা বিপদ থেকে আমি সহীহ–সালামতে আছি। কিন্তু বুঝা গেল আমার এসব কাজের প্রতি শায়খ হাফেজ কোন ভ্রূক্ষেপ করলেন না। বাহবা প্রশংসাসূচক একটি বাক্যও তাঁর মুখ থেকে বের হলো না। ফলে আমার ভূমিকার যথার্থতা সম্পর্কে আমি সন্দিহান হয়ে পড়লাম। এখন ছাত্রদের সেই 'ভীরু–কাপুরুষেরা ধ্বংস হোক' শ্লোগানটি স্মরণ করে লজ্জায় আমার দু'কান লাল হয়ে উঠলো, শরীর থেকে দরদর করে ঘাম ঝরে পড়তে লাগলো এবং অত্যন্ত ক্লান্তি অনুভব করতে লাগলাম। কিন্তু সুপারের যুক্তিপূর্ণ কথা ও আমার চাচার উপদেশসমূহ আমার অন্তরে অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল। এখন তা আমাকে সান্ত্বনা দিল এবং আমার আজকের ভূমিকা ও আচরণের যথার্থতা সম্পর্কে আমার হারিয়ে যাওয়া বিশ্বাস ও আস্থা পুনরায় ফিরিয়ে আনলো। অতপর আমাদের সেই অতি সাধারণ বাসায় যখন আমরা পৌঁছলাম, আমি শায়খ হাফেজকে বললাম, ভাঙ্চুর থেকে সাঈদকে বিরত রাখার জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। কিন্তু সে আমার ওপর ক্ষেপে যায়।

আমার দাদী এ কথা বলতে বলতে বের হয়ে এলেন–'তুমি বা সে, তোমরা সবাই এক একটা আস্ত শয়তান।' তারপর শায়খ হাফেজের দিকে ফিরে বললেন,

–তোমার ছেলের সুশিক্ষার প্রতি তোমার কঠোর হওয়া দরকার। এ সব নির্বোধ ছেলে কিসে তাদের কল্যাণ, কিসে অকল্যাণ, তা বাছ–বিচার করতে পারে না। তারা নানা রকম অঘটন ঘটিয়ে গোটা পরিবারকে সমস্যায় ফেলে তাদের ওপর মুসীবত ডেকে আনে।

শায়খ হাফেজ মৃদু হেসে আমার দাদীর আন্তরিক উপদেশের প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করে বললেন– ইনশাআল্লাহ, খুব শিগগিরই সব ঠিক হয়ে যাবে।

পরদিন আমি স্কুলে গেলাম। গতকালের ছবিটি তখনও আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। এখানে–সেখানে ভাঙাচোরা কাঠ, কাগজপত্র ইত্যাদি ছড়ানো–ছিটানো ছিল। আমার এক সহপাঠীকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি মনে কর আজ ক্লাস হবে? বিস্মিত হয়ে সে বলল, ক্লাস? আমাদের বন্ধুরা সব হাজতে, আর আমরা ক্লাস করবো?

–তাদের জন্য আমরা কি করতে পারি?

–শিগ্‌গিরই তাদের স্কুলে ফিরিয়ে আনার দাবী করাই এ মুহূর্তে আমাদের কর্তব্য। তারা তো চুরি করেনি, তারা কোন লোককে হত্যাও করেনি যে, তাদের সাথে এমন ব্যবহার করা হবে।

–তারা কি পড়ালেখায় বাধাদান, জিনিসপত্র তছনছ এবং সহপাঠীদের মারধর করেনি? এটা কি দেশপ্রেম, না পাগলামি?

–এসব ছাড়। এ রকম অনেক কিছুই হয়ে থাকে। প্রতিটি বিক্ষোভের সময় কিছু না কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েই থাকে। এখন আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার বিষয় হচ্ছে পুলিশ হিফাযতে এই সব নির্দোষ ছাত্র।

–তাদেরকে নির্দোষ বলো না। তারা সব উচ্ছৃংখল মাস্তান। তারা কি আজকের গৌরবময় দিনটির মর্যাদা বিনষ্ট করেনি? বিক্ষোভকে একই স্কুলের ছাত্রদের বিভেদে রূপান্তরিত করেনি? এটা কি কোন বুদ্ধিমত্তার কাজ?

–সুলায়মান, এমন নিষ্ঠুর হয়ো না। তারা তোমার ভাই। তারা তাদের স্বাধীনতার জন্যই এমন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। কিছু বাড়াবাড়ি ও ভুল–ভ্রান্তি হলেও তাদের ক্ষমা করা উচিত।

–বন্ধু, সিনেমা হলটিও গতকাল তারা তছনছ করেছে।

–কে বলল?

–আমি নিজ চোখেই দেখেছি, বিক্ষোভের পর দুপুরের শো চলার সময় তারা সেদিকে ছুটেছে।

আমাদের কথা বন্ধ হয়ে গেল। গতকালের বিক্ষোভের স্থান থেকে ভেসে আসা কিছু শ্লোগানের কারণে।

–'ছাত্ররা ছাড়া স্কুল চলতে পারে না', 'স্বাধীনতার সৈনিকদের মুক্তি দাও', 'আমাদের দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট চলবে', 'যুলুম ও উপনিবেশবাদ ধ্বংস হোক'। অসংখ্য ছাত্রের কণ্ঠে এ শ্লোগানগুলো প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

এ দিনই এক সপ্তাহ স্কুল বন্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। কে কতখানি বিপজ্জনক, তা বিচার করে সকল ছাত্রকে তিন ভাগে ভাগ করে তাদের নামের তালিকা তৈরি করা হলো। যেসব অধিক বিপজ্জনক ছাত্রকে কমপক্ষে দু'সপ্তাহের জন্য স্কুল প্রাঙ্গণে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হলো স্বাভাবিকভাবেই সাঈদের নামটি সেই তালিকায় পড়লো। আর আমার আচরণে যেহেতু কোন অপরাধ ধরা পড়লো না, তাই প্রবেশাধিকারপ্রাপ্ত ছাত্রদের নামের তালিকায় আমার নামটি শোভা পেল।

সাঈদের কিছু পড়া ছুটে গেল। জ্ঞানার্জনের কিছু সুযোগ থেকে সে বঞ্চিত হলো। তা সত্ত্বেও সে আমার দৃষ্টিতে অনেক বড় বলে মনে হলো। পূর্বের থেকে সে আমার নিকট অধিকতর সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হলো। সে তার হাজতে আটককালীন অবস্থার অভিনব কাহিনীগুলো আমাকে শুনাতো। আমার কিছুটা ঈর্ষা হতো এই বলে যে, আল্লাহ্

আমাকে এমন সুযোগ থেকে বঞ্চিত করলেন। মনে মনে আমি নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম এই বলে, কি হয়েছে? দেশপ্রেমের নামে আমিও কি এমন বিশৃংখলায় অংশ নেব? আমার পরিবারকে কি বিপদ-আপদ থেকে বাঁচানো আমার কর্তব্য নয়?

এ ধরনের মিশ্র পরস্পরবিরোধী অনুভূতি আমার মধ্যে দেখা দেয়া আশ্চর্যের কিছু নয়। বিপর্যস্ত অবস্থার কারণে বিক্ষোভ, প্রতিশোধস্পৃহায় মানুষের অন্তর তখন ভরপুর। তাছাড়া আমাদের প্রাণচঞ্চল নওজওয়ানী এবং আমাদের অধিকতর স্বচ্ছন্দ জীবনের বাসনাও ছিল ক্রিয়াশীল। কিন্তু সঠিক পথ ও পদ্ধতি আমাদের জানা ছিল না। কারণ, দীর্ঘদিনের দাসত্ব ও ভেতর-বাইরের কূট-কৌশলে আমাদের পথচিহ্ন মুছে যায় এবং আমাদের চিন্তা জগতে দেখা দেয় বিভ্রান্তি। ফলে, আমরা বিভেদে লিপ্ত হয়ে একজন অন্যজন থেকে দূরে সরে যাই। স্কুল ও রাজপথে সেদিন যা কিছু ঘটে, তা হচ্ছে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এ অধ্যায়ের এক বাস্তব প্রকাশ।

১১

একথা কি ঠিক, অন্ধকার ও অনিদ্রা মানুষের কল্পনাকে আকার দান করে এবং স্বপ্নকে বড় করে দেখায়। তারপর সে বেঁচে থাকে। একটা মিথ্যা ও ধোকার আবহ সৃষ্টি হয় এবং তার মধ্যেই সে হারিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু যখন বাস্তবের সাথে সংঘাত সৃষ্টি হয়, ব্যথা ও হতাশা অনুভব করতে থাকে এবং চোখ থেকে তার অঝোরে পানি গড়িয়ে পড়ে, সে রাতে যা ঘটেছিল তা কি এ জিনিসেরই বাস্তব উদাহরণ? প্রতিরাতের অভ্যাস মত আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বাসীমাকে ঘুমের ঘোরে দেখার উদ্দেশ্যে। হায় আফসোস! বাসীমার সব কিছু বদলে গেছে। সে একটু লম্বা ও মুটিয়ে গেছে। বুকটা একটু উঁচু ও ঘাড়টা ফুলে গেছে। সে উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটছে। চারপাশের সবকিছু, এমন কি আমার প্রতিও সে একেবারেই উদাসীন। আমি কথা বলে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলাম, কিন্তু সে ফিরেও তাকালো না। আমি তার সাথে কথা বলছিলাম আমার অন্তরের অন্তস্তল থেকে। আমি তার কাছে ব্যক্ত করছিলাম আমার সুপ্ত আবেগ ও অনুভূতি। কিন্তু সে আমার দিকে একবারও দৃষ্টিপাত করলো না। আমার অন্তরকে জিজ্ঞেস করলাম, তার কি হয়েছে? দীর্ঘ সময়ের কারণে সে কি আমাকে ভুলে গেছে, নাকি অন্য কাকেও ভালোবেসে ফেলেছে? এ প্রশ্নটিই আমার মনে উদয় হলো এবং আমার সমগ্র অস্তিত্বে তা প্রতিধ্বনিত

হয়ে ফিরলো। একটা দুঃখ, পরাজয় ও অবমাননার অনুভূতি আমাকে পীড়া দিতে লাগলো। পুনরায় তার পিছু পিছু ছুটলাম। অনুনয়-বিনয় করলাম, তাকে তিরস্কার করলাম এবং কান্নাকাটি করলাম। আমার মনে হলো এবার সে আমার দিকে ফিরলো। এর মধ্যে আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। এতটুকু ছাড়া স্বপ্নের শেষাংশের আর কিছু আমার মনে নেই। সেখানে ছিল আরও মানুষ, ঘটনাবলী ও বাড়ী-ঘর। তার কিছুই এখন আর আমার স্মৃতিতে নেই। সবই ভাসাভাসা, অস্পষ্ট।

ঘুম ভাঙ্গার পর চোখ মেলে তাকালাম। দেখলাম ঘন গাঢ় অন্ধকার, নিস্তব্ধ প্রকৃতি। স্বপ্নের মধ্যে যা দেখেছিলাম, আবার তা ভাবতে লাগলাম। আমরা ছিলাম ছোটবেলার খেলার সাথী। বাসীমার সাথে অতীতের সম্পর্কের সাথে আমার বর্তমানকে মিলিয়ে দেখতে লাগলাম। তার প্রতি ভালোবাসা ও আবেগের প্লাবনে আমি যেন ডুবে গেলাম। কি আশ্চর্য। এভাবে তার স্মৃতি আমাকে উত্তেজিত করে তুলেছে এবং আবোল-তাবোল স্বপ্ন ও ঘুমের মধ্যে ভয়ভীতি দেখিয়ে আমাকে নিয়ে খেলছে! আমার কাছে বাসীমা শেষ। চিরদিনের জন্য সে পাতা বন্ধ করে দিয়েছি। বন্ধ করেছি সে তো আজ তিন বছর হতে চলল। তাহলে আজ আবার কেন চিত্তচাঞ্চল্য এবং তার ভালোবাসার টান? হুঁ, এটা আজ অসম্ভব, মরীচিকার পেছনে ছুটা। তানতার রাস্তাঘাট, অলিগলি বাসীমার চেয়েও অসংখ্য সুন্দরী নারীতে পরিপূর্ণ। বাসীমা থেকেও তারা কয়েকগুণ বেশী মনোরম। এদের কেউ কি সেই হারিয়ে যাওয়া বিক্ষিপ্ত স্মৃতি ভুলিয়ে দিয়ে আমার হৃদয়ে প্রশান্তির বন্যা বইয়ে দিতে পারবে না?

আমার কৈশোর ও দুর্ভাগ্যের সুযোগ নিয়ে অন্ধকার তার ভূমিকা যথারীতি পালন করে চললো। আবার স্মরণ করতে লাগলাম বাসীমার ইসকান্দারিয়া যাওয়ার রাতটির কথা। যে রাতে সে আমাকে বলেছিল এককূলওয়ালা সাগরের কথা, তাতে সাঁতার কাটা উলঙ্গ, নির্লজ্জ মেয়েদের কথা, বড় বড় দালান-কোঠা, অগণিত গাড়ী-ঘোড়া এবং যেখানে-সেখানে টাঙ্গানো ফল ও মিষ্টি-মিঠায়ের কথা। তারপর আমার ঘাড়ের শয়তানটি দ্রুত অন্য একটি ছবি আমার সামনে হাযির করলো। তা হলো ইসকান্দারিয়ায় জার্মানদের এক ভয়াবহ ধ্বংসের ছবি। মৃত্যুর ভয়ে এবং বাঁচার আশায় মানুষ দিকবিদিক ছুটাছুটি করছে। ছোট্ট মেয়ে বাসীমা হতভম্ব, কম্পিত। আদর করার জন্য মা ও আশ্রয় দেয়ার জন্য বাবাও তার কাছে নেই। সে একটি আশ্রয়স্থলের দিকে দৌড়াচ্ছে। দু'চোখে তার অশ্রুর বন্যা। আশ্রয়স্থলে পৌছার পূর্বেই অকস্মাৎ আকাশ থেকে বোমা পড়লো। সে যেন বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার দিয়ে উঠলো। সে যেন পলায়নপর এক ব্যক্তির জামা টেনে ধরে তার কাছে আশ্রয় নেবার চেষ্টা করলো। কিন্তু সে তাকে ধাক্কা দিয়ে দূরে ফেলে দিল। তারপর.....? তারপর সে মারাত্মক রকম যখম হলো। ধড় থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তার সেই সুন্দর দেহ

থেকে হাতটি এক স্থানে এবং তার ছোট্ট সরু একটি পা অন্য এক স্থানে ছিটকে পড়লো। এ রকম একটি ভয়াবহ চিত্র আমার কল্পনায় ভেসে উঠলো। আমার অজ্ঞাতেই আমার দু'গন্ডে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। আমি সম্বিত ফিরে পেতেই তা মোছার জন্য হাত বাড়ালাম। আবেগে তখন আমার শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ, বুক ফুলে ওঠার উপক্রম। এমন সময় আমি টের পেলাম, আমার দাদী আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আমার মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন।

-বেটা, আল্লাহ তোমার ভাল করুন। কি, তুমি কাঁদছো? সুলায়মান ওঠো। বেটা, তুমি কি অসুস্থ হয়ে পড়েছ?

ঘটনার আকস্মিকতায় আমি একটু কেঁপে উঠলাম। তাড়াতাড়ি খাট থেকে উঠে দাড়িয়ে তাঁকে বললাম, ও কিছু না। আমার ভীষণ পিপাসা লেগেছে। আমি একটু পানি খেতে চাই।

-তাহলে তুমি কাঁদছো কেন?

-আমি তা জানিনে। সম্ভবত কোন ভয়ের স্বপ্ন দেখছিলাম।

-বেটা, ইনশাআল্লাহ তুমি ভালোই আছ। স্বপ্নে কান্নাকাটি একটা ভালো লক্ষণ।

-ইনশাআল্লাহ, সবই ভালো।

স্বভাবতই সেদিনের বাকী রাতটুকু আমি আর ঘুমুতে পারিনি। আর বাসীমার ছবিটিও এক মুহূর্তের জন্যও আমার কল্পনা থেকে দূর হয়ে যায়নি। অর্থাৎ ভরা যৌবন, নাদুসনুদুস চেহারা ও উদাসী স্বপ্নমাখা দু'টি চোখের অধিকারিণী নতুন বাসীমা। আমি আমার অন্তর থেকে দূর করার চেষ্টা করলাম সেই মারাত্মক ধ্বংসের ছবিটি, যে ধ্বংস সমগ্র ইসকান্দারিয়াকে প্রকম্পিত করে তুলেছিল এবং ধ্বংসস্তূপের তলে ও রাস্তায় নিক্ষেপ করেছিল অসংখ্য মানুষের লাশ।

নতুন করে এ দুঃখজনক ছবিটি আমার মানসপটে ভেসে উঠায় আমি বড় অস্থির হয়ে পড়লাম। মনে মনে বললাম, আর কত? এমন একটা বাজে চিন্তার কি কোন শেষ নেই?

অবশেষে খাট থেকে লাফ দিয়ে নেমে আমি বাথরুমের দিকে দৌড় দিলাম। এদিকে আমার দাদী 'আমার কি হয়েছে, এমন অনিদ্রার কারণ কি' ইত্যাকার প্রশ্ন করে তখনও আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছেন। আমি তাঁকে শুধু ভরসা দিচ্ছিলাম, আমি সম্পূর্ণ ভালো। তিনি আমার কাছে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন এবং সতর্কতামূলকভাবে তাঁর অভ্যাসমত কিছু দোয়া-দুরূদ পাঠ করলেন। যারা আমার প্রতি নজর দেয়ার সময় নবীর ওপর দুরূদ পাঠ করেনি, তাদের কুদৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য আল্লাহ ও তাঁর নবীগণের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। বারবার তিনি তাঁর শুকনো ও দুর্বল হাতখানি আমার সারা শরীরে বুলিয়ে দিলেন। এ রকম পরিস্থিতিতে তিনি কেন অধিক সতর্কতা অবলম্বন করেননি এবং কিছু

ফিটকিরি ও এ্যামুনিয়া বৃক্ষের রস সংরক্ষণ করেননি সেজন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলেন। তাঁর কাছে এ দু'টি জিনিস হলো সব রোগের দাওয়াই এবং হলুদ চোখওয়ালাদের সব হিংসার প্রতিষেধক।

সকাল বেলায় মন্দা ক্ষুধা নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি নাশতা সেরে স্কুলে গেলাম। গত রাতের দুঃখ ও অস্থিরতার কারণে আজকের গোটা দিনটি এমনকি স্কুলের সময়টুকু ছিল আমার জন্য বেদনাদায়ক। কিন্তু এ ব্যাপারের কিছুটা উপশম হলো সাঈদের সাথে দেখা হওয়ার পর।

সাঈদের প্রতি আমার ভালোবাসা আরও বেড়ে গেল। সাঈদের বোন বাসীমা ও তার মধ্যে অনেক মিল ছিল তার হাসি, রাগ, তাকানো, নিষ্ঠা ও সরলতা সব কিছুতেই। তার সাথে দেখা হলে, কথা বলার সময় অথবা কোন বিষয়ে আলোচনার সময় সে যে অস্পষ্ট ইশারা–ইঙ্গিত করতো, তার সব কিছুতেই দুই ভাই–বোনের মধ্যে মিল ছিল। সাঈদ ও আমি দু'জন ভিন্ন দুই সেকশনের ছাত্র ছিলাম। এ কারণে একমাত্র ক্লাসের সময় ছাড়া স্কুলে থাকাকালীন আমি তার পিছু ছাড়তাম না। এমন কি দু'ঘন্টার মাঝখানে বিরতির পাঁচ মিনিটের সুযোগও আমি হারাতাম না। খুব দ্রুত তার কাছে চলে যেতাম। প্রত্যেক দিন তাকে গাড়ী পর্যন্ত এগিয়ে দিতাম। তার থেকে বিচ্ছিন্ন হলেই আমার মনে হতো যেন সব কিছু আমি হারিয়ে ফেলেছি। শারীরিক অসুস্থতা বা অন্য কোন আকস্মিক কারণে একদিন সে স্কুলে না এলে আমার নিজেকে একাকী ও অসহায় বলে মনে হতো। আমি অনুভব করতাম অতীতে আমাদের এক জায়গায় বসবাসের কারণে আমাদের মাঝে গড়ে ওঠা সম্পর্ক এবং স্কুলের এ নতুন সম্পর্কের চেয়েও কোন একটা বিশেষ আকর্ষণ আমাদের দু'জনের মাঝে রয়েছে। আর আমার সম্পর্কে তার অনুভূতি বেশী না হলেও আমার মতই ছিল। রাজনৈতিক পথ ও পন্থা সম্পর্কে আমাদের মতপার্থক্য, বিক্ষোভে আমার সাড়া না দেয়া, তাছাড়া ছোটখাট বিষয়ে আমাদের দু'জনের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা সত্ত্বেও আমাদের সেই গভীর বন্ধুত্ব আমাদের পারস্পরিক যোগসূত্র অটুট রেখেছিল এবং এই বন্ধুত্ব আমাদের ছোটখাট ভুল–ত্রুটিকে ধুয়ে–মুছে পরিষ্কার করে দিচ্ছিল।

শিক্ষাবর্ষ শেষ হওয়ার পূর্বেই আমার চাচার একটি চিঠি পেলাম। চিঠিটি পেয়ে আমি দারুণ খুশি হলাম।

তিনি লিখেছেন,

'সুলায়মান, যারা কায়রোতে থাকে এবং কঠোর শ্রমের মধ্য দিয়ে দিনগুলো অতিবাহিত করে, তারা কোন একটি জিনিসের ভীষণ অভাব বোধ করে। সেই অভাব ও শূন্যতা পূরণের অনেক কিছুই এখানে থাকা সত্ত্বেও স্রেফ বস্তুবাদী জীবন তাদের অন্তরে বহু ব্যথা ও বেদনার জন্ম দিয়ে থাকে।

তুমি হয়তো কাজে যাবে এবং সেখানে থেকে নিজের আবাসস্থলে ফিরে আসবে। তখন তুমি বড্ড ক্লান্ত, একটু আরাম, একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। তুমি হয়তো অবসন্ন দেহে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়বে, কোন বন্ধুর বাড়ীতে বেড়াতে যাবে, অথবা কোন বই পড়বে, কিন্তু তাতে তোমার সব চাহিদা পূরণ হবে না। এ কারণে আমিও এমন কারো অভাব অনুভব করছিলাম, যার নিকট আমি আমার অন্তরের খোরাক ও প্রশান্তি পেতে পারি। আমি এমন এক মানুষের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভব করছিলাম, যে আমার সাথে হবে গভীরভাবে সম্পৃক্ত, আমার সকল সমস্যা সম্পর্কে অতি মনোযোগী এবং আমার আশা ও চিন্তা–চেতনার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

বাস্তবেই আমি এমনটি চিন্তা করলাম, অনুসন্ধান করলাম এবং আমি যেমনটি চাচ্ছিলাম, পেয়ে গেলাম। আমি তাকে বিয়ে করলাম।

তুমি হয়তো অবাক হচ্ছো এই ভেবে যে, আমি এখন পরিবারের কর্তা হয়ে গেছি। অথচ আমার বয়স এখন চল্লিশের কাছাকাছি। সময় চলে যাওয়ার পর আমার জীবনের শূন্য দিনগুলোর বাস্তবতা উপলব্ধি করেছি। তবে তাতে কোন ক্ষতি নেই। এ চল্লিশ বছর বয়সেই আমি সেই শূন্যতা পূরণ করবো।

তুমি হয়তো মনে করছো, আমি নিজের উপর আর একটি অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে নিলাম এবং আমার কষ্টের সাথে আর একটি নতুন কষ্ট যোগ করলাম। কারণ, আমি যা আয় করি, তাতে আমার একারই চলে না, তাহলে এখন দু'জনের কিভাবে চলবে? কিন্তু দুঃখ ও বেদনার গভীর সমুদ্রে আল্লাহ কেবল আমাকেই নিক্ষেপ করেননি।

আমার স্ত্রী একজন বিধবা নারী। বয়স তার আমারই সমান। সে জানে, আনন্দ ও ভোগ–বিলাসের জন্য সে এ পৃথিবীতে আসেনি। আর এসব থেকে সর্বদাই তাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে তার অভিজ্ঞতা, বয়স এবং তার অভিজাত বংশ মর্যাদা। যা হোক, সে আমার উপর বোঝা হয়ে আসেনি। আমার কাছে সে এসেছে তার সব জিনিসপত্র ও কাপড়–চোপড় সঙ্গে নিয়ে। সামান্য কিছু উপঢৌকন ছাড়া আমি কিছুই তাকে দিতে পারিনি। তাছাড়া সে পোশাক তৈরি ও সেলাইয়ের কাজ জানে। কিছু বাধা খরিদ্দারও তার আছে, যারা তার সাথেই কেনাবেচা করে। যদিও তাদের সংখ্যা নগণ্য। সুতরাং সে যেমন আমাকে বিব্রত করে না, আমিও তাকে বিব্রত করি না। হালাল ও ভদ্র উপায়ে জীবিকা অর্জনে তো

কোন লজ্জা থাকতে পারে না।

এখন আমি কাজ থেকে পরিশ্রান্ত হয়ে ফিরে এসে খাবার প্রস্তুত দেখতে পাই। তা সে খাবার যত সাদামাঠা ধরনেরই হোক না কেন। একটি দরদী হাত আমার কপাল থেকে দিনের ঘাম ও রাতের শ্রান্তি এখন দূর করে দেয়। এখন আমার মোযা জোড়া গোছানো ও কাপড়-চোপড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। শুধু যে এই মানসিক প্রশান্তিই লাভ করে থাকি তা নয়। বরং তার কাছে মনের কথা বলে আমার একাকীত্ব দূর করি এবং দু'জনে গল্প-গুজব করে অবসর সময় অতিবাহিত করি। এখন আর আমাকে কোন দুশ্চিন্তা কুরে কুরে খায় না।

আমার এ স্ত্রী আমার জন্য সুন্দর এক অভিজ্ঞতা। আমার হৃদয়ের বদ্ধ দুয়ার তার জন্য উন্মুক্ত হয়ে গেছে। এ কৃতজ্ঞতার জীবন সত্ত্বেও বর্তমানে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবানই মনে করতে পারি। অতীতের স্মৃতি মাঝে মাঝে আমার মানসপটে ভেসে ওঠে। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য। আমার স্ত্রী তা ভুলিয়ে দেয়। অতীতের সেই বেদনাদায়ক স্মৃতি দীর্ঘক্ষণ রোমন্থন করার সুযোগ সে আমাকে দেয় না।

এ প্রসঙ্গে আনন্দের সাথে তোমাকে জানাচ্ছি যে, 'মুনীরা' এটাই তার নাম, তোমাকে দারুণ ভালোবাসে। রাত-দিন সে আমাকে অনুরোধ করে আমি যেন তোমার একটি ছবি চেয়ে তোমাকে চিঠি লিখি। আমার ধারণা, তুমি তার আশা পূরণ করবে। এতে অবাক হওয়ার তেমন কিছু নেই। কারণ, আমাদের দু'জনের মধ্যে যে আলোচনা হয়, তার অধিকাংশ তো তোমাকে নিয়েই। শুধু এতটুকুই নয়, আরও অনেক কথা আছে। সে একটি চমৎকার প্রস্তাব দিয়েছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে তার সে প্রস্তাব মেনে নিয়েছি। কিন্তু এখন তা তোমাকে অবহিত করব না। এ বছর তুমি পরীক্ষায় কামিয়াব হলে তুমি তা জানতে পারবে, ইনশাআল্লাহ।

আর একটি কথা। তোমার দাদী নিশ্চয় আমার উপর ক্ষেপে যাবেন এবং কান্নাকাটি শুরু করে দেবেন। কারণ, প্রথমত বিয়ের ব্যাপারে আমি তাঁর মতামত নিইনি। দ্বিতীয়ত, বিবাহ অনুষ্ঠানে তাঁকে আমি দাওয়াত দিইনি। তৃতীয়ত, আমি একজন 'কাহেরিয়া' বা কায়রোবাসিনীকে বিয়ে করেছি। কিন্তু আশা করি সুলায়মান, তুমি তাঁকে শান্ত করতে পারবে। ইনশাআল্লাহ আগামী ঈদে যখন আমরা তোমাদের কাছে উপস্থিত হব, তখন তাঁর তিনটি অভিযোগই ধুয়ে-মুছে দূর হয়ে যাবে।

সবশেষে আল্লাহর কাছে তোমার কামিয়াবীর জন্য দোয়া করি। জীবনে এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহকে ভুলো না। সব রকমের বিক্ষোভ ও মিছিল থেকে সব সময় দূরে থাকবে এবং তোমার পড়াশোনার প্রতি গুরুত্ব দেবে।'

আমি খুব দ্রুত দাদীর কাছে গিয়ে বললাম, আমার কাছে আপনার একটি চমৎকার খবর আছে।

–ইনশাআল্লাহ সব মঙ্গল তো? কী খবর সুলায়মান?

–না, পয়সা না দিলে বলবো না।

–আমার দাদু ভাই, বল।

–শুধু মিষ্টি কথায় আমি ভুলবো না। এই আমার হাত বাড়িয়ে দিলাম, তাড়াতাড়ি পয়সা ফেলুন। পয়সা দিলেই সেই সুসংবাদ শুনতে পাবেন।

–তোমার জীবন ও তোমার প্রতি আমার স্নেহ–মমতার শপথ। আর এটা হলো আমার কাছে সবচেয়ে কঠিন শপথ। তুমি যা চাইবে তাই আমি তোমাকে দেব।

–শুনুন দাদী! আমার চাচা শহরে বিয়ে করেছেন।

–তোমার চাচা বিয়ে করেছেন? সুলায়মান, রসিকতা করো না!

–আল্লাহর নামে কসম করে বলছি, তিনি বিয়ে করেছেন।

১২

–শহরে?

–হাঁ, শহরে। আর তিনি আপনাকে চিঠি লিখেছেন।

–আমাদের না জানিয়ে কেমন করে হলো? আনন্দ–ফুর্তি ও মিষ্টি–মিঠাই ছাড়া কেমন করে এ বিয়ে হলো?

–ঐগুলো এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। তিনি বিয়ে করেছেন, ব্যস এতটুকুই যথেষ্ট।

–নিশ্চয়ই ওটা একটা শোক অনুষ্ঠান হয়েছে, বিয়ে হয়নি।

আমার দাদী রেগে গেলেন। বললেন– আল্লাহ তাকে মাফ করুন। আমাকে না জানিয়ে ফরীদ বিয়ে করলো?

এরপর কান্না বিজড়িত কণ্ঠে তিনি বললেন– আমার হতভাগা ছেলেটি! সারাটি

জীবনই তোর বিদেশ বিভূঁইয়ে কেটে গেল। আনন্দ-ফূর্তি করার জন্যে কাকেও পেলি না।

-দাদী, এখানে আনন্দ-ফূর্তি করলে হয় না? কায়রো ছাড়া অন্য কোথাও কি আনন্দ-ফূর্তি করা যায় না?

-বেটা, তুমি ছেলে মানুষ। মানুষের সম্মান সব নিয়ম-নীতি ও দায়িত্ব-কর্তব্যের ওপর নির্ভর করে, তা তুমি জান না।

-যাই হোক, চাচার কথা ছেড়ে দিন। আমিই আপনার সব আশা পূরণ করবো। আপনি শান্ত হোন, ধৈর্য ধরুন। দু'মাস পর ঈদের সময় তিনি বাড়ীতে আসবেন, তখন আপনাদের মাতা-পুত্র দু'জনের মধ্যে সমঝোতা করে দেব। মিষ্টি-মিঠাই যা চান তখন তৈরি করবেন।

-তার বউয়ের গুণপনা ও স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে একটি কথাও তোমাকে বলেনি?

-অনেক কিছুই বলেছে। তার নাম 'মুনীরা', তিনি বিধবা।

আমার কথা শেষ না হতেই দাদী ঘৃণা ও দুঃখের সাথে বলে উঠলেন,

-বিধবা? তাতো হবেই। শহরের কুমারীরা তোমার চাচার মত কপর্দকহীন মানুষের কাছে ভিড়বে কেন?

-দাদী, কুমারী বা বিধবাতে এমন কিছু আসে-যায় না। সতী-সাধ্বী, শিষ্টাচারিণী, স্বামী-অনুগতা ও স্বামী-অনুরক্তা স্ত্রী হওয়াই তো আসল কথা।

-সুলায়মান, চুপ কর। তুমি পার্থক্য বুঝবে না। আমি তো বলেছি, তুমি একটা ছোট্ট বালক। সামনে তোমার যে খাবারই দেয়া হয় খেয়ে নাও। কুমারীর সাথে বিয়ে একটা বিশেষ আনন্দ ও সৌভাগ্য। কিন্তু তিনি কথা শেষ করলেন এই বলে! ওঠো যাও, পড়ালেখা কর।

-সংবাদ শোনালে যে বিনিময়ের ওয়াদা করেছিলেন তা কোথায়?

-তোমার জন্য আগামীকাল একটা চমৎকার খাবার তৈরি করবো।

-খাবারের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। আমি চাই নগদ পয়সা।

-হাঁ, তাহলে তো আজে-বাজে বই দেখতে যেতে পার, তাই না?

-কখ্খনো না, দাদী।

-তাহলে পয়সা চাও কেন?

-আপনার দৃষ্টিতে সিনেমা-থিয়েটার ছাড়া অন্য কোথাও কি খরচ করা যায় না?

দাদীর কাছ থেকে দু' তিনটি পয়সা আমি বের করে নিতে পারি, এ ভয়ে তিনি আর আমার কথায় কর্ণপাত করার চেষ্টা করলেন না। নিচু গলায় গুনগুন করে বহুল প্রচলিত আনন্দসূচক একটি লোকগীতি গাইতে গাইতে তিনি আমার কাছ থেকে উঠে গেলেন।

বার্ধক্যের কারণে তাঁর গলার স্বর কেঁপে কেঁপে উঠছিল। সে গানের বাণী ছিল ভালোবাসা এবং মহাপ্লাবী মাতৃস্নেহ। চাচা ফরীদকে স্মরণ করেই তিনি গানটি গেয়েছিলেন। সেই কতকাল আগে থেকেই তিনি চাচাকে বিয়ের জন্য পীড়াপীড়ি করে আসছিলেন। তখন তাঁর দেড় একর উৎকৃষ্ট জমি ছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন উদাসীন, পীড়াপীড়ির প্রতি তিনি তেমন একটা গুরুত্ব দেননি। আমার দাদীর গানগুলো সেকেলে ও সাদামাঠা হওয়া সত্ত্বেও এবং তাঁর গাওয়ার ঢংটি হাসির উদ্রেক করলেও তা কিন্তু আমার অন্তরে ব্যথা সৃষ্টি করতো। হয়তো এই কারণে যে, তাঁর সেই সুর ছিল তাঁর হৃদস্পন্দনধ্বনি, তাঁর বিগলিত অনুভূতি ও তাঁর আত্মার সঙ্গীত। আমি একটু রসিকতা করে বললাম– দাদী, আপনার কণ্ঠস্বর তো খুব সুন্দর, ভারি চমৎকার।

–বেটা, আমার বার্ধক্য নিয়ে বিদ্রূপ করো না। আমাকে আমার নিজের মত থাকতে দাও।

–দাদী, আমার কথায় রাগ করলেন? আল্লাহর কসম! আপনার গান আমাকে আন্দোলিত করে।

এরপর দাদী অসীম শূন্যের পানে তাকিয়ে বলতে লাগলেন,

–আল্লাহ সেই অতীত দিনগুলোর ওপর রহম করুন। কোকিলের মত ছিল আমার কণ্ঠস্বর। কোন বিয়েতে আমি গান না গাইলে সে বিয়েকে আনন্দহীন দুর্ভাগা বিয়ে মনে করা হতো। আল্লাহ তোমার দাদার ওপর রহম করুন। কত কষ্ট–ক্লেশ ও ধরাচরা করে আব্বাকে রাযী করিয়ে তিনি আমাকে বিয়ে করেছিলেন।

–দাদা আপনাকে খুব ভালোবাসতেন তাই না?

–অনেক ভালোবাসতেন। আমি যখন খালে পানি আনতে যেতাম তখন আমাকে এক নজর দেখার জন্য তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতেন। আর যেদিন আমি বের না হতাম, সেদিন তিনি আমাদের বাড়ীর চারপাশে ঘুরঘুর করতেন। আমাকে এক নজর দেখার পর তবে ফিরতেন। ঠিক যেন আবু যায়েদ হিলালী আর কি।

দাদী তাঁর কল্পনার জগতে, তাঁর অতীত স্মৃতির সাগরে সাঁতার কাটতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর রাগত স্বরে বললেন– আজকাল প্রেম মানে তো লাম্পট্য, ভোগের কামনা, আদর্শহীনতা, বিকৃতি ও ধর্মের প্রতি উদাসীনতা। তোমার দাদা, আল্লাহ তাঁকে রহম করুন, খাল থেকে ফেরার পথে আমি তাঁর সাথে কথা বলেছি, এ কথা আমার বাবার কানে পৌঁছার পর তাঁর হাতে যে পিটুনি খেয়েছিলাম, তা আজও ভুলিনি। আজকাল তো লজ্জা ও শালীনতার বালাই নেই। বেটা, মানুষ আজ পাল্টে গেছে। আজকাল লোহালক্কড় কথা বলে, হাওয়ায় ওড়ে, লোহার পাতের ওপর দিয়ে দৌড়ায়, ছবি ছুটাছুটি লাফালাফি করে ও তারের

মধ্য দিয়ে আলো আসে। বাব্বাহ্ মাথা ঘুরে যায়, আমার সামনের এসব অভিনব ও আশ্চর্য জিনিসের কিছুই আমার বুঝে আসে না।

দাদীকে আর ক্ষ্যাপাতে চাইলাম না। তিনি যে স্মৃতি সাগরে সাঁতার কাটছেন, তা থেকেও তাঁকে ওঠাতে চাইলাম না। তিনি বলতে লাগলেন অতীত স্মৃতির কথা, আর তার সাথে তুলনা করতে লাগলেন বর্তমানের অভিনব জিনিসের। সুতরাং সেই বিগত প্রজন্মের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো ছাড়া আমার আর উপায় কি? সে সময় আমার কাছে দাদীকে মনে হতো, তিনি যেন একটি প্রাচীন শিল্পের উপহার এবং একটি উৎকৃষ্ট চিরস্থায়ী নিদর্শন। দাদী সম্পর্কে যখন আমি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, তখন আমাকে তিনি সজাগ করে তুললেন এই বলে,

–কি চমৎকারই না ছিল সেই দিনরাতগুলো। যখন নববধূ যেত স্বামীর ঘরে একটি সুদৃশ্য মন্থরগতি ঘোড়ায় চড়ে। বাঁশির সুরের তালে তালে তাল মিলিয়ে ঘোড়াটি হেলেদুলে এগিয়ে যেত মানুষের ভিড়ের মধ্য দিয়ে। আর সেখানে থাকতো অতিথি ও আত্মীয়–স্বজন আপ্যায়নের ব্যাপক আয়োজন। আর আজকাল? নববধূ স্বামীর ঘরে যায়, গাড়ীতে চড়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে রকেটগতিতে অথবা পায়ে হেঁটে যেমনটি তোমার চাচীর বেলায় ঘটেছে।

বললাম– দাদী! এটা তো ব্যস্ততার যুগ।

রাগের সাথে তিনি বললেন– না, এটা হচ্ছে যুদ্ধ, শয়তানী, বিপর্যয় এবং হতাশার যুগ। এটাই এখন সমগ্র মানব জাতির জন্য নেমে এসেছে।

–দাদী, আল্লাহ আপনাকে মাফ করুন।

বছর শেষে পরীক্ষায় পাস করার পর গ্রামের বাড়ীতে ফিরে এলাম। সেখানে তখন আমার জন্যে কিছু দুঃখ–কষ্ট ওঁৎ পেতে বসে ছিল। আব্বা গরু–ছাগলগুলো বিক্রি করে ফেলেছেন। এমনকি আমাদের গাধাটিও দেখতে পেলাম না। এদিকে আম্মাও স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। বাড়ীতে কবরের নীরবতা। কৃষি যন্ত্রপাতি যেমন– লাঙ্গল, শস্যমাড়াই কল, মই ইত্যাদিও বাড়ী থেকে গায়েব হয়ে গেছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, আমাদের সেই বাড়তি ঘরটি, যেখানে আগে গরু–ছাগল ও কৃষি উপকরণ থাকতো, তা আর আমাদের দখলে নেই। বাড়ীর আশপাশ থেকে চরম দারিদ্র্যের ছাপ ফুটে উঠতে দেখে সবকিছু বুঝতে কষ্ট হলো না।

আব্বার হলদে রংয়ের লম্বা গাউনটি যদিও পরিবর্তন হয়নি, কিন্তু তার আসল রংটি উঠে

গিয়ে এখন শ্রীহীন হয়ে পড়েছে। তাতে কিছু তালিও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আম্মাকে দেখলাম, লায়লা ও মাহমুদকে একটি ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে রেখেছেন। কারণ অনুসন্ধান করে জানতে পারলাম, তাদের দু'জনের মাত্র একখানা করে কাপড়। আম্মা তা ধুয়ে শুকাতে দেন, আর তারা সেই ঘরে সম্পূর্ণ ন্যাংটা হয়ে শুয়ে থাকে। বাড়ীর সামনে যে টিউবওয়েলটি ছিল তা পাইপসহ উঠিয়ে বিক্রি করে ফেলা হয়েছে। আম্মা আমাকে বললেন,

সুলায়মান, তোমাকে হাজার হাজার মোবারকবাদ। আল্লাহর কাছে দোয়া করে থাকি, তিনি যেন তোমার জন্য সব সময় কামিয়াবী লেখেন, যাতে তুমি একটা বড় ডিগ্রী অর্জন করতে পার।

শূন্য বাড়ীর দিকে হাত দিয়ে ইশারা করে বিদ্রূপের সাথে বললাম– দারিদ্র্য ও সফলতার জন্য আলহামদ লিল্লাহ।

–বেটা, আমরা কী করবো? বলেই আকাশের দিকে উদাসভাবে তাকিয়ে তিনি বললেন,

–হে আল্লাহ, তার থেকে তুমি বদলা নাও ...মুরসে আবু আফার।

–আম্মা, কী হয়েছিল?

–তুমি এইসব যা দেখছো, তার জন্য দায়ী সে। আমাদের গরু–ছাগল, মহিষ, দুধ, ঘি থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ সে। আমাদের সব কিছু বিক্রি করতে সে বাধ্য করেছে। অনেক অনুরোধ–উপরোধ সত্ত্বেও সে মোকদ্দমা তুলে নিল না। সে ধারণা করেছিল, তোমার আব্বা ঋণের বিনিময়ে তার কাছে জমি বিক্রি করতে বাধ্য হবেন। একটা বড় তালুকের মালিক হওয়ার জন্য মুরসে এখন জমি কেনার জন্যে হন্যে হয়ে উঠেছে।

–তারপর?

–ঘরে কিছুই না রেখে সবই আমরা বিক্রি করে দিলাম। কিন্তু তাতেও ঋণ শোধ হলো না। তারপর তোমার আব্বা বন্ধু–বান্ধব ও আত্মীয়–স্বজনদের নিকট থেকে সামান্য কিছু ধার–কর্জ করে ঋণের সম্পূর্ণ টাকা মালাউন মুরসের মুখের ওপর ছুঁড়ে মারলেন। তারপর আম্মা একটা প্রাণ খোলা হাসি হেসে বললেন,

–তুমি ধারণা করো না, এ নতুন ঋণ আবার কোন্ বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ ঋণের টাকাটা খুবই সামান্য। শিগগিরই আমরা এটা পরিশোধ করে দেব।

গভীরভাবে একটা শ্বাস নিয়ে তিনি বলতে লাগলেন– আলহামদু লিল্লাহ। ঋণ একটা ভারি বোঝা। এ বোঝার তলে যাতে তোমাকে পড়তে না হয় সারাটি জীবন সেই চেষ্টা করবে। তাহলে সুন্দরভাবে জীবন কাটাতে পারবে।

এ প্রসঙ্গে তিনি নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) থেকে বর্ণিত একটি দোয়াও পড়লেন, আল্লাহুম্মা

আউযুবিকা মিন গালাবাতিদ দাইনি ওয়া কাহ্‌রির রিজাল। –'হে আল্লাহ, ঋণের প্রাধান্য ও মানুষের আধিপত্য থেকে তোমার আশ্রয় চাই'।

নির্ঝঞ্ঝাট বাড়ীটির দেয়াল, ছাদ, কড়িকাঠ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না, কিন্তু তাও আমার কাছে পরিপূর্ণ মনে হলো। আমাদের পোশাক ছিল ছেঁড়া–ফাটা, কিন্তু তবু মনে হলো এই সতর ঢাকাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। খাবার ছিল অতি সাধারণ এবং অল্প। তা সত্ত্বেও আমরা পরিতৃপ্তিবোধ করতে লাগলাম। ঋণের বোঝা থেকে মুক্তি মানুষের মনে একটা সৌভাগ্যের অনুভূতি ও আনন্দের ধারা বইয়ে দেয়। তখন সে এমন একটা মুক্তির স্বাদ লাভ করে, যা কোন কিছুতেই নষ্ট করতে পারে না। চিরদিনের জন্য আমরা মুরসের চেহারা দর্শন এবং তার হাতে লাঞ্ছিত হওয়া থেকে মুক্তিলাভ করলাম। তার সাথে চক্রবৃদ্ধি হারে সূদের বিনিময়ে আমাদের ফসল হাতিয়ে নেয়ার হাত থেকেও নাজাত পেলাম। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, আমার আম্মার বুকের ব্যথার তীব্রতা অনেক কমে গেল।

আব্বার মুখমন্ডলের রেখাগুলো স্বাভাবিক হয়ে গেল। সব সময় হাসিখুশি ভাব। লায়লার সাথে খেলা করেন। মাহমুদের সাথে হাসাহাসি করেন। ক্ষেতে কাজের মধ্যে বা বাড়ীতে অত্যন্ত উৎফুল্ল চিত্তে তাদেরকে চুমু দেন। তাঁর হাবভাব দেখে মনে হয়, তিনি যেন একটা যুদ্ধ জয় করেছেন। কারণ, তিনি পিতার নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এক শতক জমিও হাতছাড়া করেননি এবং তাঁর পিতা তাঁর হাতে আমানত স্বরূপ যে জমি রেখে গিয়েছিলেন, সেখানে অন্য কাউকে আসতেও দেননি। আর আমার অবস্থা? এত আনন্দদায়ক ছুটি আমি জীবনে আর উপভোগ করিনি। এবার তুলোর আয়ই আমাদের জন্য অনেক কল্যাণ বয়ে আনবে। তাতেই আমাদের সকল দুর্ভাগ্য ধুয়ে–মুছে যাবে।

আল্লাহ চাচাকে ক্ষমা করুন। নেশা জাতীয় জিনিস থেকে তাঁকে নাজাত দিন। যুদ্ধ–বিগ্রহ থেকে মুক্ত রাখুন, তুলোর দামের নিম্নগতি থেকে এবং মুরসে আবু আফারের খপ্পর থেকে আমাদের বাঁচান। এরা সবাই একত্রে আমাদের বিপর্যয়ের জন্য দায়ী।

আব্বাকে বললাম– ঈদ তো প্রায় এসে গেল। আর এ মহান ঈদ উপলক্ষে চাচা ও তাঁর স্ত্রী মুনীরা আমাদের কাছে আসবেন। আপনি নিজের জন্য একটা নতুন গাউন খরীদ করছেন না কেন?

একটু মুচকি হাসি হেসে আব্বা বললেন– এ কথা ঠিক যে, আমার দেহের পোশাক শতচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তবুও তো আমি মানুষের মাঝে সোজা হয়ে মাথা উঁচু করে হাঁটতে পারছি।

–কিন্তু আব্বা, সুন্দর পোশাক–পরিচ্ছদ তো সবাই পছন্দ করে।

–ভালো কথা, কাপড়–চোপড় কিনতে গিয়ে আবার নতুন করে ঋণের জালে আটকে

পড়ি তাই কি তুমি চাও? ওহে বুদ্ধিমান, এটা কি পছন্দনীয় ভালো কাজ হবে? কোন উত্তর খুঁজে না পেয়ে চুপচাপ মাথা নিচু করে বসে রইলাম। একটু পরে আবার তিনি বললেন,

–আমার মনে হয়, তোমার গত বছরের পোশাক এখনও পরার মত আছে। ইনশাআল্লাহ এ বছরও সে পোশাক পরেই স্কুলে যেতে পারবে।

বিড়বিড় করে বললাম– হুঁ, এখনও বেশ ভালো আছে।

তারপর আমার পিছে হাত বুলোতে বুলোতে তিনি বললেন– আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন। তুমি আমার অবস্থা এবং আমার কাঁধে যে বোঝা রয়েছে, তা উপলব্ধি করতে পেরেছ, এতে আমি দারুণ খুশি। প্রতিবছর তোমার কৃতকার্যতা নিয়ে আমার যে গর্ব, তা থেকেও তোমার এ অকাল পৌরুষ নিয়ে আমি বেশী গর্ববোধ করবো।

আব্বার এ অতিরঞ্জিত কথাবার্তায় দারুণ লজ্জা পেলাম। কারণ এমন ভাষায় তিনি খুব কমই আমার সাথে কথা বলেন। কথা শেষ করলেন আব্বা এই বলে,

–মনে রেখ সুলায়মান! তোমার এ কামিয়াবীর মূল রহস্য তোমার প্রতি আমার সন্তুষ্টি ও রাত–দিন তোমার জন্য আমার দোয়া।

আমি তাঁকে হাসাবার জন্য একটু রসিকতা করে বললাম,

–আর দীর্ঘদিন ধরে এত কষ্ট করে আমার পড়াশোনা? এ কামিয়াবীর পেছনে এর কি কোন ভূমিকা নেই?

–ওরে কমিনা, এ কথা ঠিক যে, পড়াশোনার বিরাট ভূমিকা আছে। তবে তার থেকেও বেশী গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আল্লাহর তাওফীক।

–আর আমার দাদী, যিনি আমার পাশে ওঁৎ পেতে বসে থাকেন, বকাঝকা করেন, ভয়–ভীতি দেখান। তাঁরও কি কোন ভূমিকা নেই?

এ সময় দাদী কুঁজো হয়ে আস্তে আস্তে পা ফেলে আমাদের কাছে এসে বললেন,

–ওরে আবদুদ দায়িম, আমি সাইয়্যেদ ঈসা আল–ইরাকীর নাম নিয়ে বলছি, যদি আমি তার কাছে না থাকতাম, এ বছর সে পাসই করতো না।

–মা, তা ঠিক। আপনিই তো কল্যাণ ও বরকত। আপনিই তো সব। আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন!

আমি সেখান থেকে উঠে যাবার আগেই আব্বা জোর দিয়ে বললেন, আমি যেন শায়খ হাফেজ শীহাকে একটি চিঠি লেখি এবং সাঈদের কামিয়াবীর জন্য তাঁকে সালাম ও মোবারকবাদ জানাই।

আমাদের প্রত্যাশা মত আমার চাচা ঈদে আসেননি। বস্তুত ঈদে তাঁর সাথে সাক্ষাত না হওয়ায় আমরা খুবই খুশি হয়েছিলাম। কারণ আমরা আমার চাচার স্ত্রীকে, যিনি এই প্রথমবারের মত আমাদের সাথে দেখা করতে আসছেন, স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তিনি এখানে এসে বাড়ীর এ দুরবস্থা দেখবেন, তখন আর আমাদের মান-ইজ্জত থাকবে না। সম্ভবত চাচা তা বুঝে ফেলেছিলেন। বিশেষত এমন একটি সাক্ষাতের জন্য আসতে অনুরোধ করে তাঁকে কোন চিঠিও আমরা লিখিনি। আমরা চাচ্ছিলাম, আমাদের অবস্থা একটু ভালো হলে অন্য যে কোন এক সময় তিনি আসুন। তখন আমরা আমাদের রেওয়াজ ও কর্তব্য অনুযায়ী সম্মান ও আতিথ্যের মাধ্যমে তাঁকে বরণ করবো। আর এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, আমার চাচা চাচীর কাছে আমাদের পল্লীর সম্পদ ও পশু-পাখীর গল্প করেছেন, তার ভায়ের উর্বর জমিজমার কথা বলেছেন। বলেছেন তাঁর ভাই অত্যন্ত উদারভাবে সব ভালো ভালো জিনিস তাঁকে দিয়ে দেন। যখন তিনি এখানে এসে চাচার বর্ণিত কোন কিছুই দেখতে পাবেন না, তখন তাঁর প্রতিক্রিয়া কেমন হবে?

ঈদের কিছুদিন পর চাচার একটি চিঠি এলো। তিনি যে আসতে পারেননি, সে সম্পর্কে অত্যন্ত অনুনয়-বিনয় করে লিখেছেন। চাচীকে অন্য কোন এক সময় নিয়ে আসবেন বলে তাঁকে কথা দিয়েছেন। যে প্রস্তাবটি তাঁর স্ত্রী রেখেছিলেন এবং যে সম্পর্কে পূর্বের চিঠিতে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তা তিনি এ চিঠিতে পরিষ্কার করে ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'সুলায়মান, তুমি তোমার কাগজপত্র কায়রোর 'সাইয়্যেদা যয়নাব' এলাকার কোন স্কুলে ভর্তির জন্য পাঠিয়ে দিলে এবং বন্ধ শেষ হওয়ার সাথে সাথে আমাদের কাছে চলে এলে আমরা খুশি হবো। আমার বিশ্বাস, আমাদের এ সামান্য আকাংখা বাস্তবায়নের ব্যাপারে তোমার আব্বা কার্পণ্য করবেন না। নিশ্চয় এখানে তুমি হবে আমাদের সৌভাগ্য ও আনন্দের উৎস। তাছাড়া এ বিদেশে তোমাকে দেখাশোনা করার জন্য একজন লোকও পাবে। বিশেষত মুনীরা সে তো একজন প্রথম শ্রেণীর মা। যদিও ভাগ্য তাকে সন্তান থেকে বঞ্চিত রেখেছে।

কায়রোতে তুমি পাবে একটা নতুন বিশ্ব। বেড়াতে যাবে পিরামিডে, জাদুঘর এবং প্রাচীন দালান-কোঠাসমূহে। তুমি আমার পাশে থাকলে মনে শান্তি পাব। যে সব পদস্খলনের মাধ্যমে আমার ভবিষ্যত কালের গর্ভে প্রোথিত করেছি, আশা করি তা থেকে তোমাকে বাঁচাতে পারবো। এ কথার ব্যাপারে তুমি কি আমার সাথে একমত হবে? কিংবা এ কথাটি কি তুমি বিশ্বাস করো না যে, 'প্রতিটি প্রজন্ম তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করে'? তুমি বিশ্বাস কর বা না কর, তাতে কিছু যায়-আসে না। আমার বিশ্বাস,

কায়রোতে এলে তোমার ভালো হবে, অনেক কল্যাণ হবে।

এখানে একটা চমৎকার জিনিস তোমার জন্যে রাখা হয়েছে। আর সেটা তৈরি করেছে তোমার চাচী। না, তা তোমার জন্য কোন বিস্ময়ের জিনিস হতে যাবে কেন? এক্ষণই তোমাকে তা জানিয়ে দিচ্ছি। তারপর যা হয় তা হবে। মুনীরা তোমার জন্য এক টুকরো পশমী কাপড় কিনে রেখেছে। তোমার আসার পর এটা হবে তোমার জন্য প্রথম উপহার। তার ইচ্ছা, এখানে তুমি এলে ভালো নতুন জামা–কাপড় পরে অন্য ছাত্রদের সাথে স্কুলে যেতে হবে। তার এই মহৎ কাজের জন্য তোমার পক্ষ থেকে একটা গভীর আনন্দ অনুভব করে থাকি। কারণ আমি জানি, মুনীরা একটা একটা করে টাকা জমায় এবং প্রতিটি উপলক্ষে খুব কষ্ট করেই সে তা জমায়, যাতে সে তোমার প্রয়োজনীয় নতুন পোশাকের অর্থ যোগাতে পারে। আমি দুই কেজি গোশত কিনতে চাইল সে বলে–

–এত কেন? দেড় কেজিই যথেষ্ট। বাকী পয়সা আমরা সুলায়মানের পোশাকের জন্য জমিয়ে রাখবো। তারপর সে এক বাকযুদ্ধ শুরু করে দেয়। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য। আমার কাছে তা খুবই ভালো লাগে। আমার ওপর বিজয় লাভের পর তার বাকযুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। আমি দুর্বল এ কারণে নয়, বরং তার সেই বিজয়কে প্রাধান্য দিই এই জন্য।

সুলায়মান, তোমার প্রতি তার এ স্নেহ–মমতা দেখে আমার ঈর্ষা হয়। তুমি বড় সৌভাগ্যবান। কারণ, মুনীরার হৃদয়টি বড় চমৎকার। সে অত্যন্ত সরল। আমার সাথে বিয়েতে সে রাযী হওয়ায় আমি সৌভাগ্যবান।'

'তোমার চাচা'

এই চিঠিতে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকও ছিল। সে সম্পর্কে আমার চাচা একটুও ইঙ্গিত দেয়ার চেষ্টা করেননি। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি আমাকে ভালোবাসেন এবং চান আমি তাঁর পাশে থাকি। কিন্তু আব্বার কষ্ট হবে ভেবে একই সাথে অন্য একটি বিষয় পাশ কাটিয়ে গেছেন। আমি তো জানি তাঁর দৈনিক মজুরি তাদের দু'জনের সব প্রয়োজন মেটাতে পারে না। তাঁদের এই টানাটানির সংসারে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে আমি উপস্থিত হলে কি অবস্থা দাঁড়াবে, সেটাও তো চিন্তা করার বিষয়।

তবে এ কথা ঠিক যে, আমার ব্যক্তিগত হাত খরচের জন্য কিছু অর্থ সংগে নিয়ে যাব। তবুও তো আগে–ভাগে বলা যায় না, কোন প্রয়োজনে তাঁর মুখাপেক্ষী হব কি না। আত্মত্যাগ ও সংগ্রাম চাচার কাছে মধুর মনে হয়েছে তা তো স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে। আর আমার কারণে তিনি চরম সন্ন্যাস ও বৈরাগ্যের জীবনকেও এক ধরনের ইবাদাত ও আল্লাহর

নৈকট্য বলে মনে করবেন।

এই চিঠি পৌছার দিন আব্বা বললেন– বেটা, এ সম্ভব নয়। এতে তোমার চাচার ওপর জুলুম করা হবে। এটা কোন মতেই উচিত হবে না।

–কিন্তু আমি তো কায়রোতেই পড়ালেখা শেষ করার জন্য দারুণ আগ্রহী ছিলাম।

–তা হোক। কিন্তু তোমার চাচার সুখ–স্বাচ্ছন্দ্যের বিনিময়ে কোন মতেই সেটা হতে পারে না।

–আপনি বিষয়টিকে বেশী জটিল করে তুলছেন। আমার প্রয়োজনীয় সবকিছুই সঙ্গে নিয়ে যাব।

–আমি জানি, তোমার চাচা তোমাকে খুব স্নেহ করে। তোমাকে খুশি করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে। তোমার সুখ–স্বাচ্ছন্দ্যের সব উপায়–উপকরণ সংগ্রহ করতে কোন ত্রুটি করবে না। আর এতে তার স্বাভাবিক সচ্ছলতা বাধাগ্রস্ত হবে।

–না, এ রকম ত্যাগ স্বীকার, যার কোন প্রয়োজন নেই, আমি কখ্খনো তা মেনে নেব না।

–সুলায়মান, এটা তুমি, তোমার স্বার্থের কথা বলছ।

–আপনার কাছে আমি তা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করছি।

–আমি বিশ্বাস করি না।

–আপনাকে কসম করে বলছি।

এ প্রকল্প মেনে নেয়ার জন্য আব্বাকে বেশী সাধাসাধির প্রয়োজন নেই। কারণ তিনি চাচাকে কখ্খনো কষ্ট দিবেন না। আর এখানে চাচা ফরীদের ওপর অতিরিক্ত বোঝার ভয় ছাড়া অন্য কোন বাধা তো নেই।

রাতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলাম। তিনটি পিরামিড শূন্যের দিকে মাথা উঁচু করে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে। আরও দেখলাম, প্রাচীন ও আধুনিক অলিগলি, ওলী–আল্লাহদের মাযার, মসজিদের মিনার, গম্বুজ, অসংখ্য নাট্যশালা, যত্রতত্র ছড়িয়ে থাকা থিয়েটার–সিনেমা হল, শাহী প্রাসাদ, লাল লাল গাড়ী, আমীর–উমারা, উযীর–পাশা, শিল্পী–দার্শনিক এবং আমার মত মানুষের কল্পনায় যা আসে তা সবই।

এটা কি ঠিক কথা যে, মিসর হচ্ছে সমগ্র বিশ্বের জননী? মিসরের নামকরণ কি কারোর নামে হয়েছে?

বিষয়টি আমরা আগামীতে তলিয়ে দেখবো। যাই হোক, একটি জিনিস অবশ্যি আমার সব স্বপ্নসুখ বিনষ্ট কর দিচ্ছে। সেটা হচ্ছে সাঈদ হাফিজকে ছেড়ে যাওয়ার বেদনা। খুব শিগগিরই তো তাকে ছেড়ে দূরে চলে যাব।

১৩

১৯৪৮ সালে ফিলিস্তীনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত বাস্তবে রূপ লাভ করে। আর এটাই ছিল সেই আরব জাতির জাগরণের সূচনা, যে জাতি সাম্রাজ্যবাদীদের ক্রীড়নকে পরিণত হয়ে এতকাল নির্জীব হয়ে পড়েছিল।

ইরাক, মিসর, জর্দান, সিরিয়া, হেজায সর্বত্রই বিপ্লব। প্রতিটি দেশই স্বাধীনতা ও সাম্যের বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে শুরু করে। যেখানে আমি নতুন ভর্তি হয়েছি, সেই খেদীব ইসমাঈল উচ্চ বিদ্যালয়ে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে শুরু করেছে। আমাদের দাবী হচ্ছে, আরব সেনাবাহিনী ফিলিস্তীনে প্রবেশ করে ফিলিস্তীনকে ইহুদীমুক্ত করুক। দেশের সেনাবাহিনী সম্পর্কে আমরা বেশী কিছু জানতাম না। তবে তারা আমাদের মনে এতটুকু ভীতি ও শ্রদ্ধার সঞ্চার করেছে যে, আমাদের সেনাবাহিনী সংখ্যা ও উপকরণের দিক দিয়ে যথেষ্ট শক্তিশালী। বিভিন্ন দেশের সাথে অস্ত্র-ক্রয় চুক্তি আছে। মোটামুটিভাবে আমাদের সেনাবাহিনী নতুন রাষ্ট্র ইসরাইলকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে ফেলতে সক্ষম।

এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত লজ্জার বিষয় যে, আমাদের হাতে অস্ত্র এবং ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আমাদের সেনাবাহিনী ফিলিস্তীনে প্রবেশ করবে না। আর তাতে আমাদের নৈতিকতা ও মূল্যবোধের গায়ে একটুও আঁচড় লাগবে না। আর এদিকে আমরা আরবদের পক্ষে সংগ্রাম করার দাবী করছি। দাবী করছি সেই দীনের আহবানে সাড়া দেয়ার জন্যে যে দীন আমাদের উৎসাহিত করেছে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে।

সে দিনগুলোর কথা ভোলা যায় না, যখন স্বেচ্ছা-সৈনিকরা স্রোতের মত দলে দলে বেরিয়ে পড়েছে, তাদের সাথে যোগ দিচ্ছে মিসরের সেনাবাহিনী, আরব বিশ্বের অন্যান্য দেশের লোকেরা সর্বান্তকরণে তাদের সমর্থন ও বাহবা দিচ্ছে এবং তাদের জন্য দোয়া করছে একনিষ্ঠভাবে। ফিলিস্তীন সমস্যা ছিল- এখনও আছে- মুসলিম উম্মার সমস্যা। ছোটখাট কোন জাতির সমস্যা নয়। মানুষ এমনটিই বুঝেছিল। আর এ বুঝই আমাদের অন্তর থেকে সব রকম শোবাহ্-সন্দেহ দূর করে দেয়। তাই সাম্রাজ্যবাদীদের সহযোগী চোর-গুন্ডা, মওজুদদার ও অসৎ লোকদের সম্পর্কে কেউ সতর্ক হতে সময় পায়নি। এটা একটি সরকারের মন্ত্রীত্ব চলে যাওয়া কিংবা ফিরে আসার মতন কোন ব্যাপার ছিল না। এটা

একটা সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত, যা গোটা আরব জাতিকে ক্যান্সারের মতন কুরে কুরে খেতে থাকবে।

একদিন সন্ধ্যায় আমি চাচার কাছে ফিরে এলাম। তাঁর নামায শেষ হওয়ার পর আমি বললাম,

–সত্যিই আজকের দিনটি বড় চমৎকার। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে দিনটি নূরের হরফে লেখা থাকবে।

চাচা দোয়া–দুরূদ পাঠ শেষ করলেন। আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে বললেন,

–মিঃ সুলায়মান, কি হয়েছে আমাকে বলো তো!

–কী যে বলব তা ঠিকই করতে পারছি না, চাচা! অনলবর্ষী বক্তৃতার সাথে ঘনঘন হাততালি, আর তার সাথে ঘৃণা–বিদ্বেষের অঙ্গনে আবাল–বৃদ্ধ–বনিতার চোখগুলো যেভাবে ঝিকিয়ে উঠেছিল, তার কোন্‌টার বর্ণনা দেব?

একটা গম্ভীর হাসি হেসে তিনি বললেন– তুমিও দেখছি উত্তেজনার স্রোতে ভেসে যাচ্ছ। শান্ত–শিষ্ট সুলায়মান তার স্বভাবগত ধৈর্য ও সহনশীলতা নিয়ে কি এই বিক্ষোভের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না?

–মানুষের সব বিক্ষোভের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো যায় না, চাচা এটা তো জীবন–মরণের প্রশ্ন। সেখানে ক্ষমতার কোন প্রশ্ন নেই।

–ঘটনাটি আমাকে খুলে বলো দেখি।

–আজকের 'কন্টিনেন্টাল' সম্মেলনটি ছিল এক বিরাট জাতীয় সম্মেলন। আরব বিশ্বের সব রাজনৈতিক দল ও স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিনিধিবৃন্দ এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। সমস্ত কিছুর বিনিময়েই ফিলিস্তীনের আযাদীর প্রতিশ্রুতির ঘোষণা দিয়েছে।

এ পর্যন্ত বলে আমি একটু অপেক্ষা করলাম, দেখি চাচা কি মন্তব্য করেন। তিনি একটু মাথা দুলিয়ে চুপ করে থাকলেন। পুনরায় আমি বললাম– দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হাজার হাজার ছাত্র সমবেত হয়েছিল। তাদের দাবী ছিল স্বেচ্ছা–সৈনিক হিসেবে তাদের যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হোক এবং অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হোক।

চাচার চোখে–মুখে একটা গাম্ভীর্যের ছাপ ফুটে উঠলো। বললেন,

–এসব কথা স্রেফ ধোকাবাজি। একদম নির্জলা মিথ্যাচার!

বিস্ময়ের সুরে বললাম– কেমন করে?

বললেন– তারা মানুষের আবেগ–অনুভূতিকে উত্তেজিত করে এইভাবে বশীভূত করে ফেলে।

–আপনার কথা শুনে আমি অবাক হচ্ছি, চাচা! আপনি কি চান তারা চুপ করে বসে

থাকুক, ভাগ–বাঁটোয়ারার প্রস্তাব শান্তিপূর্ণভাবে পাস হওয়ার জন্যে আহবান জানাক এবং ঘটমান পরিস্থিতির কাছে নতি স্বীকার করুক?

–ফিলিস্তীনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে বহু দিন থেকে– আরব নেতৃবৃন্দের একেবারে দৃষ্টির সামনেই। একটা জঘন্য পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি একটি করে ফিলিস্তীনের প্রতিটি অঙ্গ মৃত্যুবরণ করবে। ধীরে ধীরে কাজ হয় এমন বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে তারা এটাকে শেষ করতে চায়। আরব নেতৃবৃন্দ তখন কী করছিল? কেবল প্রস্তাব গ্রহণ ও হুমকি দেয়া ছাড়া আর কিছুই করেনি। এমনকি ঐতিহাসিক বালফোর ঘোষণার পরও তারা ইহুদীদের আমল দেয়নি।

–আমি এ ব্যাপারে আপনার সাথে একমত যে, সত্যিই তারা ভুল করেছে। এখন তাহলে আমরা তার প্রতিকার করবো, না ফিলিস্তীনের ধ্বংস হতে দেখেও চুপ করে বসে থাকবো?

–সুলায়মান, তুমি কি ভুলে গেছ জর্দান সেনাবাহিনীর কমান্ডার–ইন–চীফ হচ্ছেন একজন ইংরেজ এবং সামরিক দিক দিয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বৃটিশ বাহিনী ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে? তুমি কি ভুলে গেছ ইরাক ও সুয়েজের ব্যাপারে ইংরেজদের নীতির কথা? এ প্রভাবশালী ইংরেজ শক্তিই তো ফিলিস্তীনকে ইহুদীদের হাতে সোপর্দ করেছে, তাদের হাতে তুলে দিয়েছে অস্ত্র ও গোলাবারুদ। তারাই তো প্রতিষ্ঠিত করেছে ইসরাইল রাষ্ট্র। তারাই এখন আরব সরকারগুলোকে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করে তুলছে। এর পরে তুমি আর কী আশা করতে পার?

–যাই হোক না কেন, আমরা তাদেরকে শক্তিশালী প্রতিরোধের মাধ্যমে ফিরিয়ে দেবই।

–ইংরেজরাই তো চেয়েছে বিভক্তি। তারা জানে তোমাদের ক্ষমতা কতটুকু। তোমাদের শাসক নেতৃবৃন্দের সাথে তাদের অতিরিক্ত মেলামেশা ও যোগাযোগের মাধ্যমে তারা বুঝতে পেরেছে তাদের মনের কথাটি। তুমি কি মনে করেছ আমাদের যা ইচ্ছা তাই করার অধিকার তারা দেবে?

আমি কি বলি তা দেখার জন্য চাচা চুপ করলেন। কিন্তু আমি চুপ করেই রইলাম। তিনি আবার বললেন–এমনটি আমি কখ্খনো ধারণা করতে পারি না।

–সত্যিই অবাক হওয়ার ব্যাপার দেখছি।

–আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট বাদ পড়ে গেছে। আমার মনে হয় ধরতে পারনি।

–কি?

–আচ্ছা বল তো সুলায়মান, আমাদের ও আরব বিশ্বের সেনাবাহিনীর অস্ত্র আসবে

কোথা থেকে?

–অবশ্যই ইংল্যান্ড থেকে।

–তুমি কি বিশ্বাস কর আমাদের চাহিদা মত ইংল্যান্ড অস্ত্র সরবরাহ করবে?

–যদি উচিত মূল্য দিই, তাহলে কেন করবে না?

–ইংল্যান্ড এতখানি পাগল নয় যে, সে তোমাকে পরিপূর্ণরূপে অস্ত্রসজ্জিত করবে। তা যদি সে করে, তবে সেটা হবে তার নিজের পায়েই কুড়াল মারার শামিল। আর এ অস্ত্র দিয়ে যে ইহুদীদের তোমরা মারতে চাও, সেই ইহুদীরাই তো ইংরেজদের বন্ধু।

–তাহলে অন্য কোন দেশ থেকে আমরা অস্ত্র কিনবো।

–এমনটি যে দিন সম্ভব হবে, সেদিন নিজেকে তুমি প্রকৃতই স্বাধীন বলে বিশ্বাস করতে সক্ষম হবে।

–আশ্চর্যের কথা! সরকারকে তাহলে বাধা দেবে কে?

–সরকার তো ক্ষমতায় থাকার জুয়া খেলা নিয়ে ব্যস্ত আছে। আমাদের নেতা মহামান্য বাদশাহর জন্য ঐ সব ভাবনা–চিন্তা অত্যন্ত মারাত্মক।

চাচার কথা ভেবে দেখতে লাগলাম। কথাগুলো আমার কাছে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত মনে হলো। তাঁকে আবারো বলতে শুনলাম– শিগগিরই সত্যি সত্যিই মিসরীয় বাহিনী ফিলিস্তীনের দিকে অগ্রসর হবে। যে গ্যারিসনে কাজ করি, সেখানে নিজ চোখেই এই রকম একটা ভাব লক্ষ্য করেছি। কিন্তু এর ফলাফল কী দাঁড়াবে? তারা এমন সব অস্ত্রশস্ত্র সংগে নিয়ে যাবে, যা গ্রামের চৌকিদারদেরও উপযুক্ত নয়। তাদের নেই কোন ট্রেনিং, নেই কোন প্রস্তুতি। আমার মতে এইভাবে ইহুদীদের সাথে যুদ্ধ করতে যাওয়া স্রেফ আত্মহত্যার নামান্তর।

তখন আমার মনে হলো অগণিত ছাত্র–জনতার কথা, যারা আবেগ আর উত্তেজনার অগ্নিশিখায় পরিণত হয়েছে। আরও মনে পড়লো তানতা নতুন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র নেতা সাঈদ হাফেজের কথা। তানতা থেকে সে সম্মেলনে এসেছে তার বিদ্যালয়ের ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে। আমি চিন্তা করতে লাগলাম– আমার চাচা যা বর্ণনা করলেন, সে লজ্জাজনক সত্য প্রকাশ পেলে যুবকদের অন্তরের এ প্রবল শক্তির পরিণতি কী দাঁড়াবে? তারা কি সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করবে, বাদশাহ, নেতৃবর্গ ও সাম্রাজ্যবাদীরা জাতীয় আশা–আকাংখার বিরুদ্ধে এক ঐক্যবদ্ধ শক্তি?

আমার অন্যমনস্কতা দূর করে বললাম– চাচা, যখন ব্যাপারটি এই রকম, তখন আমাদের বিদ্রোহ করাই উচিত। বিদ্রোহ করবো সর্বশক্তি দিয়ে ফিলিস্তীনের জন্য, মিসর, ইরাক ও অন্যান্য আরব দেশের জন্য। সবাই তো ষড়যন্ত্রের বলি। সুতরাং বিদ্রোহ করবো

ইংরেজদের বিরুদ্ধে এবং আমাদের মধ্য থেকে যারা তাদের সাথে হাত মিলিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে।

–সে তো এক বিরাট ব্যাপার। দীর্ঘ ও কন্টকাকীর্ণ পথ। দুই এক দিনে শেষ হলে কতই না ভালো হতো।

–চাচা, তাহলে তো ফিলিস্তীন শেষ হয়ে যাবে। আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম এর পরিণতি ভোগ করবে। অথবা বলতে পারেন আগামী প্রজন্মের সামনে রয়েছে লাঞ্ছনা ও অপমান।

–কে জানে? হতে পারে বিধাতা অন্য কোন পথও নির্ধারণ করে থাকতে পারেন।

যাই হোক, জাতির এ মনোবল ও উৎসাহ–উদ্দীপনা একান্তই প্রয়োজন। যত বিপদের সম্ভাবনাই থাকুক না কেন, সশস্ত্র বাহিনীর ফিলিস্তীনে প্রবেশের যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনি আছে এ আন্দোলন ও সচেতনতার। এর সবকিছুই অভিজ্ঞতা ও সংগ্রাম। অবশ্যই এর গভীরে প্রবেশ করতে হবে।

সশস্ত্র বাহিনী ফিলিস্তীনে প্রবেশ করেছে। একের পর এক খবর আসছে। সামরিক অর্ডিন্যান্স জারি হলো। বীরত্ব ও জীবন উৎসর্গের কাহিনীতে পত্র–পত্রিকা ও সাময়িকীসমূহের পৃষ্ঠাগুলো ভরে গেল। আমি আমার চাচার বক্তব্য ও অবস্থার ব্যাখ্যা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়লাম। এই অকল্পনীয় বিজয়কে আমি কিভাবে ব্যাখ্যা করবো? ইংরেজ কেন আমাদের সামনে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালো না বা পেছন থেকে কেন আমাদের ছুরিকাঘাত করলো না?

ঠিক একই সময় একটি জিনিস আমাকে ব্যথিত ও রাগান্বিত করে তুললো। কায়রোর অবস্থা বা চেহারা দেখে মনে হলো না আমরা কোন ভয়াবহ যুদ্ধে লিপ্ত আছি। তবে শ্রমজীবী সাধারণ জনতা ছিল এর ব্যতিক্রম। তারাই শুধু সংবাদের সময় রেডিওর পাশে ভিড় জমাতো। তারা সংক্ষিপ্ত সামরিক ঘোষণা শুনতো। সাধারণত এসব ঘোষণা সেনাবাহিনীর নেতারাই নিজেদের তত্ত্বাবধানে রচনা করতো। সাধারণ জনতা এসব খবর ও ঘোষণা শুনে আল্লাহ্‌র শোকরগুজারী করত এবং বিজয়ের জন্য তাঁর হামদ–তাসবীহ পাঠ করতে করতে নিজ নিজ কাজে চলে যেত।

যুদ্ধ চলছিল ফিলিস্তীনে। কিন্তু কায়রো ছিল সম্পূর্ণ শান্ত ও চমৎকার নিরিবিলি। প্রেক্ষাগৃহসমূহ ছিল আলোকোজ্জ্বল, চিত্তবিনোদন, আনন্দ–ফূর্তি ও গল্প–গানের আসরগুলো ছিল নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে সরগরম। কল্যাণ সমিতির বৈঠক, অভিজাত নারী সমিতির

সভা ও মন্ত্রী–মিনিস্টারদের ভোজসভা কোন কিছুতেই ভাটা পড়েনি। আর তার খবরগুলো পত্র–পত্রিকায় যথারীতিই স্থান পাচ্ছিল।

তা সত্ত্বেও যুদ্ধের খবরগুলো ছিল আমার চোখের জন্য প্রশান্তিস্বরূপ। সেগুলো আমার আকাংখা ও অহংবোধকে তুষ্ট করছিল। আমার কণ্ঠস্বরে একটু আনন্দ ও বিজয়ের গর্ব ফুটিয়ে তুলে চাচাকে বললাম–

এই যে ক্রমাগত বিজয় এটা কি আপনি লক্ষ্য করেছেন? এ ব্যাপারে আপনি কি বলবেন? ইংরেজরা তো এখন কোন কথা বলছে না, মোটেই নড়াচড়া করছে না, একদম চুপচাপ। তারা এখন ভীরু চোখে আমাদের মহান প্রতিরোধের দিকে মিটমিট করে তাকাচ্ছে। অবনত মস্তকে আমাদের এ বিজয় মেনে নেয়া ছাড়া তাদের আর কোন উপায় নেই।

–সুলায়মান, আমি কি আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর বিজয় অপছন্দ করি? আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন।

–তা কখ্খনো না, চাচা! আমার উদ্দেশ্য তা নয়। আমি বলতে চাচ্ছি, উপনিবেশবাদীরা অনেক সময় জাতির আশা–আকাংখার সামনে মাথা নত করে দেয়। এখন ইংরেজরা আর কী করবে? সমগ্র জাতি বিক্ষুব্ধ, বিদ্রোহী, সেনাবাহিনীও সামনে এগিয়ে চলেছে। অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের স্বেচ্ছা–সৈনিকরা সেনাবাহিনীর জওয়ানদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে।

–সুলায়মান, শত শত মৃত ও আহত সৈনিকদের নিয়ে যে ট্রেনগুলো রাতের অন্ধকারে কায়রো পৌছাচ্ছে, সে সম্পর্কে তুমি কিছুই জান না। ব্যাপারটি এত সোজা না। মুখে দিলাম আর গিলে ফেললাম তা নয়। এর নাম হচ্ছে যুদ্ধ। কি, তুমি আমার সাথে একমত নও?

–অবশ্যই একমত। তবে যুদ্ধে বহু জীবন চলে যায়। তাতে বিচলিত ও হতাশ হওয়ার কিছু নেই। আমরা গভীর ঘুমে নিমগ্ন থাকলে আমাদের আশা –আকাংখা কখ্খনো বাস্তবে রূপ লাভ করবে না।

–যাই হোক, বিষয়টি এখন জাতিসংঘের সামনে। বিশ্বের চতুর্দিক থেকে সন্ধি–চুক্তির দাবী উত্থাপিত হচ্ছে। আর এই ছিদ্রপথে অর্থাৎ চুক্তির সুযোগে উপনিবেশবাদীদের খেল শুরু হবে। ইংরেজ তার ভূমিকা পূর্ণরূপে পালন করবে।

–কেমন করে?

–সন্ধিচুক্তি যদি হয়, সম্পাদিত হবে কিছুদিনের জন্য। এই সুযোগে ইসরাইলকে অস্ত্রসজ্জিত করা হবে, আর আরব দেশসমূহের অভ্যন্তরে ভেদাভেদের বীজ বপন করা হবে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমাদের মাঝে প্রবেশের পর থেকে এমনটি ঘটে আসছে।

–চাচা, বিষয়টি আপনি সহজভাবে নিন। আপনার কথায় আমি কষ্ট পাই। একটা ক্ষোভ এবং দুঃখে আমার অন্তর ভরে যায়।

–তোমার জন্য উত্তম হবে সত্যকে সঠিকভাবে জানা এবং প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করা। যাতে মিথ্যার কাছে ধোকা না খাও এবং চোখ দু'টি বন্ধ করে না চলো। যদি এমনটি না করো, তাহলে একদিন তিক্ত সত্যের সাথে হোঁচট খেয়ে মারা যাবে।

–আমরা সন্ধি প্রত্যাখ্যান করবো, যাতে আপনি যে ষড়যন্ত্রের ভয় পাচ্ছেন, তা বাস্তবায়িত হতে না পারে।

–সন্ধি তোমাকে কবুল করতেই হবে। কারণ, তোমার রাজনীতিবিদরা তো তা কবুল করবেনই।

–জনগণ তাদের প্রতি শ্যেনদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে।

–তুমি একটা কল্পনাবিলাসী মানুষ। তুমি কি মনে কর জনগণ এখন সেই বিচার করবে ও তাদের মুখোমুখি হবে?

–অবশ্যই। তা না হলে জনগণের চাপের মুখে সেনাবাহিনী ফিলিস্তীনের দিকে কদম বাড়াতো না।

–বাজে কথা ছেড়ে দাও সুলায়মান! জনগণ শাসন পরিচালনা করে না। আজ যে সরকারকে তুমি দেখতে পাচ্ছ, তারা কি তোমার–আমার মতামত নিয়ে শাসন কাজ চালায়? যেহেতু সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ তথা জনগণের কোন প্রতিনিধি নেই। তাদের মানদন্ড হলো বাদশাহ ও ইংরেজের সন্তুষ্টি। জনগণের শাসনের কল্পকথা ছেড়ে দাও। ব্যক্তিগতভাবে আমি ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলগুলোকে একই মুদ্রার এপিঠ–ওপিঠ মনে করে থাকি। কারণ, ইংরেজ যতক্ষণ আমাদের মধ্যে আছে, তারা খুব কম ব্যাপারেই দ্বিমত পোষণ করতে সক্ষম হবে।

–চাচা, সম্মান ও লজ্জার কিছু ব্যাপার আছে, যা তাদেরকে এবারের মত অন্তত সন্ধি থেকে বিরত রাখবে। তাছাড়া এরা তো বিজয়ী। আর সাধারণত কলকাঠি থাকে বিজয়ীদের হাতেই।

–শান্তির নামে তারা সন্ধি মেনে নেবে। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ও নিরাপত্তার নামে তারা অস্ত্রও সংবরণ করবে। কিছু দিন যেতে না যেতেই ইসরাইল মাযলুম ও অত্যাচারিত রাষ্ট্রের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে বিশ্ব বিবেকের কাছে আবেদন জানাবে। আর তখন আরবরা হবে জবরদখলকারী শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকিস্বরূপ, যারা আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের প্রস্তাবের কোন তোয়াক্কা করে না।

–মুসীবত!

–না, শুধু মুসীবত নয়, বড় মুসীবত।

১৪

সে যখন আমাদের বাড়ীতে প্রবেশ করলো, গায়ে ছিল তার মনোলোভা লাল জ্যাকেটটি। ডানে–বাঁয়ে সে তাকালো, কিন্তু আমাকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেল না। আমি আস্তে করে আমার কামরায় ঢুকে পড়ার চেষ্টা করলাম।

সে আমার দিকে ইশারা করে বললো– এই শুনুন তো, কি নাম যেন আপনার?

–সুলায়মান।

–আমার নাম 'সুরাইয়া'। কোন্ স্কুলে আছেন আপনি?

–খিদীব ইসমাইল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, মাধ্যমিক চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি।

–আর আমি বালিকা উচ্চ মাধ্যমিকে, দ্বিতীয় শ্রেণীতে থার্ড সেকশনে আছি।

–আহলান ওয়া সাহলান। স্বাগতম।

আমার মনে হলো মেয়েটি বেশ খোলামেলা ও সাহসী। তার এ খোলামেলা ও নির্ভীক ভাব দীর্ঘদিন যাবত আমার মানসিক পেরেশানি ও দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছিল। সে এমন সব প্রশ্নের উত্তর দিত, যা আমি তার কাছে করিনি। সুরাইয়ার সাথে আমার পরিচয়ের সূচনা এভাবে।

তাদের বাড়ীটি ছিল আমাদের বাড়ীর সামনা–সামনি। বড় সড়কের ওপর ঝুঁকে যাওয়া আমার কামরায় বসে বসে অনেক বারই তাকে দেখেছি। জানালার ধারে এসে বিদ্যুতের ন্যায় একটু দেখা দিয়েই আবার সে হারিয়ে যেত।

আমার ও তার মাঝে কোন সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টাই করিনি। আমার চাচা এক জীবন্ত দৃষ্টান্ত। প্রেমের অন্ধ আবেগ, যৌবনের অহমিকা ও নেশার আসক্তির কারণে অবর্ণনীয় দুঃখ–কষ্ট তিনি ভোগ করেছেন। তাছাড়া শহরের মেয়ে বলতে তখন বুঝতাম, বেহায়া, লম্পট ও চরিত্রহীনা।

মনে মনে বলতাম, 'তারা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, সিনেমা–থিয়েটার দেখতে যায়, কুৎসিতভাবে ন্যাংটা হয়ে ঢলাঢলি করে, গান গায়। এটা আমার কাছে ধ্বংস ও মৃত্যুর সমান।'

আমি আমার বিবেকের ওপর সম্পূর্ণরূপে বিজয়ী ছিলাম। তবুও তার সম্পর্কে, তার

সদা হাস্যোজ্জ্বল সবুজ দু'টি চোখ, চমৎকার হালকা-পাতলা গড়ন, তার চলন- বলন ও গতিবিধি নিয়ে অনেক কিছুই ভাবতাম। স্বীকার করি, চুপে চুপে তাকে এক নজর দেখার জন্য গোপনে দৃষ্টি ঘোরাতাম। তাছাড়া আমার ও তার স্কুলে যাওয়ার পথটি ছিল একই। এ কারণে অনেক সময় তাকে স্কুলে যেতে বা আসতে পথে সামনা-সামনি দেখে ফেলতাম। দ্রুত এক নজরে তাকে দেখে নিতাম, যেন অনিচ্ছাকৃত নজরটি পড়ে গেছে এমনভাবে। তারপর রাস্তা দিয়ে এমনভাবে হেঁটে যেতাম যেন আমার কোন কিছুই যায়-আসেনি। তা সত্ত্বেও যেতে যেতে অনুভব করতাম, আমি যেন অদৃশ্য কোন ঐন্দ্রজালিক রশিতে তার সাথে বাঁধা পড়ে গেছি। তাকে নিয়ে যে চিন্তা করতাম, সে চিন্তার কোন সীমা-পরিসীমা ছিল না।

আমি মনে মনে যে ছক এঁকে নিয়েছিলাম, তা অতিক্রম না করেই কয়েক মাস কেটে গেল। সুরাইয়া এ সময় আমাদের বাড়ীতে আসতো। চাচীর কাছে সেলাই ও এমব্রয়োডারীর কাজ শিখতো। এগুলো আবার তার স্কুলের পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুরাইয়া আমাদের বাড়ীতে এলে আমি চাচার ঘর থেকে বের হয়ে আস্তে করে নিজের ঘরে ঢুকে যেতাম, যেমনটি সব সময় করতাম বাড়ীতে কোন মেয়ে অতিথি এলে। কিন্তু এবার যখন সুরাইয়ার সাথে সাক্ষাত হয়, চাচী তখন বাড়ীতে নেই। এবার তার সম্পর্কে আমার চিন্তা আরও কয়েকগুণ বেড়ে গেল। আমার সময়ের একটি বিরাট অংশ সে অধিকার করে নিল।

সে আমার ও আমার স্কুলের নাম জিজ্ঞেস করলো। আগেই তো সে একদিন প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এ কথা জেনেছিল। আর আমিও তো তার সম্পর্কে ততটুকু জানি যতটুকু সে জানিয়েছিল। কারণ, তার এ আসা-যাওয়া আমাদের দু'জনের কাছে একেবারে অপরিচিত নয়। মনে হলো, সে অপেক্ষা করছে আমার পক্ষ থেকে প্রথম পদক্ষেপের। অনেকক্ষণ সে অপেক্ষা করলো। সম্ভবত আমার ওপর সে চটে গেল, আমার ভীরুতা, নির্বুদ্ধিতা ও মাত্রাতিরিক্ত জড়তার জন্য অভিশাপ দিল। সে রাস্তায় এক কদম যেতে না যেতেই অর্থবোধক একটা শিস, গযলের একটি কলি যেন শুনতে পেল।

সম্ভবত সে বলল- হায়, বন্ধু চাষা, লেখাপড়া, পানাহার ছাড়া আর কিছুই তুমি ভালোবাসো না।

পরের দিন চাচী আমার কামরায় ঢুকে বললেন- এই কাগজখানি ধর সুলায়মান।

-ওতে কি?

-একটি অংক। সমাধানটি তুমি কাগজের অপর পৃষ্ঠায় লিখে দাও।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, অংক? কার এ কাগজ?

–সুরাইয়া পাঠিয়েছে। তোমার সামনে যেতে সে লজ্জা পায়। আমি কত করে বললাম মেয়ে, সুলায়মান তোমার ভায়ের মত, কিন্তু সে এলো না।

কাগজখানি আমি সামনে রেখে গভীর দৃষ্টিতে তা দেখতে লাগলাম। এ দ্বারা সুরাইয়া কি ব্যক্ত করতে চায়? সত্যিই কি সে আমার সামনে আসতে লজ্জা পায়? গতকালও তো সে খোলামেলাভাবে সাহসের সাথে আমার সংগে কথা বলেছে? সে কি আমার মেধা যাচাই করতে চায়? এ অংক তো খুবই সহজ। সুরাইয়ার জন্য এক নজরের বেশী লাগার কথা না। সে এর সমাধান জানে না, তা বিশ্বাসই হয় না। যাই হোক, অপর পৃষ্ঠায় সমাধানটি লিখে পাঠিয়ে দিলেই সব ল্যাঠা চুকে যায়। এ বাজে চিন্তা থেকেও মুক্ত হয়ে যাব।

ইশার নামাযের প্রস্তুতি নিচ্ছি, এমন সময় চাচীকে বলতে শুনলাম– এসো এসো। বেটি এসো। তোমার ভাই সুলায়মান তো তোমার পর নয়। সুরাইয়া এসো। চাচী দরজা খুলে দিয়ে বললেন– সুরাইয়া সমাধানটি ভালোমত বুঝতে পারেনি। সমাধানটি যদি আবারও তাকে একটু ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে।

অত্যন্ত লাজ–নম্রভাবে হাঁটি হাঁটি করে সুরাইয়া আমার কামরায় এমনভাবে প্রবেশ করলো, তা দেখে মনে হয় গতকাল যখন সে আমার নাম, স্কুলের নাম জিজ্ঞেস করেছিল, তখনকার সেই ভূমিকার সাথে এর কোনই মিল নেই।

আমি কাগজ–কলম তুলে নিয়ে অত্যন্ত উৎসাহের সাথে ব্যাখ্যা করতে শুরু করলাম, আমার কথা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে শুনছে, এমন ভাব সুরাইয়া প্রকাশ করতে লাগলো এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে অনামিকা আংগুলের নখের আগা দাঁত দিয়ে এমনভাবে কামড়াতে লাগলো যেন এ কাজের মাধ্যমেই সে তার লজ্জা দূর করতে চায়।

অংকের সমাধান থেকে ধীরে ধীরে ফরাসী ভাষা, ইংরেজী গ্রামারের ব্যাখ্যা এবং জ্যামিতি অ্যালজাবরার সমাধান পর্যন্ত ব্যাপারটি গড়িয়ে গেল।

পড়া বুঝে নিয়ে সংক্ষিপ্ত সাক্ষাত শেষ করে, আমার ঘর থেকে বের হতে হতে এক টুকরো হাসি ছড়িয়ে দিয়ে সুরাইয়া যখন আমার কাছ থেকে বিদায় নিত, সে দৃশ্যটি হতো আমার কাছে অতি মনোরম। প্রতিটি সাক্ষাতের পরেই সৌভাগ্য ও আনন্দের সাগরে আমি হাবুডুবু খেতাম। জানালা দিয়ে হাত ইশারায় সে আমাকে ডাকতো। তাছাড়া স্কুলে যাওয়ার পথে তার পাশাপাশি হেঁটে যাওয়া প্রায় আমার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। আমার সাহস এত বেড়ে গিয়েছিল যে, দ্রুত হেঁটে তাঁর পাশে গিয়ে তাঁকে প্রাতকালীন শুভেচ্ছা জানাতেও ভয় হতো না। তারপর খুশিতে বাগবাগ হয়ে নিজের পথে হেঁটে চলে যেতাম।

এখন আমি একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। সুন্দরী সুরাইয়া আমাকে হাসি উপহার দেয়, আমাকে ভালোবাসে। আমাকে দেখে তার সমগ্র সত্তা আনন্দে নেচে ওঠে, কথা বলে।

আমাদের দু'জনের মধ্যে অংকের সমাধানই সব কিছু নয়। হাঁ, আমি তার দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। আমার মধ্যে এমন কিছু আছে, যা তাকে আমার প্রতি আকৃষ্ট করে। সে যখন স্কুলে যায়, তখন যে ছেলেরা তার পথ রোধ করে দাঁড়ায়, তাকে অনেক প্রশংসাসূচক কথা শোনায়, হতে পারে তারা আমার থেকে একটু লম্বা, মোটাসোটা এবং দেখতেও একটু সুন্দর। কিন্তু এই তো সব কিছু নয়। তারপর আমি নিজের মনে একটু দুঃখ অনুভব করে বললাম– এ কথা ঠিক, পরিপূর্ণ সত্তা একমাত্র আল্লাহ। আমার নাকটা যদি সামান্য একটু ছোট হতো, তাহলে কতই না ভালো হতো! আমার চোখ দুটিও অপেক্ষাকৃত ছোট। কিন্তু একটা কালো চশমা পরে তো এই ক্ষুদ্রতা আমি ঢাকতে পারি। তাতে কিছু সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পাবে। আর জুতো? না, না, মোটেই চকচক করে না। এভাবে ধূলামলিন অবস্থায় পরা উচিত না। আমাদের গ্রাম দেশে চলতে পারে। কিন্তু কায়রো, তুলুনী স্ট্রীটে যেখানে সুরাইয়া আছে, সেখানে মোটেই শোভা পায় না। তাছাড়া, পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতাও তো ঈমানের অঙ্গ। হাতে করে আর কতকাল এভাবে বই–খাতাপত্র বহন করবো? একটি চমৎকার চামড়ার ব্যাগ আমার থাকা উচিত, ঠিক যেমন ব্যাগে করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা বইপত্র বহন করে থাকে। আমি তো এখন আর ছোট নই। ঘাড়ের ফিতেটিও পাল্টানো দরকার। আর পাজামা দু'সপ্তাহের পরিবর্তে প্রতি সপ্তাহে একবার করে ইস্ত্রি করা দরকার।

এভাবে ধীরে ধীরে আমার জীবনধারার পরিবর্তন শুরু হলো।

খিদীব ইসমাঈল বিদ্যালয়ে ছিলাম প্রায় নিঃসংগ। কারণ এ অঙ্গনে আমার আগমন নতুন। তাছাড়া ছোটবেলা থেকেই আমি একটু নিরিবিলি ও নিঃসংগতা ভালোবাসি। তবে, এখন আমি একটি ফুটবল লীগের সাথে যোগাযোগ করে তাতে নাম লিখিয়েছি। বহু লোকের সাথে আমার পরিচয় হয়েছে। এ বন্ধুরা তাদের প্রেম ও ভালোবাসার মুখরোচক কাহিনী এবং যেসব চিঠিপত্র তারা লেখালেখি করতো, সে সম্পর্কে আলোচনা করতো। একদিন আমি দারুণ সংকটে পড়ে গেলাম। আমাকে তাদের আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেই হবে। কিছু ব্যক্তিগত গোপন কথা তাদেরকে বলতে হবে। নইলে তারা ধারণা করবে আমি একজন সাদামাঠা চাষা, কায়রো এবং কায়রোর সভ্য জীবনযাত্রা সম্পর্কে কিছুই জানিনে। আমি আমার সকল শক্তি ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করলাম। তবুও হৃৎপিন্ড ধিকধিক করতে লাগলো, হাত–পায়ের আংগুল কাঁপতে শুরু করলো। এমন অবস্থায় তাদেরকে বলতে আরম্ভ করলামঃ

–আজ তাকে অনুসরণ করেছিলাম। তখন সে স্কুলে আসছিলো। সারা রাত বসে বসে এ পরিকল্পনা করেছিলাম। হঠাৎ তার কাছে পৌঁছে গিয়ে তাকে বললামঃ

–সাবাহাল খায়ের–সুপ্রভাত! এতটুকু বলে বোকার মত হাতে হাত ঘষতে লাগলাম।

আমার সংগী ফাখরী জিজ্ঞেস করলো,

–তারপর কি ঘটলো?

–কিছু না।

বন্ধুরা সবাই একযোগে হো হো করে হেসে উঠলো। অনেকক্ষণ ধরে তারা হাসলো। তাদের একজন বিদ্রূপ করে বলল– সুলায়মান, তুমি দেখছি দারুণ সাহসী!

আর একজন বলল– ওহে কী চমৎকার প্রেম নিবেদন!

শেষের জন বলল– সুলায়মান, তুমি একজন দারুণ ভালো মানুষ। সারা রাত চিন্তা করে ছক আঁকলে, তারপর সাহসে ভর করে তার কাছে উপস্থিত হলে কি শুধুমাত্র একটি কথা– সাবাহাল খায়ের বলার জন্য?

–ওহে বীর পুরুষ! আমি তো মনে করেছিলাম তোমার দু'টি সবল বাহু দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরেছো এবং চুমুতে চুমুতে তাকে ভরে তুলেছো।

বিস্ময়ের সাথে বললাম– চুমু! তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?

তারা সবাই আবার এক সাথে হো হো করে হাসতে হাসতে ঠাট্টা শুরু করে দিল। নাটকীয় ভঙ্গিতে ফাখরী তার হাতটি বাড়িয়ে দিয়ে আমার মুখমন্ডলের ওপর বুলিয়ে নিল। তারপর সে হাতখানি নিজের মুখে বুলিয়ে নিয়ে বলতে লাগলো,

–হে আল্লাহ, শায়খ সুলায়মান বিন আবদিদ দায়িমের মাধ্যমে আমাদের বরকত দান করুন। তারপর সে বলল, তুমি তো একজন পাক্কা দরবেশ দেখছি।

দ্বিতীয় বন্ধুটি বলল,

–ওহে সুলায়মান, প্রেম হচ্ছে এক নিগূঢ় শিল্পকর্ম এবং একই সাথে সুন্দরও। এই পবিত্র পদ্ধতি এ অবাস্তব কল্পনা প্রেমের জগতে মূল্যহীন। জনাব শায়খজী, চুমু ছাড়া প্রেম হয় না। আর শুধুমাত্র 'সাবাহাল খায়ের' পদ্ধতির প্রেম, তামাশা ও সময়ের অপচয় ছাড়া কিছুই না। মনে রেখ, তুমি বিংশ শতকের মানুষ।

আমি অনুভব করলাম, আমার কপাল থেকে ফোঁটা ফোঁটা ঠান্ডা ঘাম ঝরে পড়ছে। একটা বিহবল ভাব যেন চতুর্দিক থেকে আমাকে ঘিরে ফেলছে। নিজকে জিজ্ঞেস করলামঃ বিংশ শতকে প্রেমের জন্য এ পদ্ধতি, যেমনটি তারা ধারণা করছে, তা কি অপরিহার্য এবং সভ্যতা ও শহুরে জীবনের নিদর্শনসমূহের এটা কি একটি?

সুরাইয়ার পিতা ছিলেন খলীফার রেশন বিভাগের এক ছোট চাকুরে। মাথার চুলে তার

পাক ধরেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সনদ ছাড়া তাঁর আর কোন ডিগ্রী নেই। তার মাও ছিলেন স্বামীর মত একটি নিম্নবিত্ত পরিবারের। সুরাইয়া ছাড়া তাদের আর কোন সন্তান হয়নি। এ কারণে সুরাইয়া বড় আদুরে। তার কোন চাওয়া অপূরণ থাকে না। সেই শিশু অবস্থা থেকে বর্তমান সময় অর্থাৎ তার ষোল বছর বয়স পর্যন্ত তার কোন প্রয়োজন বেধে থাকেনি।

আমাদের বাড়ীটি ছিল দু'কামরা বিশিষ্ট। একটি আমার ও অন্যটি চাচা-চাচীর। আমার কামরায় একটি সাদামাঠা বিছানা, বালিশের পেছনে প্রায় ঘেঁষাঘেঁষি করে রাখা একটি কাঠের চেয়ার, কাপড়-চোপড় ও বই-পুস্তকের জন্য ছোট্ট একটি আলমারী। জানালায় একটি ধাতব শাটার, তাতে কিছু কারুকাজও করা।

'কিলয়াতুল কাবাশ' প্রাচীন জাতীয় মহল্লাগুলোর একটি। এখানকার বাড়ীঘরগুলো বড় বড় পাথরের তৈরী। দিবা-রাত্রি এখানে শোরগোল ও হৈ-হাঙ্গামা চলতে থাকে, যা আমার জন্য ভীষণ বিরক্তিকর। এত কিছু সত্ত্বেও এখানে আমি কিছুটা শান্তি ও স্থিরতা অনুভব করেছিলাম। সারা বছর আমি আব্বা ও আমার শৈশব-কৈশোরের বন্ধু সাঈদ হাফেজকে কোন চিঠি লিখিনি।

সেই রাতে ফাখরী ও আমার অন্য বন্ধুরা আমার প্রেমকাহিনীর ওপর যে ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করেছিল, সে সম্পর্কে ভাবতে বসলাম। আমার মনে হলো, আমি দারুণ ভীতু ও দুর্বল।

একথা সত্যি, পড়াশোনায় আমার ভালো রকমের মেধা আছে, নিয়মানুবর্তিতা আছে এবং আমি তাদের ধারণা মত চরিত্রবানও। কিন্তু বুঝা গেল পূর্ণ পৌরুষ হচ্ছে প্রেম করায়। ফাখরী প্রেম বলতে যা বুঝেছে আমি সেই রকম প্রেমই করবো।

হাত থেকে আমি বই-পুস্তক ছুঁড়ে ফেল্লাম এবং কভারবিহীন আলগা বালিশ, খাট ও খোলা আলমিরার দিকে বার বার তাকাতে লাগলাম। তারপর হাত দিয়ে বালিশে থাপ্পড় মেরে বলে উঠলাম,

-আরে ব্যাপারটি খুবই সামান্য। যদি আমি ফাখরী ও তার সংগী-সাথীদের বলতাম, তাকে নিরানব্বই বার চুমু দিয়েছি, নিরিবিলিতে বসে গল্পসল্প করেছি এবং একজন অন্যজনকে প্রেম-সুধা পান করিয়েছি, তাতে আমার কী হতো? তবে তা হতো নির্জলা মিথ্যা। আমি হয়তো তাদেরকে ধোকা দিতে পারতাম; কিন্তু নিজেকে তো ধোকা দিতে পারতাম না। তাতে আরও ছোট ও তুচ্ছ হয়ে যেতাম। তাহলে কী করতে পারি? এদিকে তারা আমাকে তিক্ত-বিরক্ত করে ছাড়ে এবং তারা ধারণা করে আমি একজন অসম্পূর্ণ পুরুষ, প্রেম ও তার দুঃসাহসিক অভিযান সম্পর্কে কিছুই জানিনে। আমাকে অবশ্যই এ

মিথ্যার হাত থেকে বাঁচতে হবে এবং বিষয়টির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে ছাড়তে হবে।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে আপন মনেই আবার বলতে লাগলাম, এ কোন্ ধরনের পরিবর্তন, যা আমাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে ফেলেছে? তানৃতায় আমি যেমন চলতাম, তেমনভাবে কেন আমি চলি না? আমি এই দুঃসাহসিক প্রেম অভিযানের মিথ্যা গল্প–কাহিনী রচনায় অযথা সময় নষ্ট করার মাথা ব্যথা থেকে দূরে থাকি না কেন?

আমার মাথার মধ্যে এক সময় একটি শয়তানী চিন্তা গজালো।

–আমি একজন যুবক। আমার আছে আবেগ–অনুভূতি, হৃদয় ও হৃদয়ের ব্যথা–বেদনা। হৃদয়ে কোন ব্যথা–বেদনা চাপা থাকলে অনেক সময় তা মানসিক এবং আরও বহু মারাত্মক রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়–ব্যাপারটি কিছু সাময়িকীতে পড়েছি। মনের বিরুদ্ধে না হয় এমন একটা সুষ্ঠু ভিত্তির ওপর সুরাইয়ার সাথে আমার সম্পর্কের পরিধি বিস্তার করি না কেন? কে জানে, আমি তো তাকে বিয়েও করতে পারি। পেছনে সটকে পড়ার চেয়ে এটাই উত্তম এবং মিথ্যা রচনার চেয়ে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। তাছাড়া আমার অহমিকা ও লালসার জন্যও সন্তুষ্টিজনক। কিন্তু এ তো অবৈধ কাজ। আর মেয়েরা তো শয়তানেরই চেলা। আর 'সুষ্ঠু ভিত্তির ওপর সম্পর্ক' বাক্যটি তো ইলাস্টিকের মত, যত টানবে তত লম্বা হবে। হয়তো আমাকে অধপতনের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে অথবা আমার পড়ালেখায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে। তখন হয়তো আমার চাচার মত হয়ে যাব, যিনি আজ পিঠে করে গৃহনির্মাণ উপকরণ বহন করেন বা মাথায় করে রুটি বিক্রি করে বেড়ান। কিন্তু.....কিন্তু আমি মনে হয় একটু বেশী চিন্তা করে ফেলছি। প্রেম পড়ালেখায় বিঘ্ন সৃষ্টি করতে বা আমার সময়েরও বেশী অপচয় করতে পারবে না। বরং তা দ্বারা একটি প্রাকৃতিক কর্তব্য, যা মায়ের পেট থেকে নিয়ে এসেছি এবং যার ওপর বিশ্ব চরাচর দাঁড়িয়ে আছে ও জীবনধারা অব্যাহত রয়েছে, পালন করতে পারবো। পৃথিবীতে বহু সফল ব্যক্তি আছেন, যাদের সফলতার পেছনে অবদান রেখেছে এই নারী।

বেশী চিন্তা করার কারণে মাথার মধ্যে চক্কর দিতে লাগলো, মাথায় ভীষণ ব্যথা অনুভব করতে লাগলাম। অতপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললাম,

–আসতাগফিরুল্লাহ, নাউযুবিল্লাহ। মনে হচ্ছে, আগুনের মত রোদে কর্মরত আমার আব্বা ও অসুস্থ মায়ের কথা ভুলে গেছি। ভুলে গেছি আমাদের বাড়ীটির কথা, যা শূন্য হয়ে পড়েছে সকল কৃষি উপকরণ থেকে। এমনকি গরু–বাছুর, লাঙ্গল–মই পর্যন্ত। আর আমি এখানে বসে বসে মাথা ঘামাচ্ছি প্রেম ও প্রেমের রোমান্টিকতা নিয়ে? আমার ঘাড়ের শয়তানটির ওপর আল্লাহর লা'নত।

বই নিয়ে পড়তে বসে একটি বাক্যও ইয়াদ করতে পারলাম না। কারণ, সুরাইয়ার

ছবি যেন পুস্তকের লাইনের ওপর নাচানাচি করছে। আমাকে আবার মধুর কল্পনার জগতে টেনে নিয়ে গেল। ফাখরীর ব্যঙ্গ–বিদ্রূপ যেন কানে ভেসে আসছে। আমাকে ব্যথিত করে তুলছে এবং আত্মমর্যাদাবোধকে দারুণভাবে আহত করছে। মনে পড়লো কয়েক দিন পরেই একটি জাতীয় উৎসব হতে যাচ্ছে। আমার কল্পনার সামনে ভেসে উঠলো অনেক উজ্জ্বল ধারাবাহিক চিত্র। যুবক–যুবতীরা জোড়ায় জোড়ায় 'উরমান' উদ্যানে গাছের ছায়ায় হাঁটছে, 'আন্দালুস' উদ্যানের সড়কগুলোতে ঈদের খুশি উপভোগ করছে অথবা 'কামরুন নীল' ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিকেলের বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করছে, আর ঈর্ষাপূর্ণ দৃষ্টিতে মানুষ তাদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। তাহলে আমি ও সুরাইয়া এমন হতে পারি না কেন? কতই না আনন্দের হতো, যদি ফাখরী ও তার বন্ধুরা আমাদের দু'জনকে এ অবস্থায় দেখতো! তারা নিশ্চয় মনে মনে আমাকে দারুণ সমীহ করতো এবং জানতে পেত আমি কে? আমি যে সাদামাঠা একজন দরবেশ বা নির্বোধ ভীরু চাষা নই, তাও তারা বুঝতে পারত।

ভাবনাটি আমার কাছে ভালো ও সহজসাধ্য মনে হলো। ফাখরী যেসব কথা বলে যেমন– চুম্বন এবং এই রকম যত সব বালা–মুসীবত, তা থেকে এ ভাবনাটি কম বিপজ্জনক। সুরাইয়া এতে অমত করবে না। আমার সাথে বেড়ানোর কথা শুনলে সে খুশিই হবে। এ ঈদেই তাকে সংগে করে বেড়িয়ে আনন্দ উপভোগ করতে হবে। তার বৃদ্ধ বাবা বা মা, যিনি ঘর থেকে খুব কমই বের হন, এই দিনে তার সাথে 'উরমান' বা 'আন্দালুস' উদ্যানে বেড়াতে যাবেন তা হতেই পারে না। ভাবনাটি চমৎকার। কিন্তু এ ধরনের কাজের কোন অভিজ্ঞতা আমার জীবনে নেই। খুব সাজিয়ে–গুছিয়ে নিজের বক্তব্য তার সামনে উপস্থাপন করবো। কখ্খনো তাকে চুমু দেয়া কিংবা ঐ রকম কোন বিরক্তিকর আচরণ তার সাথে করবো না। হয় সে আমার প্রতি দরদ দেখাবে, আমার কথা শুনবে, নয়তো আমার প্রতি তার ভীতির সৃষ্টি হবে এবং আমার সম্পর্কে তার সব আশা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

যা কিছুই হোক না কেন, আমি পরীক্ষা করবোই। জীবনটাই তো একটা পরীক্ষা। তাকে যেসব কথা বলবো তার বিষয়বস্তু ঠিক করার, যেসব জায়গায় বেড়াবো এবং যে হোটেলে দুপুরে এক সংগে আহার করবো, তা নির্বাচনের যথেষ্ট সময় পেয়ে যাব। সময় হলে একটা যুগল ছবিও আমরা তুলবো। এ ছবিটি একটা বড় প্রমাণ হিসেবে কাজ করবে। একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ, যা আমার পূর্বের অবস্থা পাল্টে দিয়ে সকলের প্রিয় পাত্রে পরিণত করবে। ফাখরী ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা আর কখ্খনো আমাকে বিদ্রূপ করতে পারবে না। বরং তখন আমিই তাদের প্রতি উপহাস ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকাবো। আমার এ নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা তখনই সফল হবে। এবার শুধু আমার সাহস সঞ্চার ও 'সাবাহাল খায়ের' বলারই

পরিকল্পনা হবে না, তার থেকেও মারাত্মক কিছু হবে। দেরী করার কোন কারণ নেই। এখনই তাকে চিঠি লিখতে বসছি। কাগজ–কলম কোথায়? না, এই বল পেন্সিল দিয়ে কাজ হবে না। না, এই খাতার কাগজ ছিঁড়ে লেখাও ঠিক হবে না। আমাকে অবশ্যই সুরুচির অধিকারী হতে হবে। সবুজ সুগন্ধ কাগজ ও মনোরম ঝর্ণা কলম চাই। তারপর লিখতে বসবো। এটাই এ মুহূর্তে আমার প্রধান কর্তব্য।

কিন্তু কী লিখবো?

আরবী রচনা ও সাহিত্যের পুস্তকসমূহের পৃষ্ঠা উল্টাতে শুরু করলাম। হয়তো এমন কোন কবি বা লেখককে পেয়ে যেতে পারি যার অবস্থা ছিল আমারই মত। সহসা আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম,

–চমৎকার! খলীফা মুসতাকফীর কন্যা অল্লাদা সম্পর্কে ইবন যায়দুনের কাসীদাটি তো দারুণ! তবে তার ভাবটি সুরাইয়ার জন্য একটু কঠিন হবে। তা হোক, একটু ব্যাখ্যা করে দিলেই সে বুঝতে পারবে।

বারবার কাসীদাটি আবৃত্তি করতে লাগলাম, কিন্তু আমার মনে হলো, অভিযোগ, ভর্ৎসনা, করুণা, প্রার্থনা ও অতীতের স্মৃতিচারণেই কাসীদাটি পরিপূর্ণ। তাতে 'উরমান', বা 'আন্দালুস' উদ্যান সম্পর্কে এবং তাকে সংগে করে সেদিন আমি যেখানে বেড়াতে যাব, সে সম্পর্কে একটি বাক্যও নেই। ইব্ন যায়দুনের অবস্থার সাথে আমার অবস্থার মিল খাচ্ছে না। দেখি একটু পরীক্ষা করে কবি শাওকীর কাসীদা। তাতো একেবারেই আধুনিক এবং ইব্ন যায়দুনের কাসীদা থেকে অপেক্ষাকৃত সহজ।

–আল্লাহ আকবার! কী দারুণ! শাওকী, সত্যি সত্যিই তুমি 'আমীরুশ শুয়ারা'–কবি সম্রাট! এক পলক দেখা, একটু হাসি, সালাম বিনিময়, কিছু কথা, কথা দেয়া, তারপর সাক্ষাত।' হাঁ, হাঁ, মিলে যাচ্ছে। আমরা তো দৃষ্টি, হাসি, সালাম ও সামান্য কিছু কথা বিনিময় করেছি। কথা দেয়া এবং তারপর সাক্ষাত ছাড়া আর অমিল কিছু নেই। শাওকী যেন আমার অবস্থার সঠিক চিত্রটিই তুলে ধরেছেন এবং আমার জন্য সেই পথটিই অঙ্কিত করেছেন, আমার ভাগ্য, আমার ফিতরাত আমাকে যার ওপর চালিত করেছে। তবে যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা মিলিত হতে যাচ্ছি, সেদিকে কোন ইঙ্গিত এ কাসীদায় নেই।

চিঠির শুরুতে একটা কবিতা, তারপর সামান্য কিছু গদ্য লিখলে এমন কোন ক্ষতি নেই। অনেক সময় সংক্ষেপেও ব্যাখ্যার কাজ হয়ে যায়।

কিন্তু সব কিছুর আগে চিঠিটি তার কাছে পৌছানোই বড় কথা। সত্যিই সে এক কঠিন সমস্যা। ধরা যাক, যখন কিছু বুঝবার জন্যে সে অংক বা ইংরেজীর বই আমার কাছে নিয়ে আসবে, তার মধ্যে কি ঢুকিয়ে দিতে পারি? কিন্তু সামনের মাত্র ক'দিনের মধ্যে যদি

সুরাইয়া না আসে, তাহলে তো সুযোগ হারিয়ে ফেলবো। আমার চাচী বা সুরাইয়ার বাবার হাতেও তো চিঠিটি পড়তে পারে। তাহলে সে তো এক সাংঘাতিক ব্যাপার হবে। আমি কি হাতে হাতেই তাকে দিতে পারিনে? না, এমনটি কখ্খনো সম্ভব নয়। আমার অত বুকের পাটা নেই। আমাদের বাড়ীতে তার ঘনঘন আসা-যাওয়া সত্ত্বেও তার সামনে গেলে এখনো আমার পা কাঁপে, বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটায়। এটাই আমার মস্তবড় ত্রুটি। এ জন্য আমার দুঃখও হয়। আমি কি পথে তার সামনে হাঁটতে হাঁটতে চিঠিটা ফেলে দেব, আর পেছন থেকে সে কুড়িয়ে নেবে এবং এভাবেই ব্যাপারটি চুকে যাবে? না, এভাবে হবে না। কেউ দেখে ফেললে লজ্জার সীমা থাকবে না। তাহলে আমার সামনে একটি মাত্র উপায় আছে। তা হলো, ডাকে স্কুলের ঠিকানায় তার নামে পাঠিয়ে দেয়া।

১৫

আমি একটি চিঠি পড়ছিলাম। সাঈদ হাফেজের কাছ থেকে এসেছে। সাঈদ বলেছে আমার প্রতি তার আবেগ-অনুভূতির কথা। স্কুলে সে যে বিক্ষোভ মিছিলের নেতৃত্ব দিয়েছে, সে কথাও সে বলেছে। আমাকে জানিয়েছে, ফিলিস্তীনে যুদ্ধরত মুজাহিদদের সাথে স্বেচ্ছা-সৈনিক হিসেবে যোগ দিতে সে স্থিরসংকল্প।

চিঠিটি পড়ছি, আমার চাচা ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলেন,

-সব ভালো, ইনশাআল্লাহ। তারপর তোমার কাছে আর কি কি খবর আছে?

-এটা সাঈদ হাফেজের চিঠি।

-এখনো সে স্কুলের ও বিক্ষোভের নেতা?

-শুধু তাই নয়, বরং ফিলিস্তীন যুদ্ধে সে স্বেচ্ছা-সৈনিক হিসেবে যেতে বদ্ধপরিকর। চাচা একটা বিষণ্ন হাসি দিয়ে বললেন,

-তাকে বলো, তার ঐ প্রচেষ্টা বৃথা যাবে।

-কিভাবে? সে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করতে চায়। আমার দৃষ্টিতে এতে কোন বাধা থাকতে পারে না।

-আজ আরব বিশ্বের সরকারগুলো যুদ্ধ বিরতি মেনে নিয়েছে। এক সপ্তাহের মধ্যেই যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাবে। আর তার অর্থ হচ্ছে ফিলিস্তীনের চির অবসান।

-আপনি যা বলছেন তা কি সত্যি?

–অবশ্যই। কি, তোমার কাছে আশ্চর্য মনে হচ্ছে?

–পূর্বে একাধিকবার চুক্তি ভঙ্গ করলেও শেষমেশ ইহুদীরাই জয়ী হলো।

–না, বরং বৃটেন ও আমেরিকার রাজনীতির জয় হলো।

–কী লজ্জা ও অপমান!

–সুলায়মান, কতবড় লজ্জা তা কি ভেবে দেখেছো? ছোট্ট একটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সাত সাতটি আরব দেশ।

–এ খবর আমাকে দারুণ ব্যথিত করেছে। আমার সব আশা–আকাংখা মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে।

–বিশ্বাস কর, আর সব জাতির মত আমরা দুর্বল নই। আমাদের প্রয়োজন শুধু এমন কিছু নিষ্ঠাবান নেতৃত্বের, যা আমাদের পথ দেখাবে, জনগণের অধিকারে বিশ্বাস রাখবে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের যাবতীয় প্রলোভন থেকে নিজেকে দূরে রাখবে।

–চাচা, জাতির মান–মর্যাদার প্রতি বুড়ো আংগুল দেখিয়ে যারা কেনা–বেচা করে, তাদের হাতে আমাদের নেতৃত্ব ছেড়ে দেয়াও তো অপরাধ।

–জাতীয় জীবনে এমন বহু সময় আসে, আবার তা চলে যায়। জাতি বহু কিছু দেখে, শেষে অনেক কষ্টও সহ্য করে, তারপরেই আসে স্বাধীনতা, আর সেই স্বাধীনতা আমরা দাঁতে পিষি, তার কোন কদর করি না। উপনিবেশবাদীদের কাছ থেকে তুমি কেমন আচরণ আশা কর?

–সবকিছু ধ্বংস করা, চূর্ণবিচূর্ণ করা ও নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করা ছাড়া তাদের কি আর কোন রাজনীতি নেই?

–হাঁ, তাই সত্য।

–কিন্তু কিসের ভিত্তিতে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি মেনে নিল, চাচা?

–অকেজো, ভোঁতা অস্ত্রশস্ত্রের ভিত্তিতে, যা যুদ্ধের ময়দানে সামনে এগুতে সাহায্য করে না, বরং পেছনের দিকে টেনে আনে। রাজ–প্রাসাদের আদেশের ভিত্তিতে। প্রাসাদ চায়, ফিলিস্তীনের মাটি থেকে নয়, কায়রো থেকেই হবে যুদ্ধের কমান্ড। আর সেই বিপর্যয়ের ভিত্তিতে যা সর্বত্র ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। আর এটাই প্রকৃত যুক্তি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তারা তা স্বীকার করে না। তারা মনে করে, শান্তির নামে এবং আন্তর্জাতিক আইন–কানুনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তারা সর্বশেষ চুক্তি মেনে নিয়েছে।

তিক্ত বাস্তবতার সাথে একটা দারুণ হোঁচট খেলাম। আপন মনে জিজ্ঞেস করতে লাগলাম, এ জাতির নিষ্ঠাবান সন্তানদের প্রাণদান এভাবে বৃথা যাবে? আমাদের নেতৃবৃন্দ রক্তলিপ্সু ঘাতকের দল। এ মৃত্যুর জন্য তারাই দায়ী। তারাই অপরাধী এ বলির জন্য।

তাদের রাজনীতির ভিত্তি হচ্ছে প্রতারণা ও চাতুর্য। অথচ তারা সত্যিকার বোকা ও নির্বোধ। আর এ দু'টি অবস্থা কোন সম্মান বয়ে আনতে পারে না; বরং ক্রোধোন্মত্ত করে তোলে। আর তাই শেষে দারুণ কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

–চাচা, আপনি সত্যিই বলেছেন, জাতীয়তাবাদের অর্থ অনেকাংশে আজ বিকৃত এবং তা থেকে খুব নিকৃষ্ট ফলই ফলেছে। তারপর সর্বাধিক নোংরা বাজারে তার তেজারতি হয়েছে। রাজনীতির অর্থ আজ মিথ্যা, অহমিকা ও যুলুম–উৎপীড়নে পর্যবসিত হয়েছে।

চাচাকে বললামঃ ফিলিস্তীনের অধিবাসী এবং তাদের সাথে যোগদানকারী স্বেচ্ছা–সৈনিকদের জিহাদ চালিয়ে যাবার অনুমতি এবং তাদের যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে আরব দেশগুলো সাহায্য করছে না কেন? তাহলে তো তখন এ যুদ্ধ বিরতি চুক্তি এক টুকরো কাগজের ওপর একটু কালির দাগে পরিণত হবে এবং আরব দেশের সরকারগুলোও দৃশ্যত আন্তর্জাতিক রীতিনীতি মেনে চলছে বলে মনে হবে।

চাচা বললেন–

–মিসরের প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর থেকেও ওপরে যিনি, তিনিও কখ্খনো একাজ করতে সাহসী হবেন না।

–কারণ?

–কারণ, বিষয়টি ইংরেজদের কাছে গোপন থাকবে না। আর তাতে তাঁদের মন্ত্রীত্বের পরিণতি ভাগ্যের হাতে চলে যাবে।

সুরাইয়ার আব্বা আমাদের সাথে দেখা করতে এলেন। তাঁকে আসতে দেখে আমার কলজে ঠান্ডা হয়ে গেল। আমি খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানালাম। তাঁর আগমনকে আমি বেশ গুরুত্ব সহকারে নিলাম। আদর–আপ্যায়নে স্পষ্টতই একটু বাড়াবাড়ি করতে লাগলাম। কয়েক মিনিট পর ভদ্রলোক আমার চাচাকে বললেন–

'আপনার সাথে একটু নিরিবিলিতে কথা বলতে চাই।' আধ ঘন্টা পর ভদ্রলোক আমাদের বাড়ী থেকে যখন বের হলেন, তখন তার চোখে–মুখে একটা অশান্তি ও দুশ্চিন্তার ছাপ। আমি টেবিলে বসলাম একটু পড়ালেখা করার জন্য। দম বন্ধ করা গরমের কারণে একটু জানালা খোলার ইচ্ছে হলো। আমার জানালা খুলতেই সামনা–সামনি জানালায় দাঁড়ানো সুরাইয়ার ওপর গিয়ে নজর পড়লো। মুহূর্তের মধ্যে অত্যন্ত রুক্ষভাবে সে পর্দা টেনে দিল। তার এ কাজের মধ্যে যে কিছুটা ঘৃণা ও রাগ ছিল, তা আমার দৃষ্টি এড়ালো না।

নানা রকম চিন্তা আমার মাথার মধ্যে চক্কর দিতে লাগলো। কী হতে পারে? সুরাইয়ার এখনকার এ আচরণ ও তার আব্বার আগমনের মধ্যে সম্পর্কটা কি? অনুভব করলাম কোন মহা বিপদ হয়তো ওপর থেকে আমার মাথায় এসে পড়েছে। কারণ, আমি খুবই হতভাগ্য। আমার জীবনের বহু আশাই ব্যর্থ হয়েছে।

মাথা থেকে সেই প্রতীক্ষিত আনন্দের চিত্রটি এখন দূর হয়ে গেছে, আর সেই স্থানটি দখল করেছে এক ধরনের কালো দুশ্চিন্তা এবং পীড়াদায়ক অশান্তি। অস্থিরতা ও অস্বস্তির মধ্য দিয়ে রাত কাটলো। নানা রকম ভাবনা ও অনুভূতি মাথার মধ্যে কিলবিল করতে লাগলো। সকালে তাড়াতাড়ি স্কুলের উদ্দেশে রওয়ানা দিলাম। পথে 'সাইয়্যেদা যয়নাব' ময়দানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম সুরাইয়ার আগমনের। তাকে সাদর সম্ভাষণ জানানোর মত যথেষ্ট সাহস এখন আমি অনুভব করছি। কারণ, তার এই নতুন আচরণ, গতকাল যে আলামত দেখতে পেয়েছি, আমার অন্তরে ব্যথার সঞ্চার করেছে। অনেক সময় এ ধরনের ব্যথা হতাশার জন্ম দেয়। আর এ হতাশাই মানুষের আকস্মিক বাহাদুরী ও বীরত্বের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। 'সাইয়্যেদা যয়নাব' ময়দানে আমার প্রতীক্ষা অযথা দীর্ঘ হয়ে গেল। বালিকা বিদ্যালয়ের দিকে গমনকারী মেয়েদের দিকে তাকাতে তাকাতে এবং তাদের মুখের দিকে গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে মাথা ধরে গেল। কিন্তু না, সে এলো না। এতে আমার অস্থিরতা আরও বেড়ে গেল। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ভাবতে লাগলাম। কিন্তু হায়! মনের বিক্ষিপ্ত চিন্তাসূত্রগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করা সহজসাধ্য ছিল না। মনে মনে বললাম, আমার আচরণে যদি সে রাগ করে থাকে, তাহলে তার অর্থ দাঁড়াবে, তাঁর মিষ্টি হাসি ও মধুর সম্ভাষণ থেকে আমার বঞ্চিত হওয়া। অংকের সমাধান এবং ইংরেজী–ফরাসী ভাষা বুঝিয়ে দেয়ার জন্য আর কখনও তাকে পাবো না। মনে হলো, আমার জীবনের মস্তবড় এক উপাদান এবং আনন্দ ও সৌভাগ্যের গুরুত্বপূর্ণ উৎসকে হারিয়ে ফেললাম। অনুভব করলাম আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করা প্রয়োজন, যাতে আমার প্রতি তিনি অনুগ্রহ করেন। সাইয়্যেদা যয়নাবের নামে ফাতেহা পাঠ করতেও ভুললাম না।

যখন আমার এ অবস্থা, তখন ফাখরী, আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। আমার দিকে সে এ কথা বলতে বলতে এগিয়ে এলো,

–কি হে সাইয়্যেদা ময়দানের রোমিও, এভাবে আর কতকাল দাঁড়িয়ে থাকবে? তবে, প্রথমে সাবাহাল খায়ের।

–সাবাহান নূর! কেমন আছো ফাখরী?

–আমার কথা ছেড়ে দাও। তোমাকে তো বেশ বিমর্ষ দেখাচ্ছে, তাই না? শোন, আমি বুঝেছি সে আজ আসেনি। এ কারণেই তুমি এত বিমর্ষ----হাঁ, হাঁ, আমার কথাই ঠিক।

সাথে সাথে প্রতিবাদের সুরে আমি বললাম,

–তুমি কী বলতে চাও? আমি তো কারুর জন্য প্রতীক্ষা করছিনে।

–তুমি আমাকে ধোকা দিতে চাও? গোপন করার কী আছে? শুনে রাখ, সে যদি তোমাকে কষ্ট দিয়ে থাকে, তাতে কি? সে ছাড়াও এখানে অসংখ্য মেয়ে আছে। এই সুন্দর হরিণীর দলটির প্রতি তাকিয়ে দেখ। তারা 'সানিয়্যা' বালিকা বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। তুমি তোমার হৃদয়কে একজনের সাথে বেঁধে রাখবে, আর সে তোমার ওপর উৎপীড়ন চালাবে, এ তো দারুণ যুলুম।

আজ কিন্তু কোন অ্যাডভেঞ্চার বা প্রেমের রোমাঞ্চকর কোন কাহিনী তৈরির ইচ্ছে আমার হলো না। এমন কিছু থেকে আমি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকলাম। মিথ্যা কাহিনী রচনার ব্যাপারে সম্পূর্ণ সংযমী হয়ে গেলাম। গতকাল যেখানে আমি বানোয়াট কাহিনী তৈরি করাটা আত্মতুষ্টি ও নিজের ত্রুটির পরিপূরক মনে করছিলাম, আজ তার সম্পূর্ণ উল্টা মনে হলো। আজ আমার মনে হলো চুপচাপ থাকা এবং আমার হত–বিহবল হৃদয়ে যে ভাবপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে, সে সম্পর্কে মুখ না খোলাই হবে আমার অহংকার ও পৌরুষ। স্কুলের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ফাখরী বললো,

–তুমি কি জান, আজ একটা বিরাট বিক্ষোভ মিছিল বের হবে, রাস্তা প্রদক্ষিণ করবে এবং ট্রাক চলাচল বন্ধ করে দেবে? পুলিশকে আজ আমরা একটা উচিত শিক্ষা দেব।

আমি বললাম, কেন?

তাকে এ প্রশ্নটি করলাম এবং এই প্রথম বারের মত এমন একটি কাজের জন্যেই দারুণ আগ্রহী হয়ে উঠলাম। আমি চাচ্ছিলাম আজ স্কুল থেকে অনুপস্থিত থেকে আমার বিক্ষিপ্ত মানসিক অবস্থাকে একটু শান্ত ও সুস্থ করে তুলি। আমার প্রশ্নের পিঠাপিঠই ফাখরী জিজ্ঞেস করে বসলো,

–কেন, তা তুমি জান না? সরকার ইহুদীদের সাথে শেষ বারের মত চুক্তি করেছে। কতবারই তো এ চুক্তি ভঙ্গ করা হয়েছে! এর অর্থ হচ্ছে সোজাসুজি ফিলিস্তীনের ধ্বংস।

–ট্রাম বন্ধ করা, গাড়ীতে আগুন লাগানো এবং পুলিশের ওপর ইট–পাথর নিক্ষেপ করে লাভ কি?

–তাহলে আমাদের অনুভূতি ও অসন্তোষ প্রকাশ করবো কিভাবে?

–ফাখরী, তুমি তোমার অবস্থায় থাক। তাদের কারো কাছে প্রেমপত্র লেখ অথবা ছোট্ট কোন গলিতে তাকে অনুসরণ করতে থাক। ফিলিস্তীনের চিন্তা ছেড়ে দাও। কারণ, পড়ালেখায় ফাঁকি দেয়া, সিনেমা দেখা এবং কোন মেয়ের সাথে দেখা করার ফন্দি–ফিকির ছাড়া আর কোন চিন্তা তো তুমি কর না।

–সুলায়মান, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর। আমার এসব প্রেম–অভিসার থেকেও বড় হলো আমার দেশ। সকালে আমি যখন পত্রিকা পড়ি, তখন মনে করি আমাদের বিক্ষোভ ও হরতাল করা উচিত। ঠিক একই সাথে ভালোবাসা ও প্রেয়সীর সাথে পালিয়ে যাবার জন্য জীবন দেয়াটাও আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। এতে ধারণা হয়, এ দু'টির মাঝে আমি সমতা বিধানের চেষ্টা করি।

ফাখরীর সাথে তর্কে লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছে আমার মোটেই ছিল না। আমি একটু চুপচাপ থাকতে চাচ্ছিলাম, যাতে আমার নার্ভগুলো সতেজ হয়ে উঠতে পারে এবং বিক্ষিপ্ত চিন্তাসূত্রগুলো স্বাভাবিক হয়ে যায়।

আজ বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হওয়া ছিল প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কারণ, যুদ্ধের অপচ্ছায়ার ভীতি দূর হয়ে শান্তি চুক্তির সংবাদে জনসাধারণ হয়ে উঠবে আনন্দে মাতোয়ারা। তবে জনগণ খুব শিগগিরই এ অসার ধারণা ও প্রোপাগান্ডার ধূম্রজাল ছিন্ন করে বের হয়ে আসবে। কারণ, জনগণের যে আশ্চর্য অনুভূতি আছে, তা দিয়েই তারা বিষয়টির সব গোপন রহস্য উদঘাটন করে ফেলবে। তখন ভাড়াটিয়া গলাবাজদের সব চেঁচামেচি বিফল হয়ে যাবে। আমার এ কথার সপক্ষে অন্য কোন প্রমাণ অবশ্য নেই। তবে সত্যি সত্যিই সেদিন আমাদের স্কুলসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বড় বড় বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

তখন সকাল দশটা। স্কুল থেকে ফিরছি। হঠাৎ সুরাইয়াকে দেখলাম, সে সবজি ভরা একটি ঝুড়ি হাতে করে 'দাহদুয়াইরা' স্ট্রীটের দিকে যাচ্ছে। আমি প্রায় পাগলের মত পেছন থেকে তার দিকে ছুটলাম। হাঁপাতে হাঁপাতে ডাক দিলাম,

–সুরাইয়া! একটি কথা শুনবে? মাত্র এক মিনিট!

সে মুখ ঘুরিয়ে পেছন দিকে তাকালো। আমাকে দেখেই তার দৃষ্টি কঠোর হয়ে গেল, তার চোখে–মুখে ক্রোধের ছাপ ফুটে উঠলো এবং একটা অবজ্ঞার চাহনি আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে সে আপন চলার পথে হাঁটতে শুরু করলো। একটু জোরে হেঁটে তার পাশে গেলাম এবং তাকে জিজ্ঞেস করলাম,

–কি হয়েছে? আশা করি অন্তত একটি কথায় হলেও জবাব দেবে।

–কি হয়েছে তা তুমি জান না? সুরাইয়া ঝাঁকের সাথে বললো।

–আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, আমি কিছুই জানিনে।

–গতকাল আমার আব্বা তোমাদের ওখানে যাননি?

–হাঁ, গিয়েছিলেন; কিন্তু তাঁর যাওয়ার সাথে আমাদের সম্পর্ক কি?

কিছুটা বিষণ্নতা ও রাগের সাথে আমার দিকে তাকিয়ে সে বললো,

–স্কুলের ঠিকানায় আমার নামে চিঠি পাঠাতে পারলে কেমন করে? কোন্ অধিকারে? স্কুল–সুপার ও বান্ধবীদের সামনে এভাবে তুমি আমাকে লজ্জা দিলে?

রাগে সে ফোঁস ফোঁস করতে লাগলো। তার দু'চোখে অশ্রুর ধারা বয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। সে বললো,

–তোমার কি জানা নেই, ছাত্রীদের সব চিঠিই সুপার খুলে পড়ে দেখেন?

তার ঐ কথা শোনার সাথে সাথে আমার অন্তরটি ছিঁড়ে পড়ার উপক্রম হলো। ভারসাম্য হারিয়ে আমি মাটিতে পড়ে যাই আর কি! টলতে টলতে আক্ষেপের সুরে নিচ গলায় বললাম,

–আল্লাহ্‌র কসম, এটা যে ঘটবে আমি তা মোটেই আন্দাজ করতে পারিনি।

একটা ব্যথা ও বিস্ময়ের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে সে বললো,

–এ তো একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। এ কথা বুঝার জন্য বিশেষ কোন প্রতিভার প্রয়োজন হয় না। ছাত্রীদের চিঠিপত্র সব সময় পরীক্ষা করা হয়।

–আমি খুবই দুঃখিত। এ সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না।

রাগের সাথে সে বললো, আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাও। আমাকে ও আমার পরিবারকে যে দুর্ভোগ ও লজ্জা দিয়েছ, তাই যথেষ্ট হয়েছে। দ্রুত যেতে যেতে সে বললো,

–তোমার মনের কথা আমাকে মুখে বললে কি হতো? চিঠি ছাড়া কি আর কোন পন্থা নেই? আমি আবারো তাকে ধরে ফেললাম। আমার কানকে যেন আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। বিড়বিড় করে বললাম,

–তাতে তোমাকে লজ্জা দেয়া হতো না? বিরক্তির সাথে সে বললো–

তোমার যে নির্বুদ্ধিতা তোমাকে আমার স্কুলের ঠিকানায় চিঠি পাঠাতে উদ্বুদ্ধ করেছে, আমি তার জন্যেই বেশী লজ্জা পেয়েছি।

আমি তাড়াতাড়ি করে জিজ্ঞেস করলাম,

–যদি মুখোমুখি কথাগুলো বলতাম, সাড়া দিতে?

–এখন আর এ প্রশ্নের কোন অর্থ হয় না। একটি কথা তোমার জানা থাকা দরকার যে, তোমার চিঠির কারণে অসদাচরণের দায়ে দু'সপ্তাহের জন্য আমাকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। একথা বলেই সে হাঁটতে শুরু করলো।

আমি লক্ষ্য করলাম তার দুগন্ড বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। আমি তাকে একাকী চলতে দিয়ে একটু আস্তে চলা শুরু করলাম। এখন থেকে আমাদের দু'জনের আর এক সাথে যাওয়া উচিত হবে না। অথবা অন্তত ঐ ঘটনার পরিণতি কি দাঁড়ায়, তা দেখার জন্যে আমাদের একটু অপেক্ষা করতে হবে। কে জানে সুরাইয়ার সাথে আমার যে সম্পর্ক, তার হয়তো এ ঘটনাটিই পরিসমাপ্তি টেনে দেবে।

আমি হাঁটা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়লাম। মনে মনে দারুণ লজ্জা অনুভব করছিলাম। আমার চাচার সামনে দাঁড়াবো কিভাবে? কোন্ মুখ নিয়ে চাচীর কাছে যাব? সুরাইয়ার আব্বা তাঁদেরকে কী বলেছেন?

যখন আমার চাচা এ ঘটনা শুনলেন, আমার সম্পর্কে তাঁর আশার প্রাসাদ কি ধূলিসাৎ হয়ে যায়নি? নিশ্চয় তিনি দারুণ আঘাত পেয়েছেন। আমার এ নৈতিক অধপতনের কথা নতুন করে চিন্তা করতে শুরু করেছেন। তিনি কি আর কখনো আমার চরিত্র ও আমার অধ্যবসায় নিয়ে তাঁর বন্ধুমহলে ও বাড়ীতে আগত মেহমানদের কাছে গর্ব করতে পারবেন?

কাদরী পাশা স্ট্রীটের শেষ মাথায় 'খুদায়রী ফার্মেসী'টির সামনে যেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। তীব্র অনুশোচনা আমার বিবেককে নির্দয়ভাবে কশাঘাত করতে লাগলো। মনে মনে বললাম, হায় এমন লজ্জাজনক কাজ যদি না করতাম! এখন কী করবো? চাচার কাছে মুখ দেখানো আমার জন্য এখন কঠিন কাজ। এ এক বড় বিপদ আমার মাথায় চেপে বসলো। কায়রো ছেড়ে গ্রামের বাড়ীতে চলে যাওয়ার কথা চিন্তা করলাম। সাথে সাথে এ কথাও ভাবলাম, অন্তত আজকের রাতটি কোন বন্ধুর কাছে কাটাতে তো কোন বাধা নেই। রুশদীর কাছে গিয়ে তার সাথেও এ ব্যাপারে পরামর্শ করতে দোষ কি? না, এ যুক্তিসঙ্গত হবে না। এমনটি করলে চাচা–চাচী ঘুম বাদ দিয়ে সারা রাত পথে পথে খুঁজে বেড়াবেন। তাতে তাদের কষ্ট ও যন্ত্রণা আরো বাড়িয়ে তোলা হবে। হায় আল্লাহ। এ কী সীমাহীন অশান্তি!

ঐতো সুরাইয়াকে দেখা যাচ্ছে। হাঁ, আবার এ দিকে আসছে। তার হাতে একটি ঝুড়ি। সম্ভবত আরো কিছু কেনাকাটার জন্য আসছে। এখনো তার চোখে–মুখে রাগের ছাপ সুস্পষ্ট। মনে হলো, আমাকে দেখতে পেলেই আমর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লাথি–চড় শুরু করে দেবে। কিন্তু তাতে তার লাভ কি হবে? আমার কাছাকাছি এসে সে কিছু কড়া কথা আমার দিকে ছুঁড়ে মারলো। পাশ দিয়ে যেতে যেতে সে বললো, মনে করেছিলাম, এ গম্বুজ সদৃশ মাথাটির নিচে নিশ্চয় একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি আছে। তোমার শান্ত ও গম্ভীর ভাব দেখে আমি ধোকা খেয়েছি। তোমার দেহ ও বয়স থেকেও আমি তোমাকে বড় মনে করেছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শিশুদের আচরণ ছাড়া আর কিছুই তোমার কাছ থেকে পাইনি।

আমার শিরা–উপশিরায় রক্ত টগবগ করে উঠলো। চোখ দু'টি ঝাপসা হয়ে এলো, আমি যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। হঠাৎ গর্জন করে উঠলাম,

–চুপ কর! নইলে তোর জিহবা টেনে ছিঁড়ে ফেলবো। আমার সামনে থেকে সরে যা বলছি। আমি কোন অশোভন আচরণ করে বসতে পারি এবং পরে দু'জনকেই পস্তাতে হয়, এ কথা সুরাইয়া বুঝতে পারলো। এ কারণে, আমাকে বিষয়টি হালকা করার সুযোগ না

দিয়েই দ্রুত দূরে কেটে পড়লো। আমিও সাথে সাথে বাড়ীর দিকে হাঁটা শুরু করলাম। এমন একটা ভাব নিয়ে যে, যা হয় হবে। এই সময় আমার মধ্যে একটা বেপরোয়া ভাব মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। আপন মনেই বললাম, 'চাচা আমার কী করবেন? তিনি কি আমাকে ফাঁসিতে ঝুলাবেন? আমি বেশ করেছি, তাকে চিঠি লিখেছি। তাতে যা হয় হবে।' এ ছিল দীর্ঘ চিন্তা-ভাবনা এবং যন্ত্রণাদায়ক অস্থিরতার নির্মম পরিণতি। সমস্যার কোন সমাধান যখন আমি বের করতে পারলাম না, তখন ভাগ্যের হাতেই নিজেকে সঁপে দিলাম এবং যতবড় খারাব পরিণতিই হোক না কেন, তা মেনে নেয়ার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হয়ে রইলাম।

আমার সাথে চাচার আচরণে কোনই পার্থক্য দেখা গেল না। সে আচরণ আগের মত একই রকম বলে মনে হলো। নিশ্চয় এরকম কোন কোন অনুমান পাপ। কী ভাবে আমার মাথায় এ ধারণা জন্মালো যে, চাচা আমার উপর ক্ষেপে যাবেন এবং বকাবকি করে আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবেন? এ ছিল আমার প্রথম ভুল। চাচা একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। জীবনে বহু ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন তিনি হয়েছেন। তিনিও যৌবন ও শৈশবকাল অতিক্রম করেছেন। নিশ্চয় আমার মত বহু স্বপ্ন তাঁরও মাথায় বারবার দোলা দিয়েছে। বহু বার তিনি এরকম ঘটনায় আমার থেকেও কঠিনভাবে জড়িত হয়েছেন। এসব কথা ভুলে গিয়ে বোকা ও কাপুরুষের মত কিভাবে তাঁকে এত ভয় করলাম? বাসা থেকে পালিয়ে কোন বন্ধুর কাছে আশ্রয় নেয়া বা চিরদিনের জন্য কায়রো ছাড়ার কথা কেমন করে মাথায় এলো?

এদিকে চাচী ছিলেন আমার সাথে বড় খোলামেলা। তিনি চাচার মত ছিলেন না। চাচা আমাকে একটি কথাও জিজ্ঞেস করেননি, বরং চাচীই আমাকে ঘটনাটি বিস্তারিত বলেছিলেন। তাঁর কাছ থেকেই শুনেছিলাম স্কুল-সুপার চিঠি পড়ে সুরাইয়াকে ডেকে বলেন,

-সুরাইয়া, স্কুল হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রেম-নিকেতন নয়।

-আপা, এমন কথা বলছেন কেন?

-এ চিঠিটি নিয়ে পড়ে দেখ।

কাঁপা হাতে সুরাইয়া চিঠি ধরে খুব দ্রুত তার লাইনগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে গেল। তার চোখ যেন বিশ্বাসই করতে পারছিল না। সে দ্বিতীয় বার পড়তে লাগলো। এরই মধ্যে সুপার প্রশ্ন করে বসলেন,

-সুলায়মান নামের এ বখাটে কে?

-তার সম্পর্কে আমি কিছুই জানিনে। কেউ হয়তো ষড়যন্ত্রমূলক এ কাজ করেছে।

–আমি এত নির্বোধ নই। চিঠির ধরন দেখেই বুঝা যাচ্ছে তোমাদের সম্পর্ক বেশ পুরাতন ও মযবুত। এটা কোন ষড়যন্ত্র নয় বরং নিরেট সত্য। তোমার দুর্ভাগ্য যে, চিঠিটি আমার হাতে পৌছেছে এবং সব ঘটনা ফাঁস হয়ে গেছে।

–আপা, আমি কসম করে বলছি, আমার এবং ঐ লোকটির মধ্যে সন্দেহজনক কোন সম্পর্কই নেই।

–অন্য ছাত্রীদের মাঝে তুমি একটি সংক্রামক ব্যাধি তুল্য। আজ থেকে তোমার মত মেয়ের কোন স্থান এ স্কুলে নেই।

–আমার প্রতি অবিচার করা হলো। আল্লাহ্‌র কসম, আমার প্রতি সুবিচার করা হলো না। স্কুলের ঠিকানায় আমার নামে কোন বখাটে ছেলে চিঠি লিখলে তাতে আমার অপরাধ হবে কেন? বরং তাকেই তিরস্কার করা উচিত যে এ কাজ করেছে। একথাগুলো বলতে বলতে সুরাইয়া সুপারের সামনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো।

–শাস্তি তোমারও পাওয়া উচিত। তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক দৃঢ় সম্পর্ক ও ভালোবাসা না থাকলে কখ্‌খনো সে এমন চিঠি লিখতে সাহস করতো না।

–আপা, চিঠিতে সে কি লিখেছে? সে তো শুধু আমার কাছে আশা করেছে, আমি যেন আন্দালুস পার্কে তার সাথে একটু বেড়াতে যাই।

–এরপর আর বাকী থাকছে কি? বেড়ানো! বেড়ানোর পরেই তো আরো, আরো কিছু ঘটবে আমার মনে হচ্ছে। তোমার নির্লজ্জতা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। বেড়াতে যাওয়ার মধ্যে তোমার চরিত্রে কলংক চিহ্ন পড়তে পারে এমন কিছু কি নেই?

–আপা, আমি একথা বলতে চাইনি। আমি শুধু বোঝাতে চেয়েছি, এটা একটা নির্বোধ লোকের বুদ্ধিহীন কাজ ছাড়া আর কিছুই না। সে বুদ্ধিমান হলে বুঝতো, ছাত্রীদের চিঠিপত্র পরীক্ষা করা হয়। আর তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক থাকলে অন্তত এ কথাটি তাকে বলতাম। কিন্তু সুপার তার কথার প্রতি কর্ণপাত করলেন না। অত্যন্ত রুক্ষভাবে তিনি আদেশ করলেন,

–বের হয়ে যাও অসভ্য মেয়ে।

সুরাইয়া ক্লাসের দিকে মোড় নিতেই সুপার চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন– কোন্ দিকে যাচ্ছো?

–ক্লাসে।

সুপার একটু বিদ্রূপের হাসি হেসে বললেন– তোমাকে ক্লাসে যেতে হবে না। তুমি এখন বাড়ীতে চলে যাও। আগামীকাল তোমার অভিভাবককে ডেকে আনবে। তার হাতেই আমি অফিসিয়াল চিঠি দিয়ে দেব। জেনে রাখ, তিনি না আসা পর্যন্ত তোমাকে ক্লাসে

ঢোকার অনুমতি দেয়া হবে না।

সুরাইয়া উদভ্রান্তের মত বের হয়ে গিয়েছিল। পথহারা পথিকের মত চলতে লাগলো। তার করণীয় কি, তা সে স্থির করতে পারছিল না। তার ঠোঁটের মিষ্টি হাসি ও চোখ-মুখের হাসি-খুশি ভাব বিলীন হয়ে গেছে। উপরন্তু বান্ধবীদের নানা কটু মন্তব্য তার কানে আসছে। তারা তিরস্কার ছাড়া যেন আর কিছুই জানে না। কারো কারো অন্তর অবশ্য কোমল। তারা সহানুভূতিও প্রকাশ করছে।

এ খবর শুনে সুরাইয়ার পিতা ভীষণ ব্যথা পেলেন। এমন কি স্কুলে যাওয়া বন্ধ করার কথাও চিন্তা করলেন। মেয়ে যতটুক শিখেছে, তাই যথেষ্ট। এখন ঘরে বসে থাকুক, যতদিন না আল্লাহ তার জন্য কোন পাত্রের ব্যবস্থা করে দেন। কিন্তু সুরাইয়ার কান্নাকাটি, তার মায়ের অনুনয়-বিনয় এবং বিষয়টির অগভীরতার কথা চিন্তা করে তিনি সুপারের কাছে যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিলেন। অবশেষে উভয়ের সিদ্ধান্ত মত সুরাইয়াকে দু'সপ্তাহের জন্য স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হলো।

অতপর সুরাইয়ার পিতা এলেন চাচার কাছে বিষয়টি তাঁকে জানাতে এবং আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার জন্য। তিনি চাচার কাছে তার মেয়ের ইজ্জত ও সম্ভ্রমের কথা উল্লেখ করলেন। এখন দুর্নাম রটে গেলে বখাটে ও বাজে লোকেরা নানা রকম সুযোগ নেবে বলেও জানালেন।

লোকটি আমার চাচাকে বললেন- এ মহল্লায় আসার পর থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের সম্পর্কে খারাপ কোন কিছু আপনারা কি শুনেছেন?

-কখ্খনো না। ভালো ছাড়া মন্দ কোন কিছু শুনিনি। সুরাইয়ার বাপ, আমরা যা শুনি, আপনি তো তার থেকেও অনেক মর্যাদাশীল মানুষ।

-সুরাইয়াকে আপনারা কেমন জানেন?

-নম্র, ভদ্র এবং সে যে সম্মানিত ব্যক্তির মেয়ে, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

-তাহলে এ চিঠিটি নিয়ে একটু পড়ে দেখুন। আমার চাচা জোরে হেসে উঠলেন। লোকটিকে স্বাভাবিক করতে চাইলেন এবং চিঠির গুরুত্বকে খাটো করার চেষ্টা করে তিনি বললেন,

-সুলায়মানও খুব ভালো ও ভদ্র ছেলে। আর সুরাইয়া একেবারেই তার বোনের মত। সে সুরাইয়ার কাছে যা আশা করেছে, তাতে তো এমন কোন দোষ দেখি না। তবে এভাবে চিঠিটা তার পাঠানো খুবই অন্যায় হয়েছে। তার উচিত ছিল আপনাকে অথবা সুরাইয়ার মাকে বলা। যেতে চাইলে আপনাদের অনুমতি নিয়ে যাওয়াই ছিল তাদের জন্যে সঠিক পন্থা।

–কিন্তু এ চিঠি স্কুলে সুরাইয়াকে যেমন, তেমনি আমাকেও বেশী বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে। আর সে তো দিন–রাত কেঁদে–কেটেই অস্থির। আপনি তো জানেন, মেয়েদের শত্রুর কোন অভাব হয় না।

–যাই হোক, সুলায়মানের পক্ষ থেকে আমি দুঃখ প্রকাশ করছি। আমি তাকে ক্ষমা চেয়ে নিতে বলবো। প্রথম বারের মত সে এ ধরনের কাজ করে ফেলেছে। আমি নিশ্চিত, সে যখন বিষয়টি জানতে পারবে, দারুণ লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে।

১৬

এবারের গ্রীষ্মকালীন ছুটিটি বেশ ভালোভাবেই কাটলো। ছুটির আনন্দ আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল যে জিনিসটি তা হচ্ছে, আমার পরীক্ষার কৃতকার্যতার সংবাদ। সুরাইয়া নিজেই আমাকে চিঠি লিখে এ খবরটি জানিয়েছিল। তার পরপরই সে আর একটি ছোট্ট চিঠি লিখেছিল। সেই চিঠিতে সে এ বছরের শেষ দিকে যে ঘটনাটি ঘটেছিল বিশেষত কায়রো থেকে আমার গ্রামের বাড়ী আসার আগ পর্যন্ত আমাদের দু'জনের মধ্যে যে বিচ্ছেদ অবস্থা বিরাজ করছিল, সে সম্পর্কেও সে দুঃখ প্রকাশ করেছিল। এ কথাও বলেছিল যে, সে আমার প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করছে এবং সে আশা করছে, আমি যেন ক্লাশ শুরু হবার দু' অথবা তিন সপ্তাহ আগেই কায়রো পৌঁছি।

আসল কথা হলো তার এ চিঠি দু'টি পেয়ে আমি যে কত খুশি হয়েছিলাম, তা প্রকাশ করা কঠিন। চিঠি দু'টি বার বার পড়তাম। ঘুরে–ফিরে চিঠি দু'টির কাছে এলেই অকারণে আবার নতুন করে তা পড়তে শুরু করতাম। তারপর সবার চোখের আড়ালে সেটি একটি বিশেষ খাতায় নকল করতাম। সত্যি সত্যিই আমি এ সময় বিশেষ একটি ডাইরী লিখতে শুরু করি। ঐ ডাইরীর বেশীর ভাগই ছিল সুরাইয়াকে কেন্দ্র করে। এই সময়টিই ছিল আমার জীবনের সব চাইতে আনন্দঘন সময়। এই দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে তার সাথে সাক্ষাতের কতই না স্বপ্ন দেখেছি! তবে তার কাছে চিঠি লেখার কথা একবারও আমি চিন্তা করিনি। কারণ একই গর্তে পা রেখে দু'বার দংশিত হই, তা আমি চাইনি।

'আল–কুরাশিয়া'তে সাঈদ হাফেজের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হলো। সাঈদের চেহারা–ছবির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ঘন কালো পরিপাটি মোঁচ শ্মশ্রুমন্ডিত মুখমন্ডল,

সাঈদ আগের থেকে বেশ লম্বা হয়ে গেছে। এখন তাকে অনেকটা পূর্ণ বয়স্ক মানুষের মত দেখাচ্ছে। লক্ষ্য করলাম, খাদরা ও শায়খ হাফেজের মধ্যে যে ঝগড়াঝাঁটি প্রায়ই লেগে থাকতো এখন তা প্রায় হয় না বললেই চলে। শায়খ হাফেজের সেই বোনটিও আর আগের মত খাদরার সাথে তত বেশী ঝগড়ায় লিপ্ত হয় না। এখনো তিনি কোন পাত্রের দৃষ্টিতে পড়ার প্রতীক্ষায় আছেন। ভালো ভালো কাপড় পরে, উৎকৃষ্ট প্রসাধনী ব্যবহার করে সুসজ্জিত হয়ে সেই পাত্রটির সন্ধান করে ফিরছেন। কিন্তু এত চেষ্টা সত্ত্বেও ভাগ্য যেন তার প্রতি বিমুখ। আমি তাকে বললাম,

–পরিবারে এত শান্ত ভাব কেন?

তিনি বললেন– কুরাশিয়ায় বাইরে থেকে এসেছি, তাই নিজেদেরকে একটু গোপন রাখতে চাই।

–আমার মনে হচ্ছে, শায়খ হাফেজের ব্যবসার অবস্থা আগের থেকে বেশ ভালো হয়েছে। সম্ভবত এটাই পরিবারের শান্তি ও সন্তুষ্টির অন্যতম কারণ।

–ঠিকই। তবে খাদরা সবই গিলে ফেলছে। শায়খ হাফেজের হাতে এত যে পয়সা–কড়ি আসছে, তা যে কোথায় হাওয়া হয়ে যাচ্ছে।

–আপনি কি আগের মতই খাদরার সাথে ঝগড়াঝাঁটি করেন এবং তাকে ঈর্ষা করেন?

–ঈর্ষা! নবীর ওপর দুরুদ পড়। তাকে আমি ঈর্ষা করবো কেন? তার ফুলা ফুলা কালো মুখের জন্যে? নাকি রোদে মেলতে পারে না যে চোখ, সেই চোখের কারণে? আমি তার থেকে ষাটগুণ বেশী সুন্দরী। এ জন্যেই আমার ভাগ্য এত সুপ্রসন্ন।

আর শায়খ হাফেজ এখানকার পৌরসভা গাহ্ওয়াখানার একজন অন্যতম নেতা হয়ে গেছেন। শিগগিরই তার কিছু বন্ধুবান্ধবও জুটে গেছে, যারা তাঁর রাজনৈতিক মতামত ও অতীত ঘটনাবলীর সমালোচনাকে খুবই বাহবা দেয়। তিনি তাদের সামনে এমন সব উজ্জ্বল ঘটনাবলী তুলে ধরেন, যাতে তারা হিটলার ও জার্মানীর প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত করে।

শায়খ হাফেজকে বললাম, জার্মানীর ভাগ্য খুবই খারাপ। কেবল পরাজয়ই তার কপালে জোটেনি, শত্রুরা তাকে পূর্ব ও পশ্চিম দু'ভাগে ভাগও করে ফেলেছে। এমনকি খোদ বার্লিনের একাংশে রুশ ও অপর অংশে মিত্রশক্তি দখল কায়েম করেছে। এ ধরনের বিভক্তিতে জার্মানীর পিঠ বেঁকে গেছে, সে এবারের মত আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।

আমার কথাগুলো শুনে শায়খ হাফেজ কিছুটা দুঃখিত হলেন এবং প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন। কুরআনের একটি বাণীর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন– বিগলিত হাড়সমূহ যিনি পুনরায় জীবিত করবেন তিনি কত না পবিত্র!

বললাম, বিভক্তি হচ্ছে নিকৃষ্টতম ঔপনিবেশিক পন্থা।

শায়খ বললেন, তবে তুমি নিশ্চিত থাকতে পার, প্রত্যেক দলই নিজ অঞ্চলকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হবে। এভাবে দুটো পরস্পর বিরোধী শক্তির সৃষ্টি হবে এবং এক শক্তি অন্য একটি শক্তিকে না গিলা পর্যন্ত তাদের মধ্যে সংঘাত ও সংঘর্ষ কখ্খনো বন্ধ হবে না। আর এভাবেই দু'জার্মানী পুনরায় এক হবে।

–সুদীর্ঘ সময়ের পর।

–যাই হোক। তারপর ইতিহাসে এমন একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে, যার গুরুত্ব ১৯১৪ ও ১৯৩৯–এর অধ্যায় থেকে কোন অংশে কম হবে না। এ জাতির জন্ম পৃথিবী থেকে বিলীন হওয়ার জন্য হয়নি; কারণ তারা নিজেদের জাতীয়তা ও গৌরবের প্রতি সম্মান দিয়ে যাচ্ছে।

–তবে আপনি কি মনে করেন না, এ ধরনের সংঘাত ও সংঘর্ষ পৃথিবীকে একটি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে পারে এবং তাতে শুধু জার্মানীই জড়িত হবে না, বরং বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলই জড়িয়ে পড়বে?

–সুলায়মান, এখানে একটি রহস্য আছে। যুদ্ধকে সারা বিশ্ব দারুণ ঘৃণা করে। প্রত্যেক জাতিই চায় শান্তিতে বসবাস করতে। তাই যেসব নেতা যুদ্ধের দাবানল জ্বালিয়ে দিতে চাইবে, তারা তাদের নিজেদের ভবিষ্যত ও নিজ নিজ জাতির ভবিষ্যত নিয়ে জুয়া খেলায় মেতে উঠবে।

–মানুষ যুদ্ধ ছাড়া কখ্খনো বাঁচতে পারবে না।

–তুমি তাকে সীমিত অঞ্চলে খন্ড খন্ড যুদ্ধ বলতে পার। যেমন ধর মিসর ও ইসরাইলের মধ্যে অথবা দক্ষিণ ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যে হয়ে থাকে। কিন্তু সারা বিশ্ব যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হওয়া এক অসম্ভব ব্যাপার বলতে পার। তবে সারা বিশ্বের যদি মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে, তাহলে সেটা আলাদা কথা।

আমি শায়খ হাফেজের কথা শুনছিলাম। তিনি এসব রহস্য বর্ণনা করছিলেন, আর আমার বিস্ময় অধিকতর বেড়ে যাচ্ছিল। অতীতে এক সময় যিনি যুদ্ধের প্রতি দারুণ উৎসাহ দেখাতেন, বাড়াবাড়িমূলক গুরুত্ব দিতেন, এমন কি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রক্তাক্ত সংঘর্ষের সংবাদ শুনে উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন, আজ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কত গভীর হয়েছে। তিনি কতবেশী শান্তিকামী হয়ে উঠেছেন। শান্তি তাঁর এমন বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে যে, সবারই উচিত তা মেনে নেয়া এবং যুদ্ধ ও তার ভয়াবহতাকে ঘৃণা করা। মনে হচ্ছে বয়সের বৃদ্ধিই আশা ও শান্তির প্রতি ভালোবাসার এমন পরিপূর্ণ নতুন রূপ তাঁকে দান করেছে।

শায়খ হাফেজকে বললাম– আর এই ইংরেজরা, যারা আমাদের এ দেশ থেকে চলে

যেতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে, তার সমাধান কি?

–এ সম্পর্কে আমার মতামত বহু দিন থেকে মানুষের জানা। তারা কখ্খনো মিসর ছেড়ে যাবে না। কিন্তু যখন তারা দেখবে মিসরীয় জাতি তাদের বিরোধী, সরকারও আর তাদের থাকতে দিতে চায় না এবং স্বাধীনতার সৈনিকরা তাদের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে অতিষ্ঠ করে তুলবে কেবল তখনই তারা পাততাড়ি গুটাবে।

–আমরা তো আবার সেই যুদ্ধের কথায় ফিরে এলাম। –এ কথাটি বলে আমি একটু চোখে মিটকি মারলাম। উত্তরে তিনি বললেন–

–এ যুদ্ধ শত্রুতা ও লোভের বশবর্তী হয়ে নয়। এ যুদ্ধ হবে অধিকারের সংরক্ষণ ও স্বাধীনতা অর্জনের বাসনায়। এতে কোন মানুষ আমাদের নিন্দা করতে পারবে না, বরং বিশ্বের সব দেশ ও জাতিই আমাদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধায় মাথা নত করে দেবে।

–সত্যি কথা বলেছেন। এটাই প্রকৃত সত্য।

–আমরা শিল্প বিপ্লবে ব্যর্থ হয়েছি।

–কেন?

–ইংরেজদের কারণে। ফিলিস্তীনে আমরা পরাজিত হলাম। তাও ইংরেজদের কারণে। তারপর আরব ও ইসলামী বিশ্বের কোন কোন দেশের সাথে দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে মতপার্থক্য সৃষ্টি করলাম। অথচ বাস্তবে তা হওয়া উচিত ছিল না, তার জন্যও দায়ী কিন্তু ইংরেজ।

–হাঁ, সকল রোগের মূল ও সকল নিচতা ও অধপতনের উৎস তারাই।

অতপর শায়খ হাফেজ আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে কানে কানে বললেন,

–প্রকৃত বাদশাহ হলেন অপর এক ব্যক্তি, যিনি আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও স্বাধীনতার প্রধান বাধা। যেমন খিদীব তাওফীক, যিনি পেছন থেকে আরাবীকে ছুরিকাঘাত করলেন। জাতিকে শাসনতান্ত্রিক অধিকার দেয়ার পরিবর্তে তাদের দাবিয়ে রাখার জন্য ইংরেজের সাহায্য কামনা করলেন। এভাবে তিনি তাদের খেলনায় পরিণত হলেন।

–চাচা শায়খ হাফেজ, থাক, থাক, হয়েছে। দেয়ালেরও কান আছে। হারামীর বাচ্চাদের তো অভাব নেই। আর আপনি তো বর্তমান সরকারের সমালোচনা করেন, বাদশাহকেও গালমন্দ করেন। আইনের শাস্তি কি, তা তো আপনি জানেন।

শায়খ হাফেজ হাসলেন, সেই সাথে আমিও হেসে উঠলাম। আর এ সময় খাদরাও এসে উপস্থিত হলেন। শায়খ হাফেজের দিকে রসিকতার সুরে বললেন,

–শায়খ হাফেজ, তোমার ব্যাপার–স্যাপার বড্ড অভিনব। রাজনীতি বিষয়ক কথাবার্তা যেন তোমার হাশীশ ও আফিমস্বরূপ। মিন্‌সে, একটু বিশ্রাম নাও, মাথা ব্যথা কমবে। নবীর কসম, রাজনীতির পেছনে দারিদ্র্য, মাথা ব্যথা ও বাড়ী–ঘরের ধ্বংস ছাড়া

আর কিছুই নেই।

–খাদরা চুপ কর। তা না হলে আমার নিজস্ব পন্থায় তোমার মুখ বন্ধ করে দেব।

–ইহুদী, ইংরেজ ও অন্যান্য সম্পর্কে আলোচনা থেকে সারা দিন তোমার জিহ্বা বিরত হয় না। সাঈদের মাথা তুমি খারাপ করে দিলে। যে কোন সময় সে গ্রেফতার হলে তার পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যাবে। বিপদ হলো, সেও ইহুদীদের সাথে যুদ্ধ করতে ফিলিস্তীন যাওয়ার জন্য দৃঢ়সংকল্প। সবকিছুর জন্য দায়ী তুমি।

–আরে নির্বোধ, চুপ কর। এটা তোমার জন্য গৌরবের যে, তোমার ছেলে একজন দেশপ্রেমিক ও আল্লাহর পথের মুজাহিদ। খাদরা, এ দুনিয়া আজ আছে কাল নেই।

–কাল তুমি দেখবে, তারও পরিণতি একেবারেই তার দাদার মত হয়েছে। তারপর উদ্ভ্রান্তের মত এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াবে। ততদিন যদি আমি বেঁচে থাকি তোমাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাবো।

–আরে মাগী, এখান থেকে যাও বলছি। যাও গিয়ে মালুখিয়া–সবজি প্রস্তুত কর, গোশত পাকাও অথবা পিঁয়াজ ছোলগে। তুমি এর কিছুই বুঝবে না।

–ওহে 'শায়খ হাফেজ হিটলার', তোমার পরিচ্ছন্ন বুদ্ধি ও আলোকোজ্জ্বল চিন্তা নিয়ে তুমিই থাক, আমাদের দরকার নেই।

শায়খ হাফেজ হেসে ফেল্লেন, খাদরার মুখে তাঁর এই পুরাতন নামটি শুনে। এ নামটি আমরা আমাদের পল্লীতে তাঁকে দিয়েছিলাম। তাঁর কথা মত খাদরা কিন্তু বের হলেন না। তিনি বরং বললেন,

–শায়খ হাফেজ, সুলায়মান তো বেশ মর্যাদাবান পাত্র হয়ে উঠেছে। আমার ভয় হয় কায়রোর মেয়েরা তাকে ফাঁদে ফেলে না দেয়। সেই ফাঁদে একবার পা দিলে আজীবন আর তা থেকে বের হয়ে আসতে পারবে না।

–তার সম্পর্কে তুমি কী বলতে চাচ্ছো?

–আমি এ কুরাশিয়াতেই তার জন্য কোন প্রস্তাব দিতে চাই। সে এবং সাঈদ তাদের প্রত্যেকেই সুপাত্র। সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আমরা মরার আগেই একটু আনন্দ করতে চাই।

–খাদরা, এসব বাজে কথা ছাড়। সাঈদ ও সুলায়মানের ভবিষ্যত তাদের বিয়ের থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া তাদের বিয়ের বিষয়টি একান্তই তাদের নিজস্ব। তারা দু'জনই দায়িত্বশীল। আগামীতে তারা প্রচুর সময় পাবে।

মুহূর্তে আমার চিন্তার গতি সুরাইয়ার দিকে এবং তুলুনী স্ট্রীটে তাদের বাড়ীর জানালার দিকে চলে গেল। কল্পনায় ভেসে উঠলো সুন্দর উজ্জ্বল একটি মুখ এবং আমার অন্তরে প্রশান্তি

নেমে এলো। চকিতে আমার মন তার দিকে চলে গেল। অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম। কিন্তু পরক্ষণেই খাদরার কণ্ঠস্বরে সম্বিত ফিরে পেলাম। তিনি বলছেন,

–উহ্ সুলায়মান, বাসীমা বেঁচে থাকলে তাকেই তোমার সাথে বিয়ে দিতাম। সেও তোমাক ভালোবাসতো এবং তুমিও তাকে ভালোবাসতে। সাঈদ ও তোমার চাচা শায়খ হাফেজ থেকেও ভালো শ্বশুরকুল কি তুমি পাবে?

তারপর তিনি জোরে একটি নিশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন– উহ্, আমার কলিজার টুকরো মেয়েটি।

মুহূর্তে আমাদের মাঝে পিনপতন নীরবতা নেমে এলো। দারুণ একটা ব্যথা যেন শায়খ হাফেজের মুখে লাগাম পরিয়ে দিল। তিনি একটি কথাও বলতে পারলেন না। খাদরার দু' চোখ পানিতে টলমল করতে লাগলো। এ পরিবেশে আমিও একটু ব্যথা অনুভব করলাম। নিজের অন্তরকে বললাম, বাসীমার স্মৃতি ভুলে গেছি, অন্য আরেকজনকে ভালোবেসেছি। সুরাইয়া হয়েছে আমার যৌবনের স্বপ্ন, এর আগে শৈশব, কৈশোরে বাসীমা ছিল আমার উন্মত্ততা। মানুষের প্রকৃতিই হচ্ছে যেন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা। কিন্তু যতটুকু বুঝা যায়, এ ধরাপৃষ্ঠ থেকে বাসীমার অন্তর্হিত হওয়ার পর সন্ন্যাসী হিসেবে কিভাবে জীবন কাটাবো? এ এক অযৌক্তিক অসার কল্পনা। সেও ছিল ছোট, আমিও ছিলাম ছোট। সত্যি সত্যিই তাকে ভালোবাসতাম। তাকে একটুও ভুলতে পারিনি। তা সত্ত্বেও অন্যের সাথে আমার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তাকে ছাড়া অন্যকে ভালোবেসেছি, এটা ঠিক হয়নি, উচিত হয়নি। এমন একটা পাপানুভূতি আমাকে দংশন করে। মিটগামার থেকে যখন আমি তার জন্য কিছু মিষ্টি ও ফল না নিয়ে ফিরে এলাম, তার সে সময়ের সেই হাসিখুশি চেহারা, সরলতা, অতপর রাগের সেই ছবিটি আমার মানসপটে ভেসে উঠলো। আমি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লাম এবং কান্না অনুভব করলাম।

বিকেলে সাঈদের সাথে নিকটবর্তী রেল লাইনের পাশের গাহ্ওয়াখানার উদ্দেশে বের হলাম। পেপসি কোলার কৌটা খুলতে খুলতে সাঈদ প্রশ্ন করলো,

–আবু দাউদ, তোমার সেই মিষ্টি–মধুর দিনগুলো কোথায় গেল?

–সাঈদ, তোমার জন্য আমি দারুণ উৎকণ্ঠিত ছিলাম। আল্লাহ জানেন, কায়রোয় তোমার চিঠির প্রতীক্ষায় কিভাবে কাটিয়েছি।

–না, না, সুলায়মান, আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে, তুমি অত্যন্ত উদাসীন। তুমি কি

এ ব্যাপারে একমত হওনি যে, আমরা একে অপরের নিকট সপ্তাহে অন্তত একটি করে চিঠি লিখবো? প্রথম এক মাস আমরা একথা রক্ষা করেছি। তারপর দু' সপ্তাহে একটিতে পরিণত হয়েছে। তারপর তিন সপ্তাহ পর একটি। এমনি করে মাসে একটিতে পরিণত হয়। বছরের শেষ দিকে তো আড়াই মাস পরেই একটি চিঠি লিখেছো। মনে হচ্ছে কায়রোর সৌন্দর্যে তুমি ভুলে গেছ। তাছাড়া সবাই আপনজনদের কাছে গেলে বন্ধুদের কথা ভুলে যায়।

–না সাঈদ, একথা ঠিক নয় । তুমি আমার সাথী, তুমি আমার বন্ধু। সবকিছুই তুমি। যেখানেই থাকি না কেন, কোন মানুষের প্রতি আমার ভালোবাসাই তোমার প্রতি আমার ভালোবাসার সমান কখ্খনো হবে না।

একটু চালাকির সুরে সাঈদ বললো,

–তাহলে সেখানে এমন কেউ আছে, যাকে তুমি ভালোবাস এবং তোমার কাছে আমার যে মর্যাদা তাকে সে ঈর্ষা করে?

আমি একটা ঢোক গিলে মৃদু হাসলাম। সুরাইয়ার সাথে আমার কাহিনীটি তার কাছে বিস্তারিত বলার জন্য নিজের মধ্যে এক প্রচন্ড আগ্রহ অনুভব করলাম। সাঈদের কাছে যখন সব কথা খুলে বলছিলাম, নিজেকে আমি ভীষণ গর্বিত ও সৌভাগ্যবান মনে করছিলাম। মনে করছিলাম এটা আমার অতিরিক্ত গৌরব ও সম্মান। আর সে, কিছুটা বিস্ময়ের সাথে আমার কথা কান লাগিয়ে শুনছিল। তারপর একটু মাথা দুলিয়ে বললো,

–সুলায়মান, আল্লাহ তোমার শয়তানকে উপযুক্ত বদলা দিন।

আমি তোমাকে নেক্কার ওলী–আল্লাহদের একজন মনে করতাম। এখন দেখছি আপাদমস্তক প্রেম–সাগরে নিমজ্জিত।

–আমি তো একজন মানুষ ছাড়া অন্য কিছু নই। আর মানুষ তার গোপন আবেগ–অনুভূতি ব্যক্ত করে থাকেই।

–অবশ্যই মনে হচ্ছে, তুমিই এ দর্শন খাড়া করেছ এবং তুমি নিজে যাতে বিশ্বাস করেছ, আমাকেও তাতে বিশ্বাসী করে তুলতে চাইছো।

–তুমি বিশ্বাস কর, খারাপ অথবা সন্দেহজনক কোন সম্পর্ক সুরাইয়ার সাথে আমার নেই।

–আজ আনন্দ–ফুর্তি, কাল অন্য কিছু। বন্ধু, এসব বিষয় সব সময় সামনের দিকে এগোয়। আমাদের মত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বিয়োগাত্মক পরিণতিতে গিয়ে সমাপ্ত হয়।

–উহ্, তুমি বড় বেশী বাড়াবাড়ি কর। আমি যদি এ গোপন কথা না বলতাম, ভালো হতো। শুনে রাখ, আমি তাকে সর্বান্তকরণে ভালোবাসি এবং পাশ করার পর তাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত করেছি।

–হতভাগা সুলায়মান, মনে হচ্ছে, তোমার অবস্থা বড় কঠিন।

–সাঈদ, এ একটা সুযোগ। আমার মনে হয় ভবিষ্যত জীবনে সে ছাড়া আমার উপযুক্ত অন্য কোন নেককার স্ত্রী কখ্খনো পাব না। সুরাইয়া আমার জন্য আসমানের চাঁদ।

সাঈদ হো হো করে হেসে উঠে এক হাতের তালু দিয়ে অন্য হাতের তালুতে আঘাত করে বললো,

–সুলায়মান, নিশ্চয় সুরাইয়া তোমাকে জাদু করেছে। আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করুন।

আমি একটু সোজা হয়ে বসলাম। তারপর অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বললাম,

–আমার কথা ছেড়ে দাও। এখন তোমার প্রেমের কথা একটু বলতো। আমার কাছে কোন কিছু গোপন করো না।

সাঈদ একটু গম্ভীর হয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বললো,

–শোন সুলায়মান, এই হলো আমার বিস্তারিত প্রেম –উপাখ্যান।

–চল, আমরা উপহার বিনিময় করি।

–রাজনীতি ও রাজনীতি বিষয়ক আলোচনা ছাড়া আমি আর কিছুই ভালোবাসি না। কারাগারে যে রাতটি আমি কাটিয়েছিলাম, সেই রাতটির স্মৃতি থেকে বেশী মধুর কোন স্মৃতি আমার কাছে আর নেই। এসব ঘটনা আমাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে সুরাইয়ার মত মেয়েদের থেকে। আর আমি এসবের মধ্যে যথেষ্ট সান্ত্বনা ও কাজ পেয়েছি, যা আমাকে ব্যস্ত রেখেছে।

–এ হচ্ছে একটি দিক, অন্য দিকটি কোথায়? সেটা থেকে অমনোযোগী হচ্ছো কেন? যা জানতে চাই, তা থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করো না। তুমি তো আর পাথর নও যে, অন্তর ছাড়াই বেঁচে আছ।

–তুমি আমাকে কখ্খনো বিশ্বাস করবে না। কিন্তু আল্লাহর কসম, এটাই হচ্ছে প্রকৃত সত্য, আর দ্বিতীয় যে দিকটির প্রতি তুমি ইঙ্গিত করেছ, আমার বিশ্বাস, তার জন্য সময় আছে। আগামীকালও হতে পারে, পরশুও হতে পারে। কিন্তু সঠিকভাবে কবে তা আমি জানিনে। এখনো তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছো না?

–তুমি কি বিশ্বাস কর চিরকালই তোমার অস্থিরতার ওপর এমন অটল থাকবে।

কোন উত্তর না দিয়ে সাঈদ শুধু একটু মাথা ঝাঁকালো। তার এ অকপট স্বীকৃতি যখন সে আমাকে শুনাচ্ছিল, প্রকৃত সত্য থেকে সে কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হয়নি। কারণ, তা ছিল তার একরোখা স্বভাব ও তীব্র স্বদেশপ্রেমের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আমার কাছে আরো মনে হলো, আরো একটি ব্যাপার সাঈদের জীবনে প্রভাব ফেলেছে। তার বিশ্বাস জন্মেছে তার মা ও ফুফুর মত সব মেয়েই অত্যন্ত সংকীর্ণমনা ও ঝগড়াটে অথবা পরনিন্দা ও পরচর্চায়

পারদর্শী। যেমন আমাদের মহল্লার মেয়েরা, যারা গৃহ–পরিচারিকা বাসীমা এবং শায়খ হাফেজ , যিনি নিজের ও সন্তানদের জন্য দিনের খাবার যোগাড় করতে পারেন না, তার সমালোচনায় লিপ্ত থাকে।

১৭

১৯৫০ সাল। নির্বাচনের কারণে সমগ্র মিসর ভীষণ ব্যস্ত।

দু'ভাগে বিভক্ত হওয়ার কারণে আমাদের গ্রামে দারুণ উত্তেজনা বিরাজ করছে। পূর্ব ভাগ সমর্থন করে ওয়াফদ পার্টিকে, আর পশ্চিম ভাগ তাদের ভোট দিবে সা'দী পার্টির মনোনীত প্রার্থীকে। কলহ ভয়াবহ রূপ ধারণ করলো। একই গ্রামের দু'টি অংশের মধ্যে রক্তাক্ত সংঘর্ষ বেধে গেল। বহু হতাহত হলো, একাধিক একর জমির ফসল বিনষ্ট হলো এবং অসংখ্য বাড়ী–ঘর ও বাজারের দোকানপাট পুড়ে ছারখার হয়ে গেল। এ সংঘাত ও সংঘর্ষ একটি নির্মম তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত ছাড়া কিছু নয়। যতটুকু মনে হয়, তা হচ্ছে এই গ্রামের অধিবাসীরা জার্মান ও ইংরেজ কিংবা আরব ও ইহুদী–এ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। তারা ভুলে গেছে আত্মীয়তার সম্পর্ক ও সকল মানবীয় গুণাবলী। এ ধরনের নিন্দনীয় কাজের সবচেয়ে বড় উৎসাহদাতা হচ্ছে আমাদের নির্বাচনী জোনের মনোনীত প্রার্থী প্রাক্তন প্রতিনিধি এস, বেগ। তিনি টাকা পয়সা ও বাক–চাতুর্যের সাহায্যে মদদ যুগিয়ে থাকেন। তারপর এসব ঘটনায় যারা দোষী সাব্যস্ত হয়, তিনি নিজের প্রভাব ও ক্ষমতা প্রয়োগ করে ছাড়িয়ে আনেন।

গ্রামটি কিছুদিনের জন্য নানা রকমের সংকল্প, সভা–সমিতি, খাওয়া–দাওয়া, মিথ্যা অঙ্গীকার ও মুহুর্মুহু হাত তালিতে মুখর হয়ে ওঠে। এস, বেগ গ্রামবাসীদের কাছে অঙ্গীকার করলেন গ্রামে একটি বড় ধরনের মসজিদ বানিয়ে দেবেন। একটি হাসপাতাল ও স্কুল প্রতিষ্ঠা করবেন। গ্রামের বেকার ছেলেদের চাকরিদানসহ আরো অনেক কিছুর প্রতিশ্রুতি তিনি দিলেন। প্রতিবারেই যেমন দিয়ে থাকেন ঠিক তেমনি। গ্রামের চাকরিরত লোকদের পদোন্নতি ও তাদের ইচ্ছেমত স্থানে বদলিরও অঙ্গীকার করলেন।

কোন ব্যক্তি দিনের বেলায় তার ক্ষেতে–খামারে অথবা রাতের বেলায় কোথাও বের হতে চাইলে হাতে একখানি ধারালো ছুরি, একটি মোটা লাঠি বা যে কোন একখানি অস্ত্র হাতে নিয়েই তবে বের হতে পারত।

এ কথা স্পষ্ট ছিল যে, স্বাধীন মতামত প্রকাশ ও দেশের কল্যাণে অধিকতর যোগ্য ও সৎ লোক নির্বাচনের জন্য ভোট নয়। বরং তা যেন পুঁজিবিনিয়োগ ও অভদ্রোচিত প্রতিযোগিতার

একটি নগ্ন বাজারস্বরূপ। সেখানে নানাবিধ অস্ত্রের ব্যবহার করা এবং ধোকার আশ্রয় নেয়া হয়। পাস করাই এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য, পার্টির বিজয়ই হচ্ছে মূল লক্ষ্য। একদিন আমি পান্ডিত্য ফলিয়ে আমাদের গ্রামের এক ব্যক্তিকে বললাম,

–প্রার্থী এস, বেগ একজন বহুরূপী মানুষ। তার কোন নীতি–আদর্শ নেই।

আমার দিকে লোকটি একটু বাঁকা চোখে তাকিয়ে বললো,

–কার কথা শুনে তুমি এমন হঠকারী সিদ্ধান্তে পৌছে গেলে?

–রাজ–প্রাসাদ যখন যে দলের প্রতি খুশি থাকে, তিনি সব সময় সেই দলেরই মনোনয়ন নিয়ে থাকেন। আপনি কখনো তাঁকে ওয়াফদ পার্টিতে, কখনো সা'দী, দাসতুরী পার্টিতে, আবার কখনো সিদকী পাশার সাথে দেখতে পাবেন। মনে হয় তিনি যেন এ নির্বাচনী জোনটি পৈতৃক উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছেন এবং চান সব সময় তিনিই জয়ী হবেন, তা দেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতির অবস্থা যে রংই ধারণ করুক না কেন।

রাগে গজগজ করতে করতে প্রতিবাদ করে লোকটি বললো,

–এই মূল্যবান মতটি নিজের কাছেই জমা রাখ মিঞা। তুমি রাজনীতির কানাকড়িও বোঝ না। এখনো তুমি স্কুলের শেষ বর্ষের ছাত্র। আদার বেপারী হয়ে জাহাজের খবরে তোমার দরকার কি?

আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। বললাম,

–নিশ্চয় আপনি সত্যকে স্বীকার করতে চান না। কারণ এস, বেগের পাসটা আপনার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতি সপ্তাহে তাঁর কাছ থেকে যে অর্থ নিয়ে থাকেন, তা তো একেবারে কম না।

লোকটি আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার গালে সজোরে এক থাপ্পড় বসিয়ে দিয়ে বললেন,

–তোমার নির্লজ্জতা ও বেয়াদবীর জন্য এটাই প্রয়োজন।

এটিই হলো আমার এবং সেই লোকটির পরিবারের মধ্যে সংঘাত–সংঘর্ষের সূচনা। আমার অধিকার ক্ষুণ্ন হতে দেয়া আমার আব্বার পক্ষে এত সহজ ছিল না। এই অপরাধপ্রবণ তথাকথিত পন্ডিত ব্যক্তিটির মাথায় আমার আব্বা লাঠির আঘাত করে যখম না করা পর্যন্ত শান্ত হতে পারেননি। আমার আব্বার মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর ও সেই লোকটির মধ্যে শত্রুতা বিরাজমান ছিল।

আমার মস্তিষ্কে ফরীদ চাচার সেই ছবিটি ভেসে উঠলো। তিনি একটি কাজের আশায় এস, বেগের দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন, আর শিয়াল পন্ডিতের মত এস, বেগ তাঁর সাথে ছলচাতুরী করছেন। তিনি আমার চাচার কাছে লোক পাঠিয়ে ঘুষ চাচ্ছেন, আর এ দিকে চাচা

মরীচিকার মত চিকচিক করা চাকরিটির আশায় বোকার মত দাঁড়িয়ে আছেন। হাত তাঁর শূন্য, পকেট খালি। আমি অনুভব করলাম আমার চাচার এই ছবিটি এস, বেগের আজকের লম্বা লম্বা প্রতিশ্রুতি ও হাজার হাজার টাকা ছড়ানোর সাথে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি যেন বিনয়ে বিগলিত হয়ে পড়ছিলেন, আর গ্রামটিতে যেন বিরল ঘটিত আনন্দ–ফূর্তির জোয়ার বয়ে যাচ্ছিল। তাঁর এই নোংরা ভনিতা ও নিকৃষ্ট চরিত্র দেখে আমি ভীষণ মর্মাহত হয়ে পড়লাম।

সেই দিনটির কথা আমি কখনো ভুলতে পারিনি, যে দিন এই পার্থী এস, বেগ নিজেই আমাদের বাড়ীতে এসেছিলেন আমার আব্বা ও যে লোকটি আমার ওপর বাড়াবাড়ি করেছিল তার মধ্যে একটা মিটমাট করার উদ্দেশ্যে। তিনি আমার কাঁধে হাত বুলাতে বুলাতে জিজ্ঞেস করেছিলেন,

–সুলায়মান, তুমি কোন্ ক্লাসে পড়?

–শেষ বর্ষের পরীক্ষার্থী।

–খুব ভালো, তুমি শুধু পাসটা কর। ভার্সিটিতে বিনা পয়সায় ভর্তি হওয়ার দায়িত্ব আমার। আমি তোমায় প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

–আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ।

তাঁর সাথে শহর থেকে আসা সঙ্গীরা আমাকে ঘিরে ধরলো। আমাকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললো,

–সম্মানিত বেগ সাহেবের পক্ষে তোমাকে একটা বক্তৃতা দিতে হবে। এসো সুলায়মান।

তাদের একজন আমার একটি হাত ধরে টান দিল, অন্য একজন আমাকে চেয়ারের ওপর বসিয়ে দিল এবং তৃতীয় একজন হাতে তালি দিয়ে বাহবা দিতে লাগল। আর মহামান্য বেগ সাহেব তাঁর উজ্জ্বল চিকচিক করা দাঁত বের করে মৃদু হাসতে লাগলেন। তাঁকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানো এবং তাঁর সফলতার জন্য দোয়া করা ছাড়া কোন উপায় আমার ছিল না। একটি যন্ত্রকে যেন ইচ্ছেমত ঘোরানো হচ্ছে। মোনাফেকী ও প্রদর্শনীর প্রবাহ যখন প্রবল হয়, তখন যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় লোক এ প্রবাহ থেকে দূরে থাকতে চায়, তাদেরকেও সেই প্রবাহ ভাসিয়ে নিয়ে যায়। যাই হোক, তিনি যখন আমাদের বাড়ী থেকে চলে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর একজন সঙ্গী আমার আব্বার দিকে এগিয়ে এসে তাঁর হাতের মধ্যে বেশ কিছু টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বললো,

–এগুলো বেগ সাহেবের পক্ষ থেকে, সুলায়মান যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিয়েছে, তার পুরস্কারস্বরূপ দেয়া হলো।

যেন ভয় পেয়েছেন এমনভাবে আমার আব্বা পেছন দিকে সরে এলেন এবং ঘৃণায় লোকটির দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন,

–তোমার এ টাকা নিয়ে আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাও। তোমার ও আমার মাঝে আল্লাহ প্রতিবন্ধক। তুমি সরে যাও। ইয়া রব, তুমি আমাকে মাফ কর। আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। আল–হামদু লিল্লাহ।

–এ হচ্ছে নিয়ামত। আল্লাহ আপনাকে দিচ্ছেন, আর আপনি পা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছেন?

–আমি তো বলেছি তুমি চলে যাও। আমি আমার দায়িত্ব ও আত্মমর্যাদা কিছু টাকার বিনিময়ে বিকিয়ে দিতে পারিনে। এগুলো আমার জন্য হারাম। আমার বাড়ীতে যদি এক লোকমাও খাবার না থাকে, তবুও এগুলো কখ্খনো আমি গ্রহণ করবো না। নাউযুবিল্লাহ!

লোকটি তার দু'কাঁধ দুলিয়ে আমার আব্বার নির্বুদ্ধিতা সম্পর্কে বিদ্রূপ করতে করতে বেরিয়ে গেল। এতে আমার আত্মমর্যাদায় দারুণ আঘাত লাগলো। সিনেমার পর্দায় যেসব বীরত্বব্যঞ্জক ও সাহসিকতার দৃশ্য দেখতাম এই সময় তার কথাই মনে পড়ে গেল। আমি জোরে চিৎকার করে বলে উঠলাম,

–পাপী কোথাকার, বের হয়ে যা। তোর ওপর আল্লাহর লা'নত।

লোকটি আমাদের এ পরিবারটির জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে করতে দ্রুত বেরিয়ে গেল। সে মনে করলো, পিতা–পুত্র দু'জনকেই জিনে আছর করেছে। তাই তাদের বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েছে। এরই মধ্যে আব্বা আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন,

–সুলায়মান, এমন অশোভন কথা বলার প্রয়োজন ছিল না। তার প্রস্তাব আমরা প্রত্যাখ্যান করেছি এটাই যথেষ্ট। এতটুকু বলে তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। তারপর বললেন– আল্লাহর নামে কসম করে বলছি, আমি ভোট কেন্দ্রে যাব না। এস, বেগ বা অন্য কাউকেই আমি ভোট দেব না।

–না, আব্বা, যাকে আপনি পছন্দ করেন, তাকে ভোট দেয়া আপনার উচিত।

–কখ্খনো না। এ নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন দরকার নেই। দু'জন প্রার্থীই মিথ্যাবাদী। অবশ্যই তাদের কোন একজন অন্যজন থেকে কিছুটা ভালো হবে।

–ভোট কেনাবেচা আর ধোকা দেয়া ছাড়া আর কোন ব্যাপারে একজনকে অন্যজনের ওপর প্রাধান্য দেয়া যায় না।

–উপযুক্ত প্রার্থীকে যখন আপনি ভোট দিবেন, তখন প্রকারান্তরে স্বাধীনতারই সহায়তা করবেন।

–স্বাধীনতা? আমি পায়খানায় যেতে চাইলে কেউ আমাকে বাধা দেয় না। সেখান থেকে যখন ইচ্ছা আমি ফিরি। আমার ইচ্ছামত আমি খাই, পান করি। ইচ্ছামত আমি ব্যয়

করি এবং আমার যা খুশি তাই আমি করি। এরপর আমার আর কি চাই? এর থেকেও কি বেশী স্বাধীনতা আর কিছু আছে?

–আব্বা, অবশ্যই আছে। যেমন ধরুন, আমাদের এ দেশটি ইংরেজরা দখল করে আছে। বাদশাহ নিজের ইচ্ছামত দেশটি চালাচ্ছেন। আর তাকে সাহায্য করছে মুষ্টিমেয় কিছু ভূস্বামী ও বিপুল ধন–সম্পদের অধিকারী কিছু পুঁজিপতি। তারাই দেশের সকল ধন–সম্পদ ভোগ–দখল করছে। তারা তাদের লালসা চরিতার্থের উদ্দেশ্যে আমাদের ব্যবহার করে থাকে। ব্যক্তিগত লক্ষ্য–উদ্দেশ্য ছাড়া তাদের আর কোন নীতি আদর্শ নেই।

–স্বাধীনতার সাথে এগুলোর সম্পর্ক কি?

–সত্যিকারের স্বাধীনতা যদি এ দেশে থাকতো, তাহলে প্রত্যেকেই তার চেষ্টা ও যোগ্যতা অনুযায়ী আপন আপন অধিকার লাভ করতো, গুটিকয়েক সৌভাগ্যবান অভিজাত শ্রেণীর লোকদের সন্তানরাই কেবল ফ্রী শিক্ষার সুযোগ লাভ করতো না। প্রকৃত স্বাধীনতা সেখানেই পাওয়া যায়, যেখানে পণ্যের মত ভোট কেনাবেচা হয় না।

মাথাটা একটু উঁচু করে আব্বা বললেন,

–তাহলে তুমি কি মনে কর, আমাদের গ্রাম থেকে দু'জন প্রার্থীর যে কোন একজন পাস করলেই স্বাধীনতার ব্যাপারে সাহায্য করা হবে?

আব্বার এ প্রশ্নের সন্তোষজনক কোন জবাব আমি খুঁজে পেলাম না। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই জিতুক বা আমার ইচ্ছা অনুযায়ী সংখ্যালঘু দলই দেশ শাসন করুক উভয়ই সমান। তাতে অবস্থার বিশেষ কোন হেরফের হবে না। তবুও আমি আব্বাকে বললাম,

–প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটি খুবই জটিল। তবে অধিকতর নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির নির্বাচনে জয়লাভ ব্যক্তি ও সমাজের জন্যে কল্যাণময় একটি পদক্ষেপ।

–আমার সামনে যোগ্যতর কাউকে আমি দেখি না। অধিক অর্থ যার আছে, নেতৃবৃন্দ এবং বাদশাহর লোকজন যার প্রতি প্রসন, বিজয় তার জন্যেই নির্ধারিত।

–তাই। বিষয়টি প্রত্যেক অনুভূতিশীল ব্যক্তির জন্যই দুঃখজনক।

–আর একজন লোক হচ্ছে নগর প্রধান। যাকে তার সন্দেহ হচ্ছে যে, সে তার মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দেবে না, তাকে ডেকে পাঠিয়ে হুমকি–ধমকি এবং ঋণ পরিশোধের জন্য চাপ দিচ্ছে।

–আল্লাহ এ অবস্থার পরিবর্তন করে দিন।

–আল্লাহুম্মা আমীন।

১৮

বিজ্ঞান গ্রুপে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করার সাথে সাথে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম 'কাসরুল আইনী' মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য আবেদন করবো। স্বভাবগতভাবেই বিজ্ঞান বিষয়ক পড়াশোনার প্রতি আমার ঝোঁক ছিল। আমার বেশ ধৈর্য ছিল। এ কারণে কোন প্রকার বিরক্তি বা শ্রান্তি ছাড়াই যে কোন প্রাকটিক্যাল কাজে আমি দীর্ঘক্ষণ ব্যস্ত থাকতে পারতাম।

আব্বা আমাকে বললেন,

–আমার ইচ্ছা তুমি একজন বিচারক হও। এ কারণে কোন ল' কলেজে ভর্তি হওয়াকেই আমি অগ্রাধিকার দেব।

–ভাগ্য যদি আমার প্রতি সুপ্রসন্ন না হয় এবং বিচারকের জন্য যে ক্লাস পাওয়া দরকার, তা যদি আমি লাভ করতে না পারি? তখন তো আমাকে একজন উকিলই হতে হবে এবং সারা জীবনই আমার ভবিষ্যতকে নিয়ে জুয়ার চালই চেলে যেতে হবে। কারণ উকালতি পেশার জন্য বিশেষ যোগ্যতা ও বাকপটুতার প্রয়োজন হয়। আর এ বাক্যবাগিশীর দিকটি অপেক্ষা আমি ব্যবহারিক জ্ঞানের দিকটিকেই অধিক প্রাধান্য দিয়ে থাকি।

–কিন্তু তুমি তো জান সুলায়মান, মেডিকেল কলেজের কোর্স বড় লম্বা, প্রায় সাত বছর লাগে এবং খরচও অনেক।

–এ কথা সত্য। তবে তার ফলও পাওয়া যাবে। তার জন্য সুনির্দিষ্ট উজ্জ্বল ভবিষ্যত রয়েছে। তাছাড়া ব্যক্তিগত ইচ্ছা–অনিচ্ছার প্রশ্নও রয়েছে। কোন একটি বিশেষ বিষয় আমার ওপর চাপিয়ে দেয়া হলে হয়তো তা আমার পদস্খলন ও বিপর্যয়ের কারণও হয়ে দাঁড়াতে পারে।

–তোমার যেটা ভাল লাগে সেটাই পড়। তোমার সব চাহিদা ও দাবী পূরণের জন্য আমি সব সময়ই প্রস্তুত, যদি তা আমাদের খাওয়া–পরা বাদ দিয়েও করতে হয়। আমরা শুধু তোমাকে একজন সফল মানুষ হিসেবে দেখতে চাই। তোমার আনন্দদায়ক ফলাফল আমাদের সব দুঃখ ও যন্ত্রণা মুছে দেয়।

আমি তক্ষুণি উঠে দাঁড়িয়ে আব্বার খসখসে শুকনো হাতটি টেনে নিয়ে চুমু খেলাম। এ হাতটি আমার জন্য খরচের ব্যাপারে কখ্খনো কার্পণ্য করে না। বললাম,

–আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন।

–যতদিন আমি বেঁচে আছি, কোন চিন্তা করো না।

আমার অন্তরে অসংখ্য অনুভূতি ভিড় করছিল। আব্বা আমার সামনে আগের মতই একজন সংগ্রামী পুরুষরূপেই আত্মপ্রকাশ করলেন। বহু সম্পদশালী বিখ্যাত নেতাদের থেকেও তিনি অনেক বড় বলে মনে হলো। তিনি ছিলেন একজন সাধারণ কৃষক। কিন্তু তাঁর দূরদৃষ্টি ও গভীর বিশ্বাস তাঁকে আমার ব্যক্তিগত আশা–আকাংখার ব্যাপারে আমার যুক্তিপূর্ণ কথা মেনে নেয়ার জন্য বাধ্য করল। তাঁর ধবধবে সাদা অন্তরে কোন রকম কূটতর্ক কিংবা বাজে অহমিকা ছিল না। মনে মনে কত আকাংখা করেছি, আহা যদি আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি এস, বেগের ভূমিকাটিও ঠিক আব্বার মতই হতো! কিন্তু সে আকাংখাটি ছিল নিষিদ্ধ ফলের বাগানে ক্ষুধার্তদের আকাংখার মতই অর্থহীন।

মা বেশ ফুর্তির সাথে বসে বসে কান লাগিয়ে আমাদের কথাবার্তা শুনছিলেন। তাঁর চেহারায় একটা গর্বের ভাব ফুটে উঠছিল। তিনি যখন হাসি হাসি মুখে ছোট্ট ছোট্ট বাক্যগুলো উচ্চারণ করছিলেন, তখন যে একটি মারাত্মক ব্যথা তাঁর অন্তরকে বিদীর্ণ করে দিচ্ছিল, তা তাঁর মুখ দেখে বোঝা কঠিন ছিল।

মা আমাকে বলেছিলেন,

–আমাদের আশা যদি পূর্ণ হতো সুলায়মান! এ কি কোনদিন সত্যি হবে যে, আমি তোমাকে একজন ডাক্তার হিসেবে দেখতে পাব। ফেরেশতাদের মত সাদা পোশাক পরে গলায় স্টেথিসকোপ ঝুলিয়ে তুমি ঘুরে বেড়াবে এবং গরীব–দুঃখীদের দুঃখের সহচর হবে।

–আম্মা, ইনশাআল্লাহ হবে। সময় খুব তাড়াতাড়ি চলে যাবে। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন।

–তোমাকে যদি আমি এ অবস্থায় দেখতে পাই, তাহলে সেটি হবে আমার জীবনের চরম পাওয়া। আমি তখন হাসিমুখে মরতে পারবো। এ কথা বলে তিনি তাঁর অভ্যাস মত দু' হাত আকাশের দিকে উঁচু করে অত্যন্ত বিনীতভাবে বলতে লাগলেন– ইয়া রব, তুমি আমাদের আশা পূর্ণ করো, তুমি তাকে ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিদের কুদৃষ্টি থেকে এবং সব ধরনের বিপদাপদ থেকে হিফাযত কর। ইয়া রব!

তাঁর সেই একনিষ্ঠ দোয়ার সাথে সাথে একটা শক্তি ও আবেগে আমার অন্তরও স্পন্দিত হচ্ছিলো। মা এবার আমার দিকে ফিরে আবারো বলতে লাগলেন,

–সুলায়মান, আল্লাহর নামে শপথ করে তোমাকে বলছি, আল্লাহ যখন তোমার আশা পূর্ণ করবেন, তখন তুমি মানুষের সাথে সদয় ব্যবহার করবে। তোমার মায়ের দিকে একটু তাকিয়ে দেখ। তোমার কি মনে থাকবে, আর্থিক দুরবস্থার কারণে আমি ডাক্তারের কাছে

যেতে পারিনি? হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে ওষুধ কেনার পয়সা জোগাড় করার কথা চিন্তা করে আমরা যখন দিশেহারা হয়ে পড়তাম, সে কথাটি কি তোমার মনে থাকবে, সুলায়মান?

–মা, আমি সবই মনে রাখবো।

–সেদিন আনন্দে যেন সবকিছু ভুলে যেও না এবং নার্সের মাধ্যমে নয়, নিজেই সাধারণ মানুষের সাথে যোগাযোগ রাখবে। তাহলে কে অভাবী আর কে অভাবী নয়, তা তুমি জানতে পারবে। বাবা, অল্পে তুষ্ট থাকা সত্যিই একটা মহৎ ব্যাপার। আল্লাহর সন্তুষ্টিই তোমার একমাত্র লক্ষ্য হোক।

–মা, আপনার কাছে আমি অঙ্গীকার করছি, আপনার উপদেশ সব সময় মনে রাখবো। মার কথাগুলো ছিল তাঁর সারা জীবনের অভিজ্ঞতা ও দুঃখ ভোগের নির্যাসস্বরূপ। তাঁর এ কথায় খুব বেশী অবাক হইনি। কেননা, আমি তো এর কারণ জানি। রোগগ্রস্তা হলেও বড় চমৎকার ও উদারচিত্তের অধিকারী এক মহীয়সী নারী তিনি। তাঁর এ বাণীগুলো চিরদিন আমার হৃদয়কন্দরে স্বর্ণাক্ষরে খোদাই করে রাখবো।

এদিকে সাঈদ হাফেজ তার কাগজপত্র জমা দিল সামরিক কলেজে ভর্তির জন্য। এই স্বপ্নই সে দীর্ঘ দিন ধরে দেখে আসছিল। সে তার দাদার মত বা তার সেই হতভাগ্য দাদার বন্ধু আরাবীর মত একজন সেনা–অফিসার হতে চায়। তখন তার সে কি আনন্দ, যখন সাঈদ মেডিকেল টেস্টে উতরে গেল! কিন্তু দুঃখের বিষয়, তার সে আনন্দ স্থায়ী হলো না। পুলিশ রিপোর্ট তার সামরিক কলেজে ভর্তির পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ালো। রিপোর্টে তারা উল্লেখ করেছে– সে একজন গোড়া স্বদেশী। বর্তমান সরকারের প্রতি তার শত্রুতামূলক মনোভাবের জন্য খ্যাত। সে একজন বিপ্লবী ও বিপজ্জনক ব্যক্তি। পুলিশ তাকে বহুবার গ্রেফতার করেছে।

সাঈদ আমাকে বললো,

–এখন কী করা যায় সুলায়মান? আমি যদি সামরিক কলেজে ভর্তি হতে না পারি, তাহলে আমার সব আশাই চুরমার হয়ে যাবে। তখন ট্রামের তলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করা ছাড়া তো গত্যন্তর থাকবে না।

–সাঈদ, ধৈর্য ধর। ব্যাপারটির জন্য তো শুধুমাত্র একটি সুপারিশপত্র অথবা কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তির একটু হস্তক্ষেপই যথেষ্ট।

–কী সর্বনাশ! কোন মাধ্যম ছাড়া কি মানুষ এখানে কোন অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে না?

–সত্যিই এটা দুঃখজনক।

–শোন সুলায়মান! যেমন করেই হোক, আমাকে সামরিক কলেজে ভর্তি হতেই হবে।

আমার পথের কাঁটা এই অতিরঞ্জিত পুলিশ রিপোর্ট দূর করে দিতে পারে কেবলমাত্র এমন একটি সুপারিশপত্রের অভাবেই আমি ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবো, তা আমি কল্পনাই করতে পারছি না।

–বিষয়টি তোমার আব্বার ওপর ছেড়ে দাও। এ ব্যাপারে তাঁর বহু অভিজ্ঞতা আছে এবং প্রচুর অর্থও আছে। বিসমার্ক তো বলেছেন– অর্থ দিয়ে সব কিছু কেনা যায়, এমন কি মান–সম্মানও।

–হাঁ, আমাকে ভর্তি হতেই হবে, তা সে অবৈধ পন্থায়ই হোক আর যাই হোক।

–শান্ত হও সাঈদ। তোমার কাজ চেষ্টা করা, বাকী আল্লাহর ইচ্ছা।

অবশেষে সাঈদের আশংকাই সত্য হলো। সামরিক কলেজে ভর্তির যে উদগ্র বাসনা তার ছিল, তা থেকে সে মাহরুম হলো। সে দারুণ আঘাত পেল। কুরাশিয়াতে বসে বসে সময় কাটাতে লাগলো। অন্য কোন কলেজে ভর্তির ব্যাপারে মোটেও আগ্রহ দেখালো না। ভাবসাব দেখে তার আব্বা একদিন তাকে বললেন– এমনভাবে সামরিক কলেজের গোঁ ধরে বসে আছ কেন?

সাঈদ বললো– আমার ঝোঁক সেদিকে এবং আমার আশা–আকাংখার বাস্তবায়ন সেখানেই হবে বলে আমি মনে করি। এছাড়া আর কিছু না।

–সাঈদ আমার ভয় হয়, শেষ পর্যন্ত লালফিতে ও তকমাধারী মূল্যবান পোশাক তোমাকে অহংকারী বানিয়ে না দেয়।

–না, আমি কেবল নিরস ও সংগ্রামী সৈনিক জীবনকেই ভালোবাসি।

–এখনকার সেনাবাহিনী সে তো আমাদের প্রভুর বাহিনী। তা শুধু শক্তির প্রদর্শনী মাত্র। যে কল্পনার ছবি তোমাকে হাতছানি দিচ্ছে, সেটা একটা ভ্রান্ত মরীচিকা। তার কোন অস্তিত্ব নেই।

–ভদ্র যারা, তারা যে কোন পরিবেশেই যাক না কেন, ভদ্রতা ও আত্মসম্মান বজায় রাখে। সেনাবাহিনীতে কিছু লেজুড়বৃত্তিধারী এবং স্বার্থপর লোক থাকলেও সেখানে বহু নিষ্ঠাবান দেশপ্রেমিকও আছে। তারা দেশের অপমান অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে। তারা আন্তরিকভাবে সকল প্রকার অশান্তি ও বিপর্যয় থেকে দূরে থাকে।

–বেটা, তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য।

–না, তারা অনেক। ধরে নিলাম তারা অল্প, কিন্তু আমি তাদের একজন হবো।

–রিপোর্টে তোমার সম্পর্কে তারা যা লিখেছে, তা সত্যি সত্যিই লিখেছে। আসলেই তুমি সরকারের জন্য মারাত্মক। তোমার কথা শুনে মনে হয় তুমি সামরিক কলেজের ছাত্র হতে চাও না, বরং সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের প্রতিনিধি হতে চাও। কিন্তু এ কথা

তোমার ভুলে গেলে চলবে না যে, সেনাবাহিনী কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয় নয়। সেখানে তুমি বক্তৃতা ও বিক্ষোভের মাধ্যমে আস্ফালন দেখাতে পারবে না। বিন্দুমাত্র সন্দেহ বা সামান্য ভুল তোমাকে চিরতরে নির্মূল করে দেবে। তোমার ভবিষ্যত চুরমার করে দেবে।

–আব্বা এখনো আমি রাস্তায়, সামরিক কলেজ এখনো আমাকে গ্রহণ করেনি, সুতরাং এত তাড়াতাড়ি বিপদ আসার কোন কারণ নেই।

–তোমাকে প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও এখনো তুমি ভর্তির জন্য গোঁ ধরে রয়েছো?

–নিশ্চয়ই আমি কখ্খনো আশা ছাড়বো না।

–তুমি এমন যেদ ধরে থাকলে পরের বার এই অসম্ভবকে সম্ভব করার চেষ্টা করবো। ইনশাআল্লাহ ভর্তির জন্য তুমি নির্বাচিত হবে। এখন আপাতত আইন বিভাগে ভর্তি হও, যাতে শক্ত হাতে লাঠিটি ধরতে পার এবং সতর্ক হতে পার।

–কিন্তু ফুয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির শেষ তারিখ তো চলে গেছে।

–ইসকান্দারিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হতে যাও। সেটাই তোমার জন্য সহজ হবে।

এদিকে আমি কায়রো ফেরার পর সুরাইয়ার পাশে বেশ কিছু দিন সুখেই কাটালাম। সে তার প্রীতি ও ভালোবাসা দিয়ে আমার অন্তর থেকে অতীতের সব গ্লানি মুছে দিল। সেই অতীত এবং চিঠির ঘটনাটি, শুধুমাত্র একটি আনন্দদায়ক স্মৃতি এবং হাসির খোরাক হয়ে থাকতো। এ নিয়ে আমরা অনেক হাসি–ঠাট্টা ও রসিকতা করতাম। 'কাসরুন নীল' ব্রীজের নিকট আমরা দু'জন পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে একদিন সুবাইয়াকে বললাম, প্রিন্সিপ্যাল দু'সপ্তাহের জন্য তোমাকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করেছিল, সেকথা কি তোমার মনে আছে?

–মনে থাকবে না? সে তো অবিস্মরণীয় ঘটনা।

–স্কুল থেকে বহিষ্কারের মানে কি? তার মানে হচ্ছে তুমি উচ্ছৃংখল এবং চরিত্রহীন। সুরাইয়া জোরে হেসে উঠে বললো,

–শোনো সুলায়মান, বর্তমানে স্কুল আমার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। তুমি যদি আর একটি চিঠি লিখে দু' অথবা তিন সপ্তাহের জন্য আমাকে বহিষ্কারে সাহায্য করতে, তাহলে আমার বড়ই উপকার হতো।

–আমি কি বলিনি, তুমি উচ্ছৃংখল? এমন চিঠি লেখা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়।

–অসম্ভব মোটেই নয়, বরং খুবই সহজ কাজ। তোমাকে কিভাবে চিঠি লেখাতে হয়,

তা আমি জানি।

–কিভাবে?

–আজ থেকে তোমার সাথে কথা বলবো না, তোমার সাথে বেড়াতে বেরোবো না, এমন কি জানালা দিয়েও তুমি আমাকে দেখতে পাবে না।

সজোরে হেসে উঠে তাকে বললাম,

–খুব শিগগিরই আমি এ কথা তোমার মাকে বলবো এবং তোমার বিরুদ্ধে তাঁর কাছে নালিশ করবো।

–আমার কিছুই হবে না। যা ইচ্ছে করার স্বাধীনতা আমার আছে।

–তোমার যা মনে চায় বল। আমি তোমাকে ছিনিয়ে আনবো, আমার সাথে বেড়াতে যেতে বাধ্য করবো।

–মনে হচ্ছে জোর যার মুল্লুক তার–প্রবাদে তুমি বিশ্বাসী?

–এছাড়া কি আর কোন উপায় আছে?

মৃদু হেসে উঠে সুরাইয়া বললো,

–চলো। আমাদের ফিরতে দেরী হয়ে গেল। চলো।

এভাবে সুরাইয়া আমার জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হলো। তার ও আমার চাচার পরিবারের জানাজানির মধ্যেই আমাদের পরস্পরের দেখাশোনা ও মেলামেশা বেড়ে গেল। তাতে আমার আবেগের তীব্রতা অনেক কমে গেল। এই সীমিত স্বাধীনতা এবং প্রকাশ্য ও নিষ্কলুষ বন্ধুত্ব আমাদের সম্পর্ক ও পারস্পরিক বিশ্বাসকে আরো গভীর করে তুললো।

যেমনটি আমি আগেই বলেছি, সুরাইয়া ছিল শক্তিমতি ও স্পষ্টভাষিণী। যখনই তার সাথে একাকী বেড়াতে গিয়েছি, তার শক্তি ও প্রভাব আমি মর্মে মর্মে অনুভব করেছি। তার চেহারার দিকে তাকালেই আমার অন্তর যেন আমাকে কিছু একটা বলে দিত। তার প্রতি একটা সশ্রদ্ধ ভীতিও অনুভব করতাম। তার আব্বা তাকে শিখিয়েছেন, সম্মানই হচ্ছে জীবন। আর আম্মা তাকে শিখিয়েছেন, তুমিই হবে সব ধরনের পরিবেশ–পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রক। আর তুমি যদি আত্মসম্মান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে পার তোমার প্রভাব ও প্রতিপত্তি চির অটুট থাকবে।

প্রথম প্রথম আমি তাকে বহুবার স্পর্শ ও চুমু দেয়ার চিন্তা করেছি। কিন্তু তার

আত্মশক্তি, অনমনীয় মনোভাব এবং অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় নির্ভীক দৃষ্টির সামনে আমার সকল সংকল্প ধূলিসাৎ হয়ে গেছে।

তার এই যে আচরণ, তা কি আমার মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি করেছিল? আমাকে কি তার থেকে দূরে নিয়ে গিয়েছিল?

না। দিন দিন তার প্রতি আমার ভালোবাসা বৃদ্ধি পেয়েছিল, তার মর্যাদা বেড়ে গিয়েছিল। আমার কাছে সে সততা ও পবিত্রতার এক মহান ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। আমার মধ্যে তার প্রতি এক প্রবল শ্রদ্ধাবোধ জেগে ওঠে। সেই মহত্ত্বের পাশে অবস্থানের ব্যাপারে আমার মধ্যে এক রকম ভীতি ও দুর্বলতা পয়দা হয়েছিল।

শহুরে মেয়েরা, যাদেরকে অসতী ও দেমাকী বলে মনে করতাম এবং যারা শুধু নামটুকু ও ভালোবাসার বাহ্যিক খোলসটুকু ছাড়া আর কিছু জানে না বলে ধারণা করতাম, খুব দ্রুত তাদের সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হলো। আমি মনে করতাম, তাদেরকে বিয়ে করা মানে নির্বুদ্ধিতা। এই বিয়ে অনিশ্চিত জুয়া খেলা ছাড়া কিছু নয়। পক্ষান্তরে গ্রামের মেয়েরা প্রকৃতিগতভাবেই সহজ-সরল। শান্তি ও বিশ্বাসের জন্য অধিক উপযোগী। বিয়ে এবং পরিবারের কল্যাণের জন্য অধিক নির্ভরযোগ্য। আমার দৃষ্টিভঙ্গির অনেক পরিবর্তন ঘটে গেল। নোংরামি ও নিচতা থেকে দূরে থেকে সুরাইয়া আমার জন্য একটি দৃষ্টান্তে পরিণত হলো। সে আমার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা কেড়ে নিল। হাঁ, মেয়েরাই পারে নিষ্পাপ ফুলের মত ভালোবাসার উৎস হতে। সেই পারে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার আবরণে ছড়িয়ে পড়তে। সুরাইয়ার সাথে আমার সম্পর্ক আমাকে এ কথাটিই শিখিয়েছে। আমার সাথে সুরাইয়ার আচরণ এমনিভাবে চলতে লাগলো। মাত্র একবার ছাড়া কখ্খনো এর ব্যতিক্রম হয়নি। সে কথাটি পরে বলছি।

১৯

দেশের বিভিন্ন সমস্যার যুক্তিসঙ্গত সমাধানে আসার ব্যাপারে জনগণের প্রতীক্ষা দীর্ঘ হতে চললো। সংখ্যাগরিষ্ঠের সরকার কায়েম হলো। সকলের আশা, তারা জনগণের আশা-আকাংখার প্রতিফলন ঘটাবে, তাদের মুখপাত্রের ভূমিকা পালন করবে। জনগণের জন্যে কণ্ঠ মিলিয়ে তারাও পূর্ণ স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসনের দাবী তুলবে।

নতুন করে আলোচনা, মতবিনিময়, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চটকদার অঙ্গীকারের

ধারাবাহিকতা শুরু হলো। আর বার বার এমনটি দেখে দেখে জনগণের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। ১৯৩৬ সালের চুক্তি বাতিল, অস্ত্র বহনের আইনগত স্বীকৃতি, সুয়েজে জাতীয় প্রতিরোধ আন্দোলনে শক্তি ও সাহস জোগানো ইত্যাদি দাবীতে জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়লো।

জাতীয় চাপের মুখে আমাদের ও ইংরেজদের মধ্যে যে চুক্তি ছিল মূলত তা বাতিল হয়ে গেল। বাদশাহর অসম্মতি সত্ত্বেও দলে দলে যুবকরা সুয়েজের দিকে যাত্রা করলো। বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ শুরু হলো। আর এসব সংঘর্ষে অংশ নিল শ্রমিক, ছাত্র, কর্মচারী, সেনাবাহিনীর অফিসার ও কৃষকবৃন্দ। ইংরেজ সেনা ছাউনিতে ভীতি ও শঙ্কা ছড়িয়ে পড়লো। তারা বিভিন্ন রকমের বর্বর পদ্ধতি ও হিংস্র আচরণের আশ্রয় নিল। তল্লাশী চালানোর নামে কঠোরতা ও বর্বরতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখালো। বিশেষত মিসরীয় শ্রমিক সংগঠনগুলো বিদ্রোহ ঘোষণার পর। সব ধরনের ধমক ও ভয়–ভীতি প্রদর্শন সত্ত্বেও তারা কর্মস্থল ত্যাগ করলো।

বিজয় লাভের ব্যাপারে জনগণ ছিল অনমনীয় ও অটল। দৈনিক পত্রিকার পৃষ্ঠাগুলোতে দাতা ও সাহায্যকারী ব্যক্তিদের নামের তালিকা বৃদ্ধি পেতে লাগলো। পত্রিকাগুলো ধীরে ধীরে বাদশাহর গুণকীর্তনের ধারা কমিয়ে দিল।

আমার চাচা আমাকে বললেন, আমার ভয় হচ্ছে, এই প্রতিরোধ আন্দোলনের পশ্চাতে বাদশাহ ছুরিকাঘাত করে না বসেন।

–তা সম্ভব নয়। তিনিও তো চুক্তি বাতিলের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন।

–কখ্খনো না। বলা যেতে পারে, তিনি সমর্থন করতেই পারেন না। তুমি কি ভুলে গেছ তিনি ফিলিস্তীন সম্পর্কেও সমর্থন দিয়েছিলেন?

–এবারকার অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম।

–খুব বেশী একটা পার্থক্য নেই। তোমার কথা অনুযায়ী স্বাদেশিকতার রোগ যদি বাদশাহকে পেয়েও বসে, তাহলে সেই ঐতিহাসিক ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর তামাশার পুনরাবৃত্তি ছাড়া ইংরেজদের আর কোন উপায় থাকবে না।

–বাদশাহর ভূমিকার ক্ষেত্রে যদি তেমন বেশী রকমফের না হয়, তাহলে তেমন কিছু এসে–যাবে না। কারণ, জনগণ সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং দীর্ঘ সংগ্রামের দৃঢ়সংকল্প ব্যক্ত করেছে। ইংরেজ আমাদের পঙ্গু ও অক্ষমদের ছাড়া তাদের কোন ঘাঁটিতেই পৌঁছুতে পারবে না।

–বিশেষত এই পয়েন্টে তোমার কথাই ঠিক। জনগণ বোঝে বাদশাহ পেছন থেকে ছুরিকাঘাত করতে পারেন। তা সত্ত্বেও তারা তাদের অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে সামনের

দিকে ধাবিত হয়েছে। কিন্তু আবারো যদি বাদশাহ ষড়যন্ত্র করেন, তাহলে ঘটনাটি কোন্ দিকে গড়াবে?

–জনগণ তার বিরুদ্ধে আর একটি চূড়ান্ত যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে।

–তাতে যুদ্ধের বোঝা আরো বেড়ে যাবে এবং জনতার বিজয়ের পাল্লা ভারী নাও হতে পারে।

–সুলায়মান, তুমি বিশ্বাস করো, রাস্তা যত দীর্ঘ এবং সংঘাত যত তীব্রই হোক না কেন, সব সময় জনগণেরই জয় হয়। আর সব যুদ্ধের ফলাফল কূপ থেকে পানি তোলার বালতির মত। একবার এর হাতে, অন্যবার ওর হাতে। তবে মু'মিন জাতির ইচ্ছা আল্লাহরই ইচ্ছা।

–হুঁ। তবে পথ বড় দীর্ঘ। দীর্ঘ এবং কন্টকাকীর্ণ।

অপ্রত্যাশিতভাবে সাঈদ হাফেজ হঠাৎ এসে আমার কাছে উপস্থিত হলো। তার পরনে ছিল ঘিয়ে রঙ্গের স্যুট। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ইসকান্দারিয়া আর আইন বিভাগ কেমন লাগছে?

সাঈদ জবাব দিল– ইসকান্দারিয়া ও আইন বিভাগের সাথে আমার সম্পর্ক নেই। এখন সংগ্রামের সময়। সংগ্রামই এখন আমার সার্বক্ষণিক চিন্তা, বুঝতে পারছ?

–সাঈদ, এত উত্তেজিত হচ্ছো কেন? তোমার আব্বা যদি শায়খ হাফেজ হিটলার নামের উপযুক্ত হন, তাহলে আমি মনে করি তোমাকে সাঈদ নেপোলিয়ন বলা উচিত।

–দু'ঘন্টার বেশী তোমার সঙ্গে কাটাতে পারবো না। দু'ঘন্টা পরেই তোমাকে ছেড়ে চলে যাব।

–কোথায়?

–তুমি জান না? আমি যাব সুয়েজের দিকে। আমরা চুক্তি বাতিল করে অস্ত্র হাতে তুলে নেয়ার দাবী করেছিলাম। বাস্তবে আমরা সে দাবী আদায় করতে পেরেছি। তারপর আর বাকী থাকলো কি? বিষয়টি কি শুধুমাত্র দাবী আর শ্লোগানই ছিল নাকি?

–সাঈদ, আল্লাহ তোমার সংগ্রামকে কামিয়াব করুন। তোমার এ সফরের কথা কি তোমার আব্বা জানেন?

–হাতে সময় ছিল অল্প। তারাও তাড়াতাড়ি বের হওয়ার জন্য তাগাদা দিল। আব্বাকে একটি চিঠি লেখার জন্য একটু কষ্ট দেব।

–কিন্তু!

–'কিন্তু' আবার কি? জানি, তুমি কি বলবে। এ জীবন আমার। এটা যেমন ইচ্ছা

ব্যবহার করবো। এতে কারো হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। আব্বা দুঃখ পেতে পারেন বা ক্ষুব্ধ হতে পারেন এবং আমাকে আত্মঘাতী বলে মনেও করতে পারেন, কিন্তু কোন কিছুই আমার সংকল্প থেকে বিন্দুমাত্র টলাতে পারবে না। আর কে জেনেছে, আমার কাজে আব্বা বিক্ষুব্ধ হবেন? সংগ্রামী ও দেশপ্রেমিক হিসেবে তিনি আমার থেকে কোন অংশে কম নন।

–বরং তিনিই তো তোমার মধ্যে সংগ্রামী চেতনার বীজ বপন করেছেন, আর তা লালন–পালনও করেছেন।

সাঈদ দাঁতে দাঁত কেটে তার বাদামী রঙ্গের একটি হাত মুষ্টিবদ্ধ করে বালিশের ওপর সজোরে আঘাত দিয়ে বললো– এ পাষন্ডদের থেকে অবশ্যই প্রতিশোধ নিতে হবে।

সাঈদ কিসের প্রতিশোধ নিতে চায়? দাদার, বোনের, সামরিক কলেজে ভর্তির বঞ্চনার, যুদ্ধের ধ্বংস ও ভয়াবহতার, মুরসে আবু আফারের ছেলের, যে তাকে বিদ্রুপ করে বলেছিল, বাসীমা গৃহ–পরিচারিকা, বিপর্যস্ত রাজনৈতিক অঙ্গনের, সামাজিক নিপীড়নের, ঘুষ, অশ্লীলতা ইত্যাদির। কারণ, এর সব কিছুই উপনিবেশ নামক একটি রোগের পার্শ্ব–প্রতিক্রিয়া।

দীর্ঘদেহী সাঈদ হাফেজ বাদামী রঙ্গের পোশাক পরে ব্যাগটি হাতে নিয়ে চলে গেল। সে চলে গেল মরণের দিকে, কিন্তু আমি বলি জীবনের দিকে গমনকারী কাফেলার সাথে মিলিত হওয়ার জন্য। যে কাফেলার হাতে কিছু ভোঁতা অস্ত্র ছাড়া আর কিছু নেই এবং যাদের অন্তরের মযবুত ঈমান ছাড়া গর্ব করার তেমন কিছু নেই।

আমি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে যুদ্ধের খবরাখবর অনুসরণ করতে লাগলাম। এখানে বিস্ফোরণ, সেখানে অ্যাম্বুশ, ব্রীজে মাইন বিস্ফোরণ, ডিনামাইট দিয়ে ট্রেন লাইন বিধ্বস্ত, ইংরেজ কমান্ডারদের বাসগৃহে প্রচারপত্র নিক্ষেপ, তাতে লেখা আছে মুক্তিসেনারা তোমাদের আশেপাশে আছে। কায়রো, ইসকান্দারিয়া ও সুয়েজ সর্বত্র শহীদদের কাফেলা, ঘরে ঘরে বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী। শিশু–কিশোররা শত্রুবাহিনীর ছাউনিতে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। দীর্ঘকাল যাবত কঠোর শৃংখলে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও সমগ্র জাতি আজ আন্দোলিত হয়ে উঠেছে।

সাঈদ যেমন চেয়েছিল, ঠিক তেমনি শায়খ হাফেজকে একটি চিঠি লিখতে ভুলিনি। সহানুভূতি আর উৎসাহব্যঞ্জক বাক্য দিয়ে সেটি ভরে ফেলেছিলাম। মনে হয় শায়খ হাফেজ আমার অবস্থার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন এবং শিশুসুলভ কাজ দেখে মনে মনে হেসেছিলেন। আমার কাছে জবাবী চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন– সুলায়মান, আল্লাহ তোমাকে মাফ করুন! তুমি কি মনে করেছো তাকে দেশের সেবা থেকে আটকে রাখতাম?

বেটা, আত্মোৎসর্গের রক্তধারা আমাদের পিতা থেকে পুত্রের শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হচ্ছে। সাঈদের পাশে থাকার কতই না ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বার্ধক্য যে আমার দেহ ও চর্মকে দুর্বল করে দিয়েছে। আল্লাহ তাকে প্রতিদান দিন। এ কথা সত্যি যে, তার মা ভীষণ কান্নাকাটি করছে। তার ধারণা, বাসীমাকে হারানোর জন্য আমি দায়ী এবং সাঈদের ব্যাপারে আমিই হবো অপরাধী। আর এ কারণে তার মাথায় আমার সম্পর্কে কিছু বিরূপ চিন্তা ও ধারণা জন্ম নিয়েছে। তবে আমার স্ত্রী খাদরার কোন দোষ নেই। কারণ সে মূর্খ। সাঈদের জন্য সুন্দর একটা চাকরি, ভালো একটা বিয়ে এবং শান্তি ও নিরাপত্তা ছাড়া জীবনে সে আর কিছুই কামনা করে না। আত্মত্যাগ, সংগ্রাম ও স্বদেশপ্রেম-তার কাছে কেবল কিছু অস্পষ্ট সমার্থবোধক ও জটিল শব্দ, যার কোন অর্থ তার কাছে নেই। এ কারণে, সে সরকার ও ইংরেজকে গালি দেয়। একই সাথে গালি দেয় আমাকেও। কারণ, তার সাঈদকে হারানোর জন্য আমরা সবাই সমভাবে দায়ী।

আমি তাকে বললাম, খাদরা, তুমি মনোক্ষুণ্ন হয়ো না। তোমার ছেলে তো একজন বীর যোদ্ধা।

উত্তেজিত কণ্ঠে সে বললো, বীর? তুমি, শায়খ হাফেজ, সারাটি জীবন তোমার পাগলামিতে কেটে গেল। আর সে পাগলামির উত্তরাধিকারী বানিয়ে গেলে তোমার ছেলেকে। হায়রে আমার কপাল!

সে যে অবুঝ, এ ব্যাপারে তুমি কি আমার সাথে একমত নও সুলায়মান? আর আমি তো রাত-দিন নামায পড়ি এবং সাঈদ ও তার বন্ধু-বান্ধবদের জন্য দোয়া করি, আল্লাহ যেন তাদের মুক্তি ও সফলতা দান করেন। এই দূর থেকেও তাদের প্রতিটি পদক্ষেপের সাথে সাথে আমার অন্তর ধুঁকধুঁক করে, তাদের সংবাদ জানার জন্য আমার হৃদয় ব্যাকুল হয়ে থাকে।

এ দিকে একটি সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেল। সমগ্র মিসর ক্রোধ ও উত্তেজনায় ফেটে পড়লো। ইসমাঈলিয়ার গবর্নর হাউসে ইংরেজরা পাশবিক আক্রমণ চালালো। বন্দুকের গুলীতে নিরাপত্তা বাহিনীর অসংখ্য জওয়ান ঢলে পড়লো। এ মর্মান্তিক ঘটনা মিসরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সমগ্র জাতিকে আন্দোলিত করে তুললো। কায়রোতে জ্বালাও-পোড়াও, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও লুটতরাজ শুরু হলো। বাড়ী-ঘর ও অফিস-আদালতে আগুন জ্বলতে লাগলো। আর এমন পরিস্থিতির মধ্যে বাদশাহ রাজ-প্রাসাদে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নতুন সন্তানের জন্মোৎসব পালনে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। একের পর এক মন্ত্রী নিয়োগ ও বদল করতে লাগলেন। কায়রোর রজনী প্রাণহীন ও নীরব হয়ে পড়লো। রাতে

লোক চলাচল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। প্রতিরোধ আন্দোলন চুরমার করে দেয়া হলো। গোটা মিসর এক ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিন যাপন করতে লাগলো।

স্বেচ্ছাসেবী যুবকরা দলে দলে সুয়েজ থেকে ফিরে এলো। কিন্তু সাঈদ হাফেজ ফিরে এলো না। ভয়–ভীতি ও নিপীড়নের স্টিমরোলারের চাকায় পিষ্ট হয়ে মুক্তি ও প্রতিরোধের সকল সংগীত থেমে গেল। এমন কি রেডিও–টেলিভিশন থেকেও দেশাত্মবোধক কোন সংগীত এখন আর শোনা যায় না। এখন সেখান থেকে শুধু ভেসে আসে প্রেম ও ভক্তিমূলক গানেরপ্যানপ্যানানি।

শায়খ হাফেজ কাঁদতে লাগলেন। তাঁর অশ্রু আমাকে ব্যথিত করে তুললো। আমিও কিছুক্ষণ তাঁর সাথে কাঁদলাম। তারপর বললাম– যুদ্ধে সাঈদ শহীদ হবে তা কি আগে থেকে আপনার ধারণা ছিল না?

–হুঁ, ছিল। কিন্তু আমি তো তার বাবা। তাছাড়া তাদের সংগ্রামের পেছনে যে ষড়যন্ত্র ছুরিকাঘাত করেছে, তাই আমাকে কাঁদিয়েছে। বরং তা আমার ছেলে হারানোর চেয়েও মারাত্মক আঘাত। যারা এই সংগ্রাম ও প্রতিরোধ আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করেছে এবং লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত করেছে, তাদের প্রতি ঘৃণা ও প্রতিশোধস্পৃহায় আমার অন্তর ভরে গেছে।

তিনি আমাকে ঘিয়ে রঙ্গের পোশাক পরা সাঈদের একটি ছবি দেখাতে দেখাতে বললেন, 'আমাদের প্রতিশোধ নেয়া উচিত।' মনে মনে বললাম– সত্যিই কি তিনি প্রতিশোধ নিয়ে তাঁর এবং এই শৃংখলিত জাতির মনের আশা মেটাতে পারবেন? এদিকে সাঈদের আম্মা খাদরা ফ্যালফ্যাল করে সারাক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। তিনি প্রায় অর্ধ পাগল। কখনও কখনও বসে বসে বাসীমার জন্য কাঁদেন এবং সেই সাথে সাঈদের জন্যও। কথায় বলে, একটা আরেকটিকে মনে করিয়ে দেয়। মোট কথা, এ পরিবারটির জীবন আহাজারির নরকে পরিণত হয়েছে।

একদিন সন্ধ্যা বেলায় শায়খ হাফেজ আমাদের বাড়ীতে এলেন। পাঁচজন লোকের নাম লেখা ছোট্ট এক টুকরো কাগজ তিনি আমার সামনে ছুঁড়ে মারলেন। তার মধ্যে সাঈদ হাফেজের নামটিও লেখা। অর্থ জিজ্ঞেস করার আগেই তিনি বললেন,

–মুক্তি সংস্থার কমান্ড কাউন্সিল থেকে আমি জেনেছি, এ পাঁচজন শহীদ হয়নি, যেমনটি প্রচারিত হয়েছে। তবে তারা ইংরেজদের হাতে বন্দী হয়েছে।

–তাহলে সাঈদ এখনো জীবিত; কিন্তু ইংরেজ ক্যান্টনমেন্টে বন্দী?

–তাইতো মনে হচ্ছে।

–আল–হামদু লিল্লাহ। আল্লাহর হাজার শোকর।

ইনশাআল্লাহ আগামীকাল সকালে আমি ও অন্য বন্দীদের অভিভাবকরা এক সাথে প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করবো এবং তাদেরকে ছেড়ে দেয়ার জন্য সরকারীভাবে বৃটিশ

সরকারের কাছে দাবী জানানোর জন্য তাঁকে অনুরোধ করবো।

–আমিও যাব আপনাদের সাথে।

–সংবাদপত্রের ওপর কড়া বিধি–নিষেধ এবং সামরিক আইন বলবৎ থাকা সত্ত্বেও কোন কোন সাংবাদিক আমাকে কথা দিয়েছেন যে, তারা বিষয়টি নিয়ে পত্রিকায় লেখালেখি করবেন।

শায়খ হাফেজের মাথায় চুমু দিলাম। সাঈদ যে জীবনে বেঁচে আছে, সে জন্য শায়খ হাফেজকে ধন্যবাদ দেয়ার জন্য আমি আমার স্থান থেকে লাফিয়ে উঠে পড়লাম।

বসে বসে ভাবতে লাগলাম, সাঈদ ফিরে এলে কিভাবে তাকে স্বাগতম জানাবো? এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করবো। আবেগ আমাকে এতখানি পেয়ে বসলো যে, একটি গদ্য কবিতা রচনার কথা চিন্তা করে ফেললাম। গদ্য কবিতার কথা চিন্তা করলাম এ জন্য যে, আমি ছিলাম মাকামাতে হারীরীর গদ্য ছন্দ ও জাহিলী যুগের ক্লাসিক কাব্য ছন্দের ঘোর দুশমন।

বন্দী বীর সন্তানদের ওপর ইংরেজদের অমানুষিক নির্যাতনের নানা রকম সংবাদ একের পর এক আসতে লাগলো। তাদের দেহে হিংস্র কুকুরের দাঁত বসিয়ে দেয়া, বরফের মত ঠান্ডা পানিতে নিক্ষেপ করা, কোন খাদ্য খাবার না দিয়ে অনাহারে থাকতে বাধ্য করা, শরীরে চাবুক মেরে আগুনের ফুলকি ঝরিয়ে দেয়া, জোর করে কাঁচা নখ তুলে ফেলা, চুল টেনে ছিঁড়ে ফেলা ইত্যাদি সম্পর্কে আমরা অনেক কথাই শুনতাম।

এসব খবর শুনে শায়খ হাফেজ খুবই মর্মাহত হতেন। তার দু'চোখ থেকে তপ্ত অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তো। কিন্তু তিনি বারবার আল্লাহর শোকর আদায় করতেন শুধু এ জন্য যে, তাঁর ছেলেটি এখনও জীবনে বেঁচে আছে। শাস্তি ও নির্যাতন যতই তীব্র হোক না কেন, সাঈদ সেসব নির্যাতন সহ্য করতে পারবে।

অবশেষে বন্দী পাঁচজন ফিরে এলো। দীর্ঘদিন পর তারা ফিরে এলো। ভীতি ও শংকার কালো এ দিনগুলো তারা মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে কাটিয়েছে। পরের দিন তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হলে গগনবিদারী শ্লোগান, মুহুর্মুহু করতালি এবং বিরাট সম্বর্ধনার মাধ্যমে তাদেরকে স্বাগত জানানো হলো। হাজার হাজার মানুষ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাদেরকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। তখনও তাদের শরীরে অত্যাচার–উৎপীড়নের চিহ্ন ছিল সুস্পষ্ট। সামরিক আইন বলবৎ থাকা, মানুষের মুখে তালা মারা ও কণ্ঠরোধকারী এক ভয়াবহ পরিস্থিতি বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে অভিনন্দন জানানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে অসংখ্য মানুষের ঢল নেমেছিল।

২০

'কারুন' উপসাগরের তীরে স্কাউটদের স্থায়ী শিবিরে একটি প্রশিক্ষণ কোর্সে আমাদের বিভাগের সিনিয়র স্কাউটদের একটি দল অংশগ্রহণ করলো। সপ্তাহব্যাপী এ প্রমোদ ভ্রমণে আমিও সঙ্গী হলাম। ভ্রমণ শেষে সন্ধ্যার একটু আগে আমি ফিরলাম। তুলুনী রোড তখন সম্পূর্ণ নীরব। কোথাও কোন সাড়া-শব্দ নেই। রাতের ম্লান আলোয় সড়কটিকে আরো নীরব ও ভূতুড়ে মনে হচ্ছিল। আমাদের বাসার সামনে একটি স্টেজ, নানা বর্ণের অসংখ্য বাতি। সবুজ ও লাল রঙের কিছু ফ্লাগও আমার নজরে পড়লো। দীর্ঘ ভ্রমণে আমি ছিলাম অত্যন্ত ক্লান্ত। তাই বাসায় পৌছেই ঘুমানোর জন্য খুব তাড়াতাড়ি কামরায় ঢুকে গেলাম। সকাল প্রায় আটটার দিকে চাচী মৃদুভাবে আমাকে ধাক্কা দিয়ে বললেন- অনেক বেশী ঘুমিয়েছ। ফজরের নামাযটি চলে গেল। উঠবে না?

আমি লাফিয়ে উঠে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' পাঠ করলাম। বিছানায় উঠে বসলেও তখনো আমার চোখ থেকে ঘুম যায়নি। আমি আমার ভারী দেহটি টেনে তোলার চেষ্টা করতে লাগলাম।

সকালে নাশতার পর জানালাটি খোলার ইচ্ছা করলাম। দীর্ঘদিন পর সুরাইয়াকে এক নজর দেখার জন্য মনটি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আমার মনে হলো, এ সময় তো তার স্কুলে থাকার কথা। আমি অবাক হয়ে গেলাম। দেখতে পেলাম সে তাদের জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছে এবং হাত উঠিয়ে সহাস্য মুখে আমাকে সালাম জানাচ্ছে। আরো দেখতে পেলাম একজন শ্রমিক কাঠের সিঁড়িতে উঠে ফ্লাগ ও রং-বেরংয়ের বাতিগুলো নামিয়ে ফেলছে। এমন সময় বুঝতে পারলাম, চাচী আমার কামরায় প্রবেশ করেছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম- গত রাতে এ স্টেজ ও সাজগোছ কি জন্য হয়েছিল?

-কেন, তুমি জান না?

-আমাকে কে বলবে?

-না, হয়েছে, বুঝতে পেরেছি, তুমি কিভাবে জানবে যে, গত রাতে সুরাইয়ার বিয়ের আক্দ হয়ে গেছে এবং অল্প কিছুদিন পরেই আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে।

-সুরাইয়ার বিয়ের আক্দ! হায়রে কপাল!

আমি খুব দ্রুত আবেগের সাথে কথাগুলো বলে ফেল্লাম। আমার জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলাম না।

–হাঁ। তোমার অবাক হওয়ারই কথা। কারণ, তারা তোমাকে অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য দাওয়াত দেয়নি। তবে তাদের কোন দোষ দেয়া যায় না। তুমি তো কায়রোয় ছিলে না, তোমার ঠিকানাও তারা জানতো না। যাই হোক, সুরাইয়া কিন্তু তোমার জন্য বেশ বিমর্ষ ছিল। তবে সে তোমার জন্য শরবত আর খাবার জিনিস রেখে দিয়েছে।

এ খবরটি ছিল আমার ওপর বজ্রাঘাতের মত। কারো মাথায় শক্ত পাথর দিয়ে আঘাত করলে তার সমগ্র সত্তা যেমন কেঁপে ওঠে, তার মস্তিষ্কের ঐক্যসূত্র বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, সে কিছুই চিন্তা করতে পারে না, কথা বলতে পারে না, আমিও যেন তেমন হয়ে গেলাম। মনে মনে বললাম, এ অসম্ভব। কারণ, যা ঘটেছে তা কল্পনাও করিনি এবং এমন কিছু ঘটতে পারে তা চিন্তাও করিনি কখনো। সুরাইয়া তাহলে অন্যের হতে যাচ্ছে? এ যে মর্মান্তিক বেদনাদায়ক। এটা কিছুতেই হতে পারে না। সেই কতকাল থেকে স্বপ্ন দেখে আসছি, সে এককভাবে আমারই হবে, তাকে বিয়ে করবো। সে ছাড়া আমার জীবন হবে বৃথা। বিষয়টি আমার কাছে মনে হয়েছে খুবই সহজ ও সামান্য। কারণ, আমি তার উপযুক্ত পাত্র, সেও আমার উপযুক্ত পাত্রী। আমাদের পারস্পরিক অনুভূতির বিনিময়ও হয়েছে।

একটু থেমে চাচী সব কিছু খুলে বললেন। জিজ্ঞেস করলাম, এমন আকস্মিকভাবে বিয়ে হলো কিভাবে?

–অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেয়েদের বিয়ে এমন আকস্মিকভাবেই হয়ে থাকে।

–হতে পারে। কিন্তু সুরাইয়ার ক্ষেত্রে এমনটি হলো কি করে?

–খলীফার অর্থ দফতরের চীফ, একই সাথে সুরাইয়ার বাপেরও বস। পঁয়তাল্লিশ বছরের পুরুষ, নামকরা বংশের এবং খুবই ধনী।

–বুঝেছি। তারই ছেলের সাথে সুরাইয়ার বিয়ে হয়েছে।

চাচী হেসে উঠে বললেন– আরে থামো থামো। আসল কথা শোন। তারপর বলতে লাগলেন– সুরাইয়ার বাপের কায়রো থেকে সাঈদে বদলির অর্ডার হয়ে গিয়েছিল।

–কবে?

–গত সপ্তাহের প্রথম দিকে।

–নিশ্চয় তিনি খুব দুঃখ পেয়েছেন। তিনি এখন বার্ধক্যে পৌঁছে গেছেন।

–আসলে কিন্তু তিনি বদলি হননি। শেষ রক্ষা করে নিয়েছেন। যার কারণে তিনি এমনটি করেছেন, তার মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের ধরাধরি করে বদলির অর্ডার বাতিল করাবেন। অফিসের চীফ অর্থাৎ বিভাগীয় প্রধান নিজেই এসেছিলেন সুরাইয়ার বাপের সাথে বিদায়ী সাক্ষাত করতে। যেমন তোমাকে আগেই বলেছি, হঠাৎ তিনি সুরাইয়াকে কিভাবে দেখে ফেলেন। তার পছন্দ হয়ে যায়। সংগে সংগে তিনি

সুরাইয়ার বাপের কাছে প্রস্তাবটি দিয়ে ফেলেন।

–নিজেই?

–হাঁ। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, বদলির আদেশ বাতিল করার জন্য সম্ভাব্য সবকিছু করবেন। কারণ, তার অর্থাৎ বরের সাথে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ডাইরেক্টরের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। শুধু এতটুকুই নয়, তিনি সুরাইয়ার বাবার পদোন্নতিরও আশ্বাস দেন। আর তুমি তো জান, সুরাইয়ার বাবা একজন নিম্নশ্রেণীর কর্মচারী।

–বয়সের এত ব্যবধান সত্ত্বেও তারা তাকে সুরাইয়ার বর হিসেবে মেনে নিল কিভাবে? খুবই নিকৃষ্ট ধরনের বিয়ে। সম্ভবত সুরাইয়ার অমতেই হয়েছে।

–না। ব্যাপারটি সম্পূর্ণ বিপরীত। সুরাইয়া খুবই বুদ্ধিমতি।

তার পরিবারের অবস্থা সে ভালোভাবেই উপলব্ধি করে। সে তার পরিবারের ভবিষ্যত নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে।

কথাগুলো শুনছিলাম, আর মনে হচ্ছিল একটা বিষাক্ত ছুরি কেউ যেন আমার কলিজায় ঢুকিয়ে দিচ্ছে। আমি খুব উত্তেজিতভাবে বললাম– কেবল এজন্য তারা সুরাইয়াকে এমন এক ব্যক্তির হাতে তুলে দিল, যে কিনা মরণের দিকে হামাগুড়ি দিচ্ছে?

–মেয়েরা কী চায়? অর্থ, উঁচুপদ, সম্ভ্রান্ত পরিবার এবং সুস্থ–সবল একটি পুরুষ। আর বয়সের ব্যবধানের কথা তো এসব কিছুর পরেই আসে।

বিয়ের জিনিসপত্র কেনাকাটার জন্য আমার চাচী ও সুরাইয়ার বাবা–মা বাজারের দিকে বেরিয়ে গেলে সুরাইয়াকে তাদের বাড়ীতে একাকী লাভের সুযোগ পেয়ে গেলাম। সংগে সংগে তাদের বাড়ীর দিকে বেরিয়ে পড়লাম। নানা রকমের অনুভূতি ও আবেগ তখন আমার সত্তাকে দারুণভাবে কাঁপিয়ে তুলছিল। এমন কি যখন তার সাথে দেখা হলো, পাগলের মত কাজ করে বসলাম। জানিনে, এমন ব্যতিক্রমধর্মী কাজ আমি কি করে করতে পারলাম। সুরাইয়া আমাকে দেখেই সহাস্যে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে এলো। হাত মিলানোর জন্য হাত বাড়িয়ে দিল। কিন্তু তার আগেই হাত উঠিয়ে তার গালে এক থাপ্পড় বসিয়ে দিলাম। আমার চোখ থেকে তখন যেন আগুন ঝরে পড়ছে।

ঘটনার আকস্মিকতায় তার জিহবা আড়ষ্ট হয়ে গেল, থাপ্পড়ের স্থানে সে হাত দিয়ে চেপে ধরে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো– সুলায়মান, এ তুমি কি করলে? তুমি পাগল হয়ে গেছ? আমি মনে করেছি, তুমি আমাকে অভিনন্দন জানাতে ও দোয়া করতে এসেছো।

–চুপ কর, বেঈমান কোথাকার, এই কি তোর ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি?

কাজটি করেই আমি অনুভব করলাম, একটি অনুচিত কাজ আমি করে ফেলেছি। যদি সে ধৈর্যশীল না হতো এবং আমার প্রতি তার ভালোবাসা না থাকতো, তাহলে আমার কাজের সে প্রত্যুত্তর দিত অথবা লোকজন জড়ো করে আমাকে রাস্তায় নামিয়ে দিত। কিন্তু তা না করে সজল চোখে সে আমাকে বললো,

–তুমি কী বলতে চাও? তুমি কি বলতে চাও, তোমার আস্থা অক্ষুণ্ন রাখতে গিয়ে সারাটি জীবন আইবুড়ো হয়ে থাকি এবং বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বাবার অবাধ্য হই?

কোন জবাব না দিয়ে অত্যন্ত অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম, সেও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আমাকে তাকিয়ে দেখছিল। মনে হলো কোন কথা যেন তার মনে ছিল না, এই মাত্র স্মরণ হলো এমনভাবে সে প্রশ্ন করে বসলো– সুলায়মান, তুমি জানতে না?

–আমাকে তুমি একবারও তো সে কথা বলনি।

–সে কথা কি মুখে বলার কোন অপেক্ষা রাখে?

সে তার মাথাটি কিছুক্ষণের জন্য নিচু করে আবার উঁচু করলো। দেখলাম তার দু'চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

সে বললো– তোমার ডাক্তারি পড়া শেষ হওয়া পর্যন্ত আরো সাতটি বছর প্রতীক্ষায় বসে থাকা কি উচিত হতো? তারপর কি হতো কে জানে? তখন হয়তো দেখা যেত 'তুলুনী' রোডে বসবাসরত নিম্নমান এক কর্মচারীর মেয়ে সুরাইয়াকে ডাক্তার সুলায়মান আবদুদ দায়িম প্রত্যাখ্যান করেছে। তোমার সামনের ভবিষ্যত সুদূরপ্রসারী।

–হয়েছে, আর বলতে হবে না। এসব বাজে যুক্তি ছেড়ে দাও।

সুরাইয়া আমার আরো সান্নিধ্যে এগিয়ে এলো। তার চোখ দু'টি পানিতে টলমল করছে। একটি হাত আমার কাঁধের উপর রাখলো এবং মুখ ও মাথা আমার বুকের ওপর ঘষতে ঘষতে বলতে লাগলো,

–সুলায়মান, তোমাকে কত ভালোবাসি! আমার সমগ্র হৃদয় ও অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ দিয়ে তোমাকে ভালোবাসি। তুমি তা জান। তোমার বিরক্তি আমি হাসি মুখে সহ্য করেছি। মেয়েরা আমার সম্পর্কে যা কিছু বলাবলি করতো, তাও সব তোমার জন্য সহ্য করেছি। কিন্তু মনে হচ্ছে, মানুষ এ জীবনে কোন এক মহাশক্তির কাছে পরাভূত। তার প্রবাহের সামনে সে অটল থাকতে পারে না।

সুরাইয়ার বক্তব্যটি ছিল অতি স্পষ্ট। সে বলতে চাচ্ছিল, নিজেকে সে উৎসর্গ করেছে বাবার ইচ্ছার কাছে, তাঁর সাঈদে বদলি ঠেকানোর এবং ভবিষ্যত পদোন্নতির কাছে। কিন্তু

উৎসর্গ বলতে যা বোঝায়, তা কিন্তু তারা মনে করেনি। কারণ, আমি জানি বয়সের দুস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও বিয়ের কথা শুনলেই অনেকের জিহবায় লালা এসে যায়।

আমার কাছে মনে হলো, আমার থেকেও সুরাইয়া তার চিন্তায় অধিকতর যুক্তিবাদী বাস্তববাদী। কারণ, আমি যে ভালোবাসার আঁচল ধরে বসে আছি, তা এই বাস্তব পৃথিবীতে কখনো পা ফেলতে সক্ষম হবে না। সে ভালোবাসা হচ্ছে কল্পনা ও স্বপ্নের আকাশে উড়ন্ত মানুষ। যে মুহূর্তে আমি চিন্তা করছি, সুরাইয়া যদি সত্যি সত্যিই আমাকে ভালোবাসতো, তাহলে অফিসের বসের সাথে বিয়ে প্রত্যাখ্যান করতো, বাবার বদলির পরোয়া করতো না অথবা অর্থ ও পদেরও কোন গুরুত্ব দিত না এবং আমার সাথে দুনিয়ার অপর প্রান্তে পালিয়ে যেতে রাযী থাকত, তখন কিন্তু নিজেকে আমি এ প্রশ্ন করিনি, আমি কি এ ভালোবাসার জন্য কোন দুঃসাহসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত ছিলাম? যে মুহূর্তে আমার আব্বা আমার প্রয়োজন মেটানোর জন্য কঠোর পরিশ্রম করছেন, তখন আমার এ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কোথা থেকে আসতো? না, নিজেকে এ প্রশ্ন করিনি। বরং ভীষণ কঠোরতা দেখিয়েছি এবং ধোকাবাজি, মিথ্যা, খিয়ানত ইত্যাদি দোষে তাকে দোষারোপ করেছি। আমি তার অশ্রু ও অনুনয়-বিনয়ে সন্তুষ্ট হতে পারিনি। কিন্তু যখন সে আমার মুখমন্ডল চুমুতে চুমুতে ভরে দিল, হাঁ, উন্মাদের মত চুমু এবং যখন আমার অধর, গন্ডদেশ, কপাল ও কেশ জ্বালা করতে লাগলো, তখনই আমি তার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম এবং তার বাহুবন্ধনে আদুরে শিশুটির মত হয়ে গেলাম। আমিও তখন কেঁদে ফেল্লাম। কোনভাবেই অশ্রু সংবরণ করতে পারলাম না।

যখন চলে আসার সময় ঘনিয়ে এলো, সুরাইয়া তার সুন্দর অঙ্গুলিগুলো দিয়ে আমার চুল নাড়তে নাড়তে বলেছিল- সুলায়মান, আমার একটি আশা তোমার কাছে। যে ভালোবাসা আমি আমার হৃদয়ে আজীবন লালন করে যাব, সেই অধিকারের ভিত্তিতে তুমি আমাকে কথা দাও, তা পূরণ করবে। একটি মাত্র নিবেদন! তুমি যদি তা পূরণ করো আমিও শান্তি পাব, তুমিও তৃপ্তি পাবে।

কোন উত্তর দেয়ার শক্তি আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম। সুরাইয়া আবারো বললো- আমার বিয়ের আগে এটাই হবে তোমার সাথে আমার শেষ দেখা। কি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ?

কোন উত্তর না দিয়েই আমি বের হয়ে আসতে চাইলাম। কিন্তু আবারো সে আমার গলা জড়িয়ে ধরে গভীরভাবে চুমু দিতে লাগলো এবং তার কথার কোন জবাব দেয়ার জন্য চাপাচাপি করতে লাগলো। শেষমেশ অত্যন্ত আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বললাম- হাঁ, আমি কথা দিচ্ছি।

-মায়াস সালামা ইয়া হাবীবী- বিদায় হে বন্ধু।

সুরাইয়ার কাছ থেকে বের হয়ে ঘরে ফিরে এলাম। এক সপ্তাহের জন্য প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড় ও বই-পুস্তক গোছগাছ করতে লেগে গেলাম। এ সময়ের মধ্যেই সুরাইয়ার বিয়ের পাট চুকে যাবে। সব কিছু ব্যাগে ভরতে লাগলাম। আমার চতুষ্পার্শ্বের সমগ্র জগত যেন এমন এক করুণ শোকসংগীতে নিমগ্ন, যা হৃদয়তন্ত্রীকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে। অশ্রু আমার অভ্যন্তরেই শুকিয়ে যাচ্ছে। দুনিয়াটা মনে হচ্ছে কালো, বিমর্ষ এবং কল্যাণহীন-যার দিনগুলোতে আশার কোন কিছু নেই।

এই সপ্তাহটি কাটানোর জন্য আমার এক বন্ধুর কাছে চলে গেলাম। প্রতিটি মুহূর্ত সুরাইয়ার স্মৃতির চলচ্চিত্র আমার মনের পর্দায় ভেসে উঠতে লাগলো। আমার গন্ড, গলা ও কেশ- যেখানে যেখানে সুরাইয়ার অধর স্পর্শ করেছিল, যেন সেখানে অতিরিক্ত ব্যথা ও যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগলাম। এক বন্ধুর বাড়ীতে পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য এক সপ্তাহ থাকার অনুমতি চেয়ে আমার চাচাকে একটা চিঠি লেখার কথা। কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস চাচা-চাচী এরকম খোঁড়া যুক্তি নির্বিচারে মেনে নেবেন বলে মনে হয় না।

২১

এক সপ্তাহ পর চাচার কাছে ফিরে এলাম। দারুণ বিস্ময়কর খবর আমার জন্য প্রতীক্ষা করছিল। এই এক সপ্তাহে নানাবিধ ঘটনা এক সাথে ঘটে গেছে এবং সবই আমার মাথায় বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন চাচা বললেনঃ কোথায় ছিলে? লাগাতার তিন দিন তোমাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়িয়েছি।

-আমি তো আপনাকে জানিয়ে দিয়েছি, এক সপ্তাহ অনুপস্থিত থাকবো। সুতরাং চিন্তার কোন কারণই থাকতে পারে না।

আমার অনুভূতির প্রতি সম্মান দেখিয়ে এবং সুরাইয়ার বিয়ের কারণে হৃদয়ে যে ক্ষত হয়েছিল, তা যাতে তাজা হয়ে না ওঠে, সে জন্য তিনি কোন বিতর্কে লিপ্ত হলেন না। তাই তিনি সরাসরি বিষয়টির দিকে চলে গেলেন। বললেন- সাঈদ হাফেজের একটি চিঠি তোমার কাছে এসেছে।

-কোথায় তা?

চাচা চিঠিটি এগিয়ে দিলেন। হাতে নিয়ে দেখলাম তাতে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বাক্য 'ভাই সুলায়মান, আমি আশা করি, আজ থেকে ঠিক চারদিন পর তুমি আমার প্রতীক্ষায় থাকবে। আব্বাকে সংগে করে কায়রোয় আসছি বাসীমাকে নেয়ার জন্য। ধন্যবাদ।'

বাসীমা! সেটা কেমন করে হয়?

ছয় বছর বা তার থেকেও বেশী সময় পর বাসীমা ফিরে আসবে? এমন পুনর্জন্ম তো কেবল রূপকথা ও কল্পকাহিনীতেই ঘটে থাকে। বহুদিন আগেই ছোট্ট বাসীমা শেষ হয়ে গেছে। ইসকান্দারিয়ার ওপর হিটলারের আক্রমণ থেকে সে বেঁচে গেছে এ কথা কোন যুক্তিতেই মাথায় আসে না। এত দীর্ঘ সময় যদি সে বেঁচে থাকে, তাহলে আত্মপ্রকাশে তাকে বাধা দিয়েছে কিসে? হায় আল্লাহ! আমি কি স্বপ্ন দেখছি, না যা কিছু দেখছি তা বাস্তব?

নির্ধারিত দিনে সাঈদের প্রতীক্ষায় অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তির মত ছটফট করতে লাগলাম। কিন্তু সে কিংবা তার আব্বা কেউ এলেন না। এদিকে পরীক্ষা ছিল একেবারেই দোরগোড়ায়। সামনে আমার বহু কষ্ট ও পরিশ্রমের কাজ। কারণ, ব্যাঙ, টিকটিকি, খরগোশ, কেঁচো এবং নানা রকম সরীসৃপ ব্যবচ্ছেদের অনুশীলনী করতে হবে। আমার জন্য এটা খুব সহজসাধ্য কাজ নয়। বিজ্ঞানের প্রতি প্রবল আগ্রহ ও আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও এগুলো কাটাছেঁড়ার জন্য ছুরি-চাকু হাতে নিলেই হাত একটু একটু করে কাপতে শুরু করে। তাছাড়া সামনে অনেক বৈদ্যুতিক, রাসায়নিক ইত্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা পড়ে রয়েছে, যা মেডিকেলের প্রথম বর্ষের ছাত্রদের জন্যে অপরিহার্য। সুতরাং এ কথা মনে মনে ঠিক করলাম যে, সুরাইয়া এবং বাসীমাকে আমার ভুলে যাওয়া উচিত। অথবা কমপক্ষে কিছুদিনের জন্য ভুলার চেষ্টা করা দরকার। কারণ, বিষয়টি আমার ভবিষ্যত এবং আব্বা-আম্মা যে টাকা-কড়ি পাঠান, তার সাথে যেমন জড়িত, তেমনিভাবে জড়িত আমার গ্রামে একজন সফল ডাক্তার হিসেবে সুনাম ও সবার ঈর্ষার সাথেও। মনে মনে বললাম,

-প্রেম ও আসক্তির চিন্তার জন্য গত মাসগুলোই আমার জন্য যথেষ্ট হয়েছে। এসব চিন্তা মাথার মধ্যে আর বেশী প্রশ্রয় দেয়া উচিত হবে না। এ ব্যাপারে আর বাড়াবাড়ির অর্থই হচ্ছে পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা এবং পরিণামে ধ্বংস।

কিন্তু অন্তরের তলদেশে নানা রকম ভাব ও অনুভূতির উদয় হতো। সেখানে বাসীমার স্মৃতি ও সুরাইয়ার ব্যথা মিলেমিশে একাকার হয়ে যেত।

কিছুদিনের মধ্যে ল্যাবরেটরী, লেকচার থিয়েটার ও বাড়ীতে নানাবিধ কাজে মনোনিবেশ করতে সক্ষম হলাম। নতুন পরিস্থিতির কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। কারণ, অপচয় করার মত সময় আমার হাতে নেই। অবসর সময়টুকু ঘুমিয়ে কাটাই অথবা বিজ্ঞান বিষয়ক কোন সমস্যা আলোচনার জন্য বিভাগীয় কোন বন্ধুর কাছে চলে যাই।

পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। খুব তাড়াতাড়ি গ্রামের বাড়ীতে ফিরে যাওয়ার চিন্তা করলাম। বিশেষত সুরাইয়া দূরে সরে যাওয়ার পর কায়রোর প্রতি আমার তেমন আকর্ষণ নেই। বরং এখন আমি বাসীমা ও তার ছেলেবেলার সুন্দর দিনগুলোর প্রতি এক প্রচন্ড আবেগ ও তীব্র আকর্ষণ অনুভব করি। আমার মধ্যে তাকে দেখার এমন উদগ্র আকর্ষণ দেখা দিল যে, তা আমাকে বাড়ীতে তাড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্য ব্যতিব্যস্ত করে তুললো।

অতীত প্রেম কি আবার নতুন করে জেগে উঠলো মনে? দীর্ঘ সময়, বিচিত্র ঘটনা, চিন্তা

ও আশা–আকাংখার বিবর্তনের পর কাফন ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার কি তা নতুন জীবন লাভের ইচ্ছা করলো? আমার যাত্রার একদিন আগে হঠাৎ সাঈদ হাফেজ এসে উপস্থিত হলো।

তাকে বললাম– সব খবর ভালো ইনশাআল্লাহ। কোন সংবাদ না দিয়ে হঠাৎ এসে পড়লে যে? বোধ করি পরীক্ষা শেষ করে এসেছো? কায়রোয় মনে হয় ক'টি দিন আনন্দ–ফুর্তিতে কাটাতে চাও।

–মোটেই তা নয়। পরীক্ষা–টরীক্ষা কিছুই দিইনি।

–সত্যি বলছ?

–কিছু কাগজপত্র ঠিকঠাক করার জন্য এবং সামরিক কলেজে ভর্তি সংক্রান্ত কিছু কাজ–কামের জন্য এখানে এসেছি।

–ফের গোড়া থেকে নতুন করে? তুমি এখনো অনমনীয় রয়েছ দেখছি!

–আল্লাহর ইচ্ছায় এবার আমি শতকরা একশ' ভাগ আশাবাদী।

–সাঈদ, চিরকাল তোমার একই রকম গেল। কোন কিছু ইচ্ছা করলে তার জন্য তুমি প্রাণপাত করতে পার। কোন বিনিময়ও তুমি চাও না। আইন বিভাগের দোষ কি?

–আবারো আমরা সেই একই কথায় ফিরে যাচ্ছি। ওসব কথা বাদ দাও। আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি।

মাথায় বাসীমার কাহিনী উদয় হলো। আলাপের সূচনা তাকে নিয়েই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু অন্তরে আমি একটু বাধো বাধো ভাব অনুভব করলাম। এর কারণ কি তা জানি না। আমার নিজের ভেতর থেকে কেউ যেন আমাকে বলে দিচ্ছিল যে, বাসীমার ব্যাপারটিতে এমন কিছু লুকিয়ে আছে, যা শুনলে আমি অথবা সাঈদ কেউ খুশি হতে পারবো না। তবুও বিষয়টি জানার জন্য তীব্র আকর্ষণ অনুভব করলাম। আর অপেক্ষা করতে পারলাম না। বললাম– একটি চিঠি তুমি লিখেছিলে। তোমার আব্বা ও তোমার প্রতীক্ষায় আমাকে থাকতে বলেছিলে।

–হুঁ, কিন্তু সে যাত্রা তোমার সাথে সাক্ষাতের মত তেমন কিছু আমরা পাইনি।

–তাহলে তোমরা কায়রো এসেছিলে?

–হাঁ, এসেছিলাম।

সাঈদের মুখমন্ডলে প্রতিক্রিয়া ও ব্যথার ছাপ ফুটে উঠলো। আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম। তবুও সাহস সঞ্চার করে জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কি বাসীমাকে পেয়েছো? সে কি তোমাদের সাথে ফিরে গেছে?

–হুঁ। কিন্তু সে না ফিরলেই ভালো হতো।

সাঈদ হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো। তাকে দারুণ বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। বললো– এসো, আমরা একটু কায়রোয় ঘুরে বেড়াই।

–একটু অপেক্ষা করবে না? চাচা ফিরে এলে এক সঙ্গে সন্ধ্যার খাবার খেয়ে বের হতাম?

–কিছুক্ষণ অবশ্যি অপেক্ষা করা যায়।

বাসীমার সংবাদ এবং কি ঘটেছে, তা জানার জন্য প্রচন্ড আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও সাঈদ কষ্ট পায়, কোন রকম অস্বস্তি অনুভব করে, এ আশংকায় বিষয়টি দ্বিতীয়বার উত্থাপন করতে সাহস করিনি।

আমার আশা পূরণ হবার এক সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হয়ে গেল। সাঈদের সামরিক কলেজে ভর্তির জন্য প্রয়োজনীয় মেডিকেল রিপোর্টে সহির সময় কয়েকটি নতুন বিষয়ের অবতারণা হলো। আমাকে সে বললো– আমার খুব তাড়াতাড়ি কিছু টাকার অত্যন্ত প্রয়োজন।

–এর সমাধান কি? চাচার বেতন তো খুব সামান্য।

–আমি একটা চিন্তা করেছি।

–বল। সাধ্যমত সব কিছু করার জন্য আমি প্রস্তুত।

–যাতে মেডিকেল পরীক্ষার সময় অনুপস্থিত থেকে না যাই, সে জন্য এ মুহূর্তে আমার পক্ষে কায়রো ত্যাগ করা সম্ভব নয়।

–তা তো ঠিক কথাই।

–এ জন্য মনে করেছি, তুমি আজই কুরাশিয়ায় চলে যাবে এবং আব্বার কাছ থেকে এ পরিমাণ টাকা নিয়ে কালই আবার কায়রো ফিরে আসবে।

–কিন্তু.....।

আমার কথা শেষ না হতেই সে বলে উঠলো– এছাড়া আমাদের সামনে আর কোন পথ নেই।

–আল্লাহ হাফেয।

কুরাশিয়া পৌঁছে বাসীমার সব ঘটনা জানতে পেলাম। শায়খ হাফেজের বোন আমাকে আদ্যোপান্ত সবকিছু খুলে বললেন। তিনি বললেন– আহা, বাসীমা যখন আমাদের কাছে ফিরে এলো আমাদের তখনকার অবস্থা যদি তুমি জানতে!

–সাঈদ চুপ থাকাই শ্রেয় মনে করেছে। আমাকে সে কিছুই বলেনি।

–তার অবশ্য কোন দোষ নেই। আমরা একটা দারুণ আঘাত পেয়েছিলাম।

–কেন?

–দিনটি ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক। বাসীমাকে যদি আমরা কবরে দাফন করে দিতাম, তাও ভালো ছিল। তার বাপ তাকে রাতের অন্ধকারে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। বাড়ীতে ঢুকেই সে চেঁচামেচি, কান্নাকাটি ও প্রবল জ্বরগ্রস্ত ব্যক্তির মত প্রলাপ বকতে শুরু করলো। এরপর তার জীবন দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। সে অচেতন হয়ে পড়ে কখনো দীর্ঘ সময়ের জন্য। আর বাকী সময় চেঁচামেচি, প্রলাপ বকা ও কান্নাকাটি। কাউকে দেখলে অথবা নিকটে কোন শব্দ হলে সে ভয়ে কেঁপে ওঠে এবং আশেপাশে কেউ থাকলে তার আঁচল টেনে ধরে।

–প্রলাপের মধ্যে সে কি বলে?

ইসকান্দারিয়ার ভয়াবহ ধ্বংসের কথা বলে। সে রক্তের বিভীষিকা দেখে, পঙ্গুত্বের অসহায়তার কথা ভেবে চিৎকার করে, মৃত্যু ভয়ে আত্মগোপনের জায়গা খোঁজে। সে মনে করে যুদ্ধের ডামাডোলে ফুলে–ফেঁপে ওঠা তার মনিব তার স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে একবার বাড়ী থেকে পালিয়ে গেল এবং তাকে একাকী ফেলে রেখে গেল অন্ধকার, যন্ত্রণা, ভীতি ও মৃত্যুর কবলে। কারণ, তার সন্তানদের সাথে তাকে নিয়ে যাওয়ার সময় তার নেই। তার মনিবের জন্মস্থান 'আসিউতে' হিজরাত করে সেখানে দু'বছর বা তার থেকেও বেশী সময় তারা বসবাস করেছে বলে সে জানায়। সেখানে বাসীমা তার আব্বাকে দেখতে চায়, কিন্তু তার মনিব একটা ক্রুর হাসিতে ফেটে পড়ে এবং টালবাহানা করতে থাকে। তার ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। তারপর তার মনিব আসিউতের নিকটবর্তী এক পল্লী এলাকায় চলে যায়। সেখানে তার বিশাল খামার আছে। বাসীমার সবচেয়ে বড় সর্বনাশ ঘটে যায় তারই এক খামারে।

সঙ্গে সঙ্গে আমি জিজ্ঞেস করলাম– কি ঘটেছে?

–তাকে আমি প্রলাপের মধ্যে বলতে শুনেছি– জনাব, হারাম, পাপ। আপনি আমার কাছে কী চান? না, আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার আব্বা জানতে পেলে আমাকে মেরে ফেলবেন এবং আমার গোশত কুকুর পালের মধ্যে বিলিয়ে দিবেন। জনাব, আপনি আমাকে বিয়ে করবেন, একথা বলছেন? না, তা হয় না। এ বিয়ে আমি চাই না। তাহলে আপনার স্ত্রী আমাকে মারপিট করবেন। জনাব, আমি তো চাকরানী। আমাকে ছেড়ে দিন। আপনার পায়ে পড়ি। বিয়ে আমি চাই না। আমাকে ছেড়ে দিন, রেহাই দিন। তখনই তার দু'চোখ থেকে অশ্রুর বন্যা বয়ে যেতে থাকে। নখ দিয়ে নিজের দেহ খামচাতে থাকে, কাপড়–চোপড় ফেঁড়ে টুকরো টুকরো করতে থাকে এবং কামরার মধ্যে গড়াগড়ি দিতে থাকে।

তারপর আবার নতুন করে সে প্রলাপ শুরু করে– জনাব, আবার আপনি আমার কাছে কী চান? কখ্খনো না। আমি রাযী হবো না। আপনি বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন; কিন্তু

তা করেননি। আপনি কী বলতে চান? আমাকে তাড়িয়ে দেয়ার, পুলিশের হাতে তুলে দেয়ার ভয় দেখাচ্ছেন? আমার সম্পর্কে তাদের কাছে বলবেন যে, আমি রাতের প্রমোদবালা এবং জোর করে আপনার ঘরে ঢুকে পড়েছি? জনাব, এমনটি করা অন্যায় হবে। আপনিই আমার উপর যুলুম করেছেন, আমার উপর অত্যাচার করেছেন। আমার কৌমার্য আমি আর ফিরে পাব না....। আমাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন; কিন্তু এখনো টালবাহানা করে চলেছেন...। তাহলে এখনো আপনি আমাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতির ওপর আছেন। আপনার যা ইচ্ছে করুন.....। কিছুক্ষণ নীরব থেকে সে হিস্টিরিয়া রোগীর মত হো হো করে হেসে উঠে আবার কাঁদতে শুরু করলো। তারপর বিষাদভরা মলিন মুখখানা একবার চারদিকে ঘুরিয়ে আবার প্রলাপ আরম্ভ করলো। কোথায়, জনাব? পোর্ট সাঈদে? ইসকান্দারিয়ার পরিবর্তে আপনি কি সেখানেই থাকবেন? যাই হোক, যে কোন স্থানেই হোক না কেন, আমি আপনার সঙ্গে থাকবো। কিন্তু প্রথমে আমি চাই, আপনি আমাকে বিয়ে করুন, আমি একটু নিশ্চিত হই আমার আব্বা যদি হঠাৎ এসে পড়েন এবং আমাকে এ অবস্থায় দেখতে পান, তাহলে কি পরিস্থিতি হবে? জনাব, কসম করে আমি আপনাকে বলতে পারি, তিনি আমার খুন পান করে ছাড়বেন। তারপর কিছুক্ষণ চুপ থেকে হঠাৎ সে বলে উঠলো– 'মরে গেছে? কেমন করে? আপনি বলছেন, আমার আব্বা শায়খ হাফেজ মারা গেছেন? এ অসম্ভব। আমাকে না দেখে তিনি মরতেই পারেন না। আমাকে তিনি আপনার স্ত্রী হিসেবে দেখবেন। জনাব, আপনি আমাকে ধোকা দিচ্ছেন।'

এমন বেদনাদায়কভাবে তার প্রলাপের ধারা চলতে থাকে। সারা রাত সে এই কথাগুলো আওড়ায়। সে নিজেই প্রশ্ন করে, নিজেই জবাব দেয়। তার কথা থেকে আমি আরো বুঝেছি, তার মনিব যখন পোর্ট সাঈদ থেকে দ্বিতীয় বার ইসকান্দারিয়া যাচ্ছিল, 'সীদী জাবের' স্টেশনে ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। সে বাসীমার কাছে একটি খালি স্যুটকেস রেখে তার প্রতীক্ষায় বসে থাকতে বলে কোথায় চলে যায়।

সে এবং তার পরিবার কোথায় চলে গেল বাসীমা তা জানে না। হতভাগী ব্যথা–বেদনায় দারুণ মুষড়ে পড়ে এবং এমন প্রচন্ড বিপদের মধ্যে চারিদিকে দেখতে থাকে। সে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়া শ্রেয় মনে করে। কিন্তু তা পূর্ণ হওয়ার আগেই লোকেরা তাকে পানি থেকে তুলে নিকটবর্তী পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যায়। এখানে সে নিজেকে সকাল–সন্ধ্যা চব্বিশ ঘন্টা মহিলা চোর ও অসতী নারীদের মাঝে আবিষ্কার করে। সে অপমান ও লাঞ্ছনার শিকারে পরিণত হয়। তার স্নায়ু বিকল হয়ে যায়। তার নার্ভ দুর্বল হয়ে পড়ে। যখন চিন্তা করে, কেমন করে সে তার বাবার সামনে দাঁড়াবে? আর যখন সে তার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঘটনাবলীর কথা ভাবে, তখন সে নিজেকে একজন বিতাড়িত ভবঘুরে হিসেবে দেখতে

পায়– যার কোন ঠিকানা নেই। নেই কোন আশ্রয়। সুতরাং সে একই পথে চলেছে।

দম নেয়ার জন্য শায়খ হাফেজের বোন একটু থামলেন। সাথে সাথে প্রশ্ন করে বসলাম– কোন্ পথের কথা আপনি বলছেন?

মানসিক রোগের হাসপাতাল।

–কী আফসোসের কথা!

–এত বছর পর সেখানেও যদি আমরা তার খোঁজ না পেতাম, সেটাও ভালো ছিল।

–খোঁজ কে দিল?

–'রূহীয়া' নামের এক মহিলা। তুমি চেন? তিনি বর্তমানে তোমাদেরই শহরে আছেন!

–ও, সেই দৃষ্টিক্ষীণ মহিলাটি, তিনি তো দীর্ঘদিন আগেই মানসিক হাসপাতালে গিয়েছিলেন?

–হাঁ, হাঁ, তিনিই। তিনিই সেখানে বাসীমাকে দেখতে পান। অন্য রোগীদের কাছ থেকে তিনি বাসীমার কাহিনী জানতে পারেন। তার অবস্থা খুব মারাত্মক ছিল না, খুব তাড়াতাড়ি তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। তারপর বাসীমা যখন একটু শান্ত থাকে, তখন এক সময় তিনি তার সাথে যোগাযোগ করেন। তিনি বাসীমাকে যখন জিজ্ঞেস করলেন সে তার বাবা শায়খ হাফেজের কাছে ফিরে যেতে চায় কি না। তখন সে ভীতচকিতভাবে কেঁদে ফেলে এবং তার সামনে থেকে ছুটে পালিয়ে যায়। সাইয়েদা রূহীয়া ফিরে এসে শায়খ হাফেজকে সব ঘটনা খুলে বলেন। অতপর তিনি কায়রো যান এবং তাকে নিয়ে আসেন। কিছু মনোরোগ বিশেষজ্ঞকে দেখানো হলে, তারা শায়খ হাফেজকে বুঝিয়েছেন, সে ভালো হয়ে উঠবে, কিন্তু বেশ সময় লাগবে।

–সত্যিই এটা এক আশ্চর্য ঘটনা।

–মনে হয়, মানসিক হাসপাতালগুলো একেবারেই কারাগারের মত। সেখানে আসা প্রতিটি লোক খুব দ্রুত একে অপরের সব তথ্য জানতে পারে।

কিছুক্ষণ পর শায়খ হাফেজের বোন আমার দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ের সুরে বলে উঠলেন– সুলায়মান, তুমি কাঁদছো? তুমি না হৃদরোগের ডাক্তার?

আমি উত্তেজনা ও ক্ষোভের সুরে বললাম– পাষন্ডটা তাকে একেবারে নিঃশেষ করে ছেড়েছে। দুঃখ ও যন্ত্রণার স্তূপে পরিণত করে দিয়েছে। কসম করছি, যদি তাকে চিনতে পারি অথবা কোন দিন তার সাথে আমার দেখা হয়ে যায়, তার মাথার খুলি আমি গুঁড়ো করে ফেলবো।

–এটা ভাগ্যের পরিহাস। কপালে যা লেখা থাকে, চোখে একদিন তা দেখবেই।

–এই জিনিসটি কোন কোন মানুষের মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং ভাগ্যের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহী করে তোলে।

–কিন্তু উপায় কি? তাতে তো লাভ হয় না।

খুব উত্তেজিতভাবে আমার আসন থেকে লাফিয়ে উঠলাম এবং শায়খ হাফেজের বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তাঁর বোন আমার হাত মুট করে ধরে বললেন– খাদরা বাইরে থেকে আসার আগে তুমি কি বাসীমাকে দেখতে চাও?

কোন ইতস্তত ভাব প্রকাশ করার ফুরসত তিনি আমাকে দিলেন না। আমাকে হড়হড় করে টেনে নিয়ে যেতে যেতে উপদেশ দিলেন– খবরদার, একটুও শব্দ করো না। দরজা খোলার চেষ্টাও করো না। ওগুলো করা ঠিক হবে না। তাহলে গোলমাল বেধে যেতে পারে।

–তাহলে ওকে দেখবো কেমন করে?

–দরজার ফাঁক দিয়ে দেখবে।

বাসীমার দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলাম। আমার বুকের ভেতর খুব জোরে জোরে ধুঁকধুঁক করতে লাগলো। সারা শরীরও ফুলে যেতে লাগলো। আশেপাশের জগত থেকে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে সে কামরার মধ্যে বসে ছিল অদৃশ্য কোন কিছুর প্রতি এক দৃষ্টে তাকিয়ে। আমি জানিনে, কিসের কারণে জাদুগ্রস্ত রানীর সাথে তাকে তুলনা করার কথা আমার মনে পড়লো। অথচ রূপকথার এই রানী সম্পর্কে যতটুকু পড়েছি, তার অতিরিক্ত আর কিছুই জানিনে।

বাসীমা ছিল, যেমন আমি কল্পনায় সব সময় তার ছবি এঁকেছি, সুন্দর আকর্ষণীয় গড়ন, মিষ্টি চেহারা, একটু হালকা–পাতলা; কিন্তু গন্ডদ্বয় মাংসালো। তার উদাস উদাস ভাব সত্ত্বেও চেহারার সৌন্দর্য ও কমনীয়তা নিরীক্ষণের জন্য সে আমার দৃষ্টিকে কেড়ে নিল। হঠাৎ আমরা দরজায় শব্দ শুনতে পেলাম। আমরা তাড়াহুড়ো করে আগে যেখানে বসেছিলাম ফিরে এলাম। কেউ আবার জেনে না ফেলে যে, আমরা বোধশক্তিহীন বাসীমাকে গোপনে দেখে ফেলেছি।

শায়খ হাফেজের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় টাকা নেয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে কায়রোর পথে রওয়ানা হওয়ার জন্য আমার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত রইলো। রাত সেখানে তাদের সাথে কাটানোর জন্যে অনুরোধ সত্ত্বেও সাড়া দিলাম না।

শায়খ হাফেজের স্ত্রী খাদরার সেই করুণ মুখচ্ছবিটি কখনো ভুলবো না, যখন তিনি অত্যন্ত বিমর্ষভাবে আমাকে বলছিলেন– বাসীমা ফিরে এসেছে!

আমি তাকে বলেছিলাম– আমি তো তা জানি।

আমার চোখ থেকে গড়িয়ে পড়া অশ্রুধারা সতর্কতার সাথে গোপন করে সেদিন দ্রুত

ওদের ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম।

২২

আজ ২৩ জুলাই ১৯৫২।

সামরিক যানসমূহ রাস্তায় টহল দিচ্ছে। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, ভীতি ও আশংকাজনক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। কিন্তু জনসাধারণের অবস্থা তার বিপরীত। আনন্দ-উল্লাস ও করতালির মাধ্যমে তারা এ পরিস্থিতিকে স্বাগত জানাচ্ছে। আর পুরনো নেতা-গোতা ও তাদের আঙ্গিনায় যারা ঘোরাফেরা করে, তারা যেন বরফের মত জমে গেছে। ঘটনার পরিণতি দেখার জন্য তারা প্রতীক্ষায় আছে।

বাদশাহ সেনাবাহিনীর কিছু দাবী-দাওয়া মেনে নিয়েছেন।... পারিষদবর্গের মধ্যে শুদ্ধি আন্দোলন চলছে। সবচেয়ে বড় বিস্ময় হচ্ছেঃ '২৬ জুলাই সন্ধ্যা সাতটায় কড়া প্রহরার ভেতর দিয়ে বাদশাহ ফারুক চিরদিনের জন্য দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন।'

সর্বশ্রেষ্ঠ তাগূতের পতন! জনগণ বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বে দোদুল্যমান। মাত্র একদিন ও এক রাতের মধ্যে যেন এমনটি ঘটা সম্ভব নয়। সম্মান, রাজত্ব ও একচ্ছত্র আধিপত্য সবকিছুই মুহূর্তে মিথ্যা হয়ে গেল। কী আশ্চর্য!

চাচা বললেন, শোন সুলায়মান, সেনাবাহিনীর আন্দোলন ও বাদশাহর বিতাড়ন দেখে আমাদের অপ্রতিভ ও বিহ্বল হওয়া অবধারিত। কারণ, দীর্ঘকাল যাবত আমরা তার দাপটে একেবারেই বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম।

-চাচা, এটা এক নজীরবিহীন সাফল্য।

-বিপ্লবের পরে বহু কাজ আছে সুলায়মান। তার সামনে রয়েছে বিভিন্ন গ্রুপ ও দল। তাছাড়া শত্রুবাহিনী সুয়েজে ঘাঁটি বানিয়ে বসে আছে। তুমি কি মনে কর না, সাফল্যের খুব সামান্য অংশই অর্জিত হয়েছে?

-সত্যিই আমি যা চিন্তা করি বিষয়টি তার থেকেও জটিল।

-বাদশাহর কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা লাভ করেছি পাহাড় পরিমাণ ঋণের বোঝা এবং আমাদের রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে সম্প্রসারিত ব্যাপক বিপর্যয়। আর এগুলোই হচ্ছে আমাদের সকল চেষ্টা ও সাধনা বিনিয়োগের প্রকৃত ক্ষেত্র।

–আর ধরুন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কথা। আপনি কি মনে করেন তারা এই বিপ্লব মেনে নেবে?

–তুমি তো জানো, সাম্রাজ্যবাদ সব ধরনের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং মানুষের উন্নত জীবনের দিকে ধাবিত হওয়ার যে কোন প্রচেষ্টার বিরোধী। সুতরাং তারা তাদের ষড়যন্ত্র আর নানা রকম ফন্দি–ফিকির থেকে কখ্খনো বিরত হবে না। তাদের এসব কূট ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সচেতন ও জাগ্রত একটা জাতি যদি আমরা হতে পারি, তাহলে তাই হবে আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা। তোমাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি, সাম্রাজ্যবাদ যখনই আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ দেখবে, তখনই সে তার লাঠিটি বগলদাবা করে হাঁটা শুরু করবে। তখন সে আমাদের বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার প্রস্তাব দিবে। স্বাধীন ব্যক্তির বন্ধুত্ব স্বাধীন ব্যক্তির জন্য, স্বাধীনের বন্ধুত্ব পরাধীনের জন্য নয়।

–চাচা, আনন্দে আমার এখন উড়তে ইচ্ছে হচ্ছে।

–তুমি একাই নও। রাস্তায় যেয়ে ঘুরে দেখ, প্রতিটি লোকের মুখেই হাসি, প্রতিটি চোখেই একটা আশা–একটি প্রশস্ত সজীব আশা। বেটা, এতটুকুই যথেষ্ট যে, এই প্রথম বারের মত মিসরকে প্রকৃত মিসরীয়রা শাসন করবে। এ ছিল এক স্বপ্ন, যা বাস্তবে রূপ লাভ করছে।

–এখন আমরা বলতে পারি, জীবনের একটা অর্থ আমরা খুঁজে পেয়েছি। তার লোভ আমরা করতে পারি এবং তার জন্য সবকিছু বিলিয়ে দিতেও পারি। আমাদের জাতীয়তা, আমাদের সম্মান আমাদের কাছে ফিরে এসেছে। আমার বিশ্বাস, আমরা এমন একটি জাতিতে পরিণত হতে পেরেছি, যারা এখন নিজেদেরকে নিজেরাই চালাবে, নিজেরাই শাসন করবে এবং এ বিশ্বে সে তার উপযুক্ত মর্যাদা লাভে সক্ষম হবে।

১৯৫৪ সালের চুক্তি অনুযায়ী মিসর থেকে যখন বৃটিশ বাহিনীর অপসারণ শেষ হলো, আমি সেনা–অফিসার সাঈদ হাফেজ শীহাকে হাসতে হাসতে বললাম, সামরিক কলেজে তোমার পড়া শেষ না হতেই ইংরেজরা তাদের দেশের পথে পাড়ি জমালো। সাঈদ, তুমি এক হতভাগ্য। অবস্থা তোমাকে তাদের প্রতিশোধ নিতে দিল না।

সাঈদ নিচের ঠোঁটটি একটু বাঁকা করে বললো, সব সময়ই আমি দুর্ভাগা। কাহিনীর এখানেই শেষ হওয়াতে আমি দারুণ দুঃখিত।

–এর থেকেও তুমি আর বেশী কী চাও? তারা আমাদের অনমনীয় মনোভাব ও অধিকার আদায়ের শপথের সামনে মাথা নত করে চলে গেছে। তারপরও কি কিছু বাকী আছে?

–তাদের অপকর্ম অনেক। তাদের এই নীরব প্রস্থান সেই অপকর্ম কখনো মুছে দেবে না।

–সত্যিই তুমি এক অদ্ভুত চরিত্রের। সম্ভবত তুমি তাদের এ কথা বলতে চাও, তোমরা তোমাদের স্থান ছেড়ো না। এই মুহূর্তে তোমরা আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যেও না। তাহলে আমরা আমাদের অন্তরকে তোমাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়ে প্রবোধ দিতে পারি এবং তোমাদের প্রবৃত্তি যেন নতুন করে এ দেশে আসার প্ররোচনা না দেয়, সে জন্য আমরা তোমাদের এমন শিক্ষা দিতে চাই যা কোন দিনই ভুলবে না।

–রসিকতা করো না। তোমার বুঝা উচিত, যতক্ষণ আরব বিশ্বের কোন একটি এলাকায় একটি ইংরেজ সৈন্য থাকবে এবং ইসরাইলে তাদের অস্ত্রশস্ত্র পানির মত আসতে থাকবে, ততক্ষণ ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের এ যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হবে। ইসরাইল আমাদের জন্য মারাত্মক হুমকি। সে হচ্ছে বিড়ালের থাবা এবং আমাদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিদ্বেষের উৎস।

–বৃটেন ছাড়া অন্য দেশ থেকে আমরা অস্ত্র কিনি না কেন সাঈদ? আমরা কি স্বাধীন নই? ইসরাইলী বর্বরতা থেকে আমাদের নিজেদেরকে রক্ষা করা এবং খোদ শয়তানের নিকট থেকে হলেও অস্ত্র সংগ্রহ করা আমাদের দায়িত্ব নয় কি? যতদিন আমরা তা না করবো, ততদিন ইসরাইল আমাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে।

–সেনাবাহিনীর অফিসারদের দাবীও এটাই। আশা করি তোমার কাছে এ কথাটি বললে গোপনীয়তা ফাঁস করে দেয়া হবে না যে, পূর্ব ইউরোপীয় কয়েকটি দেশের সাথে আমাদের চুক্তি হয়েছে এবং অস্ত্রের চালান এখন পথেই রয়েছে।

–তাহলে কালই তো তারা আমাদেরকে কমিউনিস্ট বলে দোষারোপ করতে শুরু করবে এবং হৈচৈ করে সমগ্র বিশ্ব তোলপাড় করে তুলবে।

–তাদের যা ইচ্ছে করুক। ইসরাইল আমাদের বাড়ী–ঘর থেকে বিতাড়িত করুক, আর আমরা চুপ করে বসে থাকি, তা তো হতে পারে না।

–হুঁ, শক্তি ছাড়া সত্য, স্বাধীনতা ও সম্মান বলতে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। আর মানবতার সপক্ষে যত নীতিকথা ও আদর্শের বুলিই কপচানো হোক না কেন, শক্তি ছাড়া তা মূল্যহীন।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে সাঈদ আবার বললো– সুলায়মান, একটি কথা তোমাকে বলতে আমি ভুলে গেছি। খুব শিগগিরই আমি সুয়েজ এলাকায় পরিবহন ইউনিটে বদলি হয়ে যাচ্ছি।

–তাহলে তো তোমার সাহচর্য থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। কতদিনের জন্য তা

একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন।

–ছাত্র জীবন তথা স্থিতির জীবন শেষ হয়েছে। কর্মজীবনের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছি। এখন আমাদের প্রবাস জীবন। বন্ধু–বান্ধব ও আত্মীয়–স্বজন থেকে দূরে থাকার কষ্ট অবশ্যই সহ্য করতে হবে।

–তাহলে আমি যে এখনো মেডিকেলের ছাত্র আছি, এ জন্য কি আল্লাহর শোকর আদায় করা উচিত না?

–তুমি যা বলছো তা ঠিকই।

–বন্ধু, পড়ালেখা শেষ করার জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছি।

–দুঃখ এ জন্য যে, সময় চলে যাওয়ার পরই কেবল আমরা এ দিনগুলোর রূপ ও সৌন্দর্য অনুভব করে থাকি। তখন আমরা বসে বসে অতীত দিনগুলোর স্মৃতি স্মরণ করে বিরহ সঙ্গীত গেয়ে থাকি।

–তা সত্ত্বেও তোমাকে দেখে আমার ঈর্ষা হচ্ছে। কারণ, তুমি পড়ালেখার বোঝা হাল্কা করে ভবিষ্যতের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছ এবং যে পদটি লাভ করেছ, তা মোটেই তুচ্ছ নয়। আর আমি এখনো ছাত্র। যদিও শেষ পর্বের একজন ছাত্র, তবুও তো ছাত্র ছাড়া কিছু নই। তখন যদি তোমার সাথে সামরিক কলেজে ভর্তি হতাম, বেশ কিছু কাল আগেই নিশ্চিন্ত হতে পারতাম। ডাক্তারী পড়া ভীষণ কষ্টদায়ক কাজ। অতিরিক্ত পরীক্ষা–নিরীক্ষা, কাটাছেঁড়া ও পড়াশোনা করে করে আমার মেরুদন্ড বেঁকে গেছে।

–কিন্তু শিগগিরই তো তুমি একজন নামী–দামী ডাক্তার হবে, বহু টাকা পয়সার মালিক হবে। একটু আঁড় চোখে তাকিয়ে হাসতে হাসতে সাঈদ একথাগুলো বলেছিল। তারপর বিড়বিড় করে বললো– আসল কথা হলো, আল্লাহ যেন আমাদের তাওফীক দেন এবং আমাদের আশা পূরণ করেন।

এর কয়েক দিন পরেই আমার জীবনে নেমে এলো সেই চরম দুর্ভাগ্য ও দুর্ঘটনা। কিছুতেই আমি স্থির হতে পারছিলাম না। কারণ সেই দুর্ঘটনা আমার পৌরুষ, ধৈর্য ও শিক্ষাকে ছাড়িয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। এমনকি জীবনের প্রতি আমার যে বিশ্বাস, তাও বারবার টলে যাচ্ছিল। জীবনের আশা–আকাংখা, ধন–সম্পদ তথা এ ধরাপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবই যেন অস্বীকার করতে উদ্যত হয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল, ভাগ্য যেন সব সময় আমাকে চ্যালেঞ্জ করে চলেছে এবং গালে নির্দয়ভাবে চপেটাঘাত করে যাচ্ছে। কেন এমন হয়েছিল, জান?

মা ইন্তেকাল করলেন, চেঁচিয়ে বলে উঠলাম, আমার ভাগ্যে এটা কী ঘটল?

মা এখন মারা যাবেন তা যে কিছুতেই চাই না! আমি পড়াশোনা করেছি, চেষ্টা–সাধনা করেছি এবং সব সময় চেয়েছি ছাত্র জীবন তাড়াতাড়ি যেন শেষ হয়ে যায়। যাতে করে মাকে একটু খুশি করতে পারি। আমার জন্য তিনি যত দুঃখ–কষ্ট সহ্য করেছেন আমি চেয়েছি তার যথাযথ প্রতিদান দিতে। এ জন্য মনে মনে নানা রকম পরিকল্পনা করেছি, ডাক্তারী পাসের পরেই যার বাস্তবায়ন শুরু করবো। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, মা ও বাবাকে গ্রাম থেকে এনে কোন একটি শহরে এক সংগে আমরা বসবাস করবো। বৃদ্ধ বয়সে তাদের যে সুখ–শান্তি, আনন্দ ও নিরিবিলির প্রয়োজন, তা সেখানে থাকবে। এমনকি তাঁকে 'কাসরুল আইনী' মেডিকেল হাসপাতালে এনে আমার হার্ট বিশেষজ্ঞ একজন শিক্ষকের নিকট তাঁর হার্টের চিকিৎসার পূর্ণ প্রস্তুতিও সম্পন্ন করে ফেলেছিলাম। হায়রে, যদি একটু তাড়াতাড়ি করতাম! কিছুদিন আগেই যদি বিষয়টি চিন্তা করতাম! আমার দুর্ভাগ্যের শেষ নেই। মা, তোমার জন্য আমি দারুণ ব্যথিত। রোগাক্রান্ত সত্ত্বেও যেমন বলেছি, তাঁর অন্তরটি ছিল ভীষণ দয়ালু। আমার ভবিষ্যত জীবন ও মানুষের সাথে আচরণ সম্পর্কে তাঁর মূল্যবান উপদেশ কি কখনো ভুলতে পারবো?

এই দুর্ঘটনা আমার জীবনকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। সেই সাথে আমাকে বড় অস্থির ও বদমেযাজী করে তুলেছে। যে বই সব সময় পড়তাম, তা এখন চরম দুশমনে ও প্রেতাত্মায় পরিণত হয়েছে। আমি বড় সংকীর্ণ হয়ে পড়েছি। বন্ধুদের কোন কথা, হিতাকাংখীদের কোন সহানুভূতিমূলক বাক্য সহ্য করতে পারি না।

আমার পরিণতি কি এমনটিই হবে?

হায়রে মানুষের দুর্ভাগ্য! 'কাসরুল আইনী'তে কত মানুষের মৃত্যু দেখেছি! তাতে আমার অন্তরে কোন রকম ভাবের উদয় হয়নি। সামান্য দু' একটি কথা বলে সহানুভূতি জানিয়েছি, তারপর এমনভাবে ক্লাশরুমে চলে গিয়েছি, যেন কিছুই ঘটেনি। 'কাসরুল আইনী' হাসপাতালের সামনে যেসব মহিলারা শোকে কান্নাকাটি করতো এবং যারা কালো পোশাক পরে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতো, তাদেরকে দেখে বিরক্তি অনুভব করতাম।

কিন্তু এবার? এবার তো আমার মা! সুতরাং মানুষ কেন স্বাভাবিকভাবে তার নিজ নিজ পথে চলে যাবে? যারা আমার মাকে জানে না, চেনে না, তুমি কি তাদের কাছে আশা করো যে, আমার মত ব্যথিত হোক এবং আমার মায়ের জন্য কান্নাকাটি করুক? তারা তা করবে কি না জানি না। আমার মনে হচ্ছে মানুষ নিষ্ঠুর– অত্যন্ত নিষ্ঠুর। হায়রে, তাদের যদি কঠিন শিক্ষা হোত!

চাচা আমাকে গভীর শোকে নিমজ্জিত ও কাতর হতে দেখে অত্যন্ত আবেগজড়িত কণ্ঠে বললেন,

–সুলায়মান, এত বেশী শোকাতুর হয়ো না। মৃত্যুর পিয়ালা ঘুরে ঘুরে সবার কাছেই

আসবে।

–মার আগে যদি আমার কাছে আসতো, আনন্দের সাথে আমি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতাম।

–যা অতীত হয়েছে, চলে গেছে, তার জন্য এত বিচলিত হয়ো না। এমন করলে তোমার কপালে স্থায়ী দুর্ভাগ্য নেমে আসবে।

কিন্তু তার রোগের চিকিৎসা করা তো আমার উচিত ছিল।

–তার ভাগ্যে যা ছিল তা হতোই। আল্লাহর সৃষ্টি জগতে একটা নিয়ম–নীতি আছে, তুমি কখ্খনো সেই নিয়মে কোন পরিবর্তন আনতে পারবে না। আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন। তাঁকে জান্নাতবাসী করুন।

–জান্নাত? তা হতে পারে। সারাটি জীবন তাঁর রোগ–শোক, দুঃখ–দারিদ্রের জাহান্নামেই তো কেটেছে।

–সুলায়মান, তুমি বড় সন্দেহপরায়ণ। তিনি ছিলেন ভাগ্যবতী। রোগ–শোক ও অভাব–অনটন সত্ত্বেও তিনি ভাগ্যবতী। এই বঞ্চনার মধ্যেও তিনি তোমার ভবিষ্যত তৈরি করে ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তাঁর এ অসুস্থতাকে তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে ধৈর্যের পরীক্ষা এবং আল্লাহর ইচ্ছা বলে মনে করতেন। তিনি আরো মনে করতেন, যে সব ছোট ছোট পাপ তাঁর দ্বারা ঘটে যাচ্ছে, এ অসুস্থতা হচ্ছে তার কাফ্ফারা!

–বাবা সুলায়মান, তোমার বাপ–মার মত এসব গরীব কৃষকের সৌভাগ্য ও আনন্দ হচ্ছে গরু–ঘোড়ার আস্তাবলে, খাদ্যশস্যের ভান্ডারে, লাঙ্গল, মই ও কাস্তের পেছনে এবং আল্লাহ যা কিছুই তাদের জন্য বন্টন করেন, তার প্রতি অবিচল সন্তুষ্টিতে।

অবিনশ্বরতা এই পৃথিবীতে এক আল্লাহ ছাড়া আর কারোর নেই। সুলায়মান, তোমার নিজের দিকে ফিরে একটু চিন্তা কর। তোমার মায়ের কথা স্মরণ কর। তিনি রুকূ–সিজদার মধ্যে আল্লাহর কাছে তোমার জন্য দোয়া করতেন। তুমি তোমার হতাশা ও দুঃখ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তোমার মায়ের মত আল্লাহ্র কাছে কান্নাকাটি কর। অত্যন্ত বিনীত অন্তরে একনিষ্ঠভাবে তাকে স্মরণ কর। তুমি এক পরম প্রশান্তি অনুভব করবে। তোমার সারা অন্তর ও অস্তিত্বকে পূর্ণ করে দেবে। তারপর তুমি এক ভিন্ন মানুষে পরিণত হয়ে যাবে। এমন এক মানুষ, অভিজ্ঞতা যাকে ধারালো করেছে, দ্বন্দ্ব ও সংঘাত যাকে মহত্ত্ব দান করেছে। তুমি হবে এমন এক পুরুষ, আল্লাহর প্রতি যার ঈমান হয় গভীর এবং যে তাকদীর থেকে পালানোর কোন পথ নেই , সেই তাকদীরের প্রতি হয় সন্তুষ্টচিত্ত।

–চাচা, আপনাকে ধন্যবাদ, আপনি আমাকে প্রত্যয়ের দিকে ফিরিয়ে আনলেন। কঠিন দুঃখের মধ্যে আমি যে ঈমানের অর্থ হারাতে বসেছিলাম আবার তা আপনি আমাকে ফিরিয়ে দিলেন।

–বাবা সুলায়মান, হতাশ হয়ো না। যতক্ষণ তুমি আল্লাহর ওপর আস্থাবান থাকবে

এবং বিপদ–মুসীবতের সময় তাঁরই কাছে শক্তি ও সঠিক পথ চাইবে, সুন্দর ও কল্যাণের মধ্যেই তুমি অবস্থান করতে পারবে।

ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন– নিশ্চয় আমরা আল্লাহরই জন্য এবং নিশ্চয় তারই কাছে ফিরে যাব।

–ওয়াসতাঈনু বিস্‌সাবরি ওয়াস সালাত, ইন্নাল্লাহা মায়াস সাবিরীন– ধৈর্য ও সালাতের সাথে তোমরা সাহায্য কামনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।

–আল্লাহুম্মা ইন কানাত মুহসিনাতান ফাযিদ মিন হাসানাতিহা, ওয়া ইন কানাত মুসীয়াতান ফাতাযাওয়ায আন সাইয়িয়াতিহা– হে আল্লাহ, তিনি যদি নেককার হয়ে থাকেন, তাঁর নেকী আরো বাড়িয়ে দাও, আর বদকার হলে তাঁর বদ কাজ তুমি মাফ করে দাও।

আল্লাহুম্মা আমীন!

২৩

৩০ অক্টোবর, ১৯৫৬ আমি কলেজে গেলাম। শিক্ষক, ছাত্র–ছাত্রী সবাই বিস্ময়ে হতবাক। অফিসার, কর্মচারী, ঝাড়ুদার, রোগী সবার চোখে–মুখে ব্যথা ও ঘৃণার ছাপ। আমরা ছাত্ররা কলেজ আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে থাকলাম। একটা পীড়াদায়ক বিহবল ভাব আমাদেরকে স্থবির করে দিয়েছে। লেকচার শোনা ও লাবরেটরীতে যাওয়ার সময় ঘনিয়ে এলো। কিন্তু শিক্ষক বা ছাত্রদের কেউ একটুও নড়লো না।

ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইসরাইল সম্মিলিতভাবে যে এমন ষড়যন্ত্র ও উলঙ্গ আক্রমণ করতে পারে, আমরা কেউ তা আশা করিনি। আমরা সুয়েজ খাল দাবী করেছি এ অধিকারে কোন বিতর্ক থাকতে পারে না। সেখানে সব দেশের জাহাজ চলাচলের পূর্ণ স্বাধীনতার যিম্মাদারীর কথা আমরা বিশ্ববাসীর সামনে ঘোষণা করেছি। খালের সৌন্দর্য বর্ধন ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রতিশ্রুতিও আমরা দিয়েছি। বিশ্বের অধিকাংশ দেশ আমাদেরকে সমর্থনও করেছে। তাহলে এ ত্রিপক্ষীয় আক্রমণের অর্থ কি?

ইংরেজ–ফরাসী বন্ধুত্বের তাৎপর্য কি এই? দীর্ঘ সংগ্রামের পর আমরা যে স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করেছি তার অর্থ কি এই? স্বাধীন বিশ্ব যে শান্তির বুলি আওড়ায় তার চেহারা কি এই রকম?

আমি খুব তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে রওয়ানা হলাম এবং কারো সাথে কোন কথা না বলে নীরবে ঘরে ঢুকে গেলাম। বই–পুস্তক গোছগাছ করে আলমারী ও স্যুটকেসে ভরলাম।

স্কাউটের একটি পোশাক বের করে খুব দ্রুত পরে নিলাম। কিছু ডাক্তারী যন্ত্রপাতিও সংগে নিতে ভুললাম না।

এই বেশে চাচার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, বিস্ময়ের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বলে উঠলেন– এ কি? কোথায় যাচ্ছ?

খুব স্বাচ্ছন্দ্য ও অটল ভঙ্গিতে বললাম– ক্যান্যালের দিকে।

–বল কি? তুমি কি সত্যি বলছ?

–অবশ্যই। কোন রসিকতা করছিনে। আমরা এখানে বসে থাকি আর শত্রুরা আযহারে এসে ঘাঁটি গাড়ুক এবং আমাদেরকে ভেড়া–বকরীর মত জবাই করুক, তাই কি চান? আমাদের প্রত্যেকেই জানে ইহুদীদের কাপুরুষতা, ফরাসীদের নিচতা ও ইংরেজদের বর্বরতা সম্পর্কে।

–তোমার সামনে, দেড় মাস পরেই ফাইনাল পরীক্ষা। পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি নেয়াই তোমার প্রথম কর্তব্য। যখন ডাক্তার হবে, তোমার দায়িত্ব ও কর্তব্য পরিপূর্ণরূপে পালন করতে পারবে। আর আজ যে আবেগ ও উৎসাহ তোমার মাথায় ভর করেছে, তাতে আমি সায় দিতে পারিনে।

–চাচা, আপনি এমন কথাও বলতে পারলেন! এ যে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিনে। ইতিপূর্বে এমন আবেগ ও উৎসাহের কোন পরোয়া করিনি। কিন্তু আজকের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমাদের সীমান্তে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ানো এবং সীমান্ত অতিক্রমের জন্য যারা দুঃসাহস করবে, তাদের গর্দান উড়িয়ে দেয়া আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। চাচা, এতো আমাদের স্বাধীনতার প্রশ্ন!

চাচা কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে বসে থাকলেন। বুঝলাম তিনি তাঁর অন্তরের কথা বলেননি। আমার জীবন, আমার ভবিষ্যত এবং আমার আব্বার দীর্ঘ সাধনা বিনষ্ট হওয়ার আশংকায় তিনি এমনটি বলতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু দেশের ভবিষ্যত ও স্বাধীনতার ডাক যখন আসে, এসব অজুহাত দেখিয়ে তা কি উপেক্ষা করা যায়! কিছুক্ষণ পর চাচা মাথাটি একটু নেড়ে বললেন– তোমার কথাই সত্যি, তবে আমি এই ব্যাপারটিকে ভীষণ ভয় করছি। কারণ, ইসরাইল ছাড়াও আরো দু'টি বৃহৎশক্তি এবার এ ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত হয়েছে। তাদের বিজয়ের অর্থই হলো আমাদের ধ্বংস এবং আমাদের শক্তি ও জাতীয়তার চরম পরাজয়।

এ এক কঠিন পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় আমাদের উত্তীর্ণ হতেই হবে। এ পরীক্ষা প্রমাণ করে দিল যে, ইংরেজ আমাদের বন্ধু নয় এবং বন্ধু হওয়ার যোগ্যও তারা নয়। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আমাদেরকে এমন স্বাধীনতা ও সম্মান অর্জন করতে হবে, যাতে সারা বিশ্ব আমাদের বন্ধুত্বের মর্যাদা দেয়। অন্যথায় মৃত্যুই আমাদের জন্য শ্রেয়।

সাথে সাথে চাচা বলে উঠলেন– দ্বিতীয় সম্ভাবনার কথাটি বলো না। আমার মন বলছে

তা কখ্খনো হবে না।

–এখানে আমি আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করবো না চাচা, আমাকে এক্ষুণি রওয়ানা হতে হবে।

–কিন্তু তোমার আব্বাকে কি বলবো? তুমি এমন কাজে চলে যাবে তিনি তো তা চিন্তাই করতে পারবেন না।

–তাঁকে বলবেন, সে আপনাকে, আপনার ভাইদেরকে এবং সকল বৃদ্ধ–বৃদ্ধাদেরকে রক্ষার জন্য চলে গেছে।

–তুমি কোন্ ধরনের কাজের সিদ্ধান্ত নিয়েছ?

–রণক্ষেত্রে আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা ও অন্যান্য সাহায্যদানের ব্যাপারে আমার ডাক্তারী অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবো। আমার পকেটে থাকবে রিভলবার। বিদেশীদের কাউকে আমাদের দিকে আসতে দেখলেই তাকে হত্যা করবো।

–তোমার ডান হাতে রিভলবার এবং বাম হাতে স্টেথিসকোপ।

–আপনি কি মনে করেছেন, আমার ডান হাতে শয়তান এবং বাম হাতে ফেরেশতা থাকবে?

–দয়া আর নিষ্ঠুরতা, ভালো এবং মন্দের সংমিশ্রণে এ দুনিয়া!

–প্রচলিত অর্থের মন্দ এটা নয়। তবে তা নিজের এবং স্বাধীন জীবনের জন্য প্রতিরক্ষা।

–আল্লাহ হাফেয!

পোর্ট সাঈদে মিলিত হলাম কমিশন্ড অফিসার বন্ধু সাঈদ হাফেজের সাথে। তখন সেখানে তীব্র লড়াই চলছে। সাঈদ বললো–তারা সব ভীরু, কাপুরুষ। অত্যন্ত নিকৃষ্টভাবে তারা আমাদের জন্য ওঁৎ পেতে থাকে। চিন্তা করে দেখ, তারা শুধু বিমান ঘাঁটি ও সামরিক লক্ষ্যবস্তুসমূহের ওপরই আক্রমণ চালায় না বরং শিশু, নারী ও বৃদ্ধাদের মত নিরপরাধ জনপদের ওপরও আক্রমণ করে থাকে। তা সে ক্যান্যাল এলাকায়ই হোক বা অন্য কোথাও হোক।

–সাঈদ, এতে তেমন আশ্চর্যের কিছু নেই। এই প্রথম বারের মতই তারা মানবতাকে পদদলিত করছে না।

–আমাদের দেহসহ ভূমিও যদি তারা তুলোর মত উড়িয়ে দেয়, তবুও তারা যা চাচ্ছে তা হতে দেব না।

মৃদু হেসে আমি বললাম– এ ব্যাপারে সম্ভবত তুমি খুবই সৌভাগ্যবান। এবার তোমার

ইচ্ছা মত ইংরেজদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নাও।

দাঁত কিড়মিড় করে সে বলে উঠলো– হাঁ, আমি প্রতিশোধ নেব। প্রতিশোধ, প্রতিশোধ।

তারপর আমার কাঁধে হাত রেখে বললো,

–সময় সংক্ষিপ্ত। এটা আবেগ–অনুভূতি প্রকাশের ক্ষেত্র নয়। শিগগিরই তুমি অমুক স্থানে চলে যাও, কর্পোরাল অমুকের সাথে যোগাযোগ কর। তিনি তোমাকে মেডিকেল স্বেচ্ছাসেবক টিমের সাথে সংযুক্ত করে নেবেন এবং তোমাকে প্রয়োজনীয় পোশাক ও ব্যাজ দেবেন। এসো, পোর্ট সাঈদের চতুর্দিকে অসংখ্য আহত ব্যক্তি ছড়িয়ে রয়েছে। কে জানে, হয়তো আগামীকাল এ সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাবে।

সত্যিই পোর্ট সাঈদ শত্রু বাহিনীর সম্মিলিত আঘাতের প্রতীক্ষায় ছিল। স্বেচ্ছাসেবক, দেশরক্ষা বাহিনী ও জনগণ অস্ত্র হাতে নিয়ে রাস্তায় লাফিয়ে পড়লো। তারা এত নির্ভীক হয়ে উঠলো যে, মুহুর্মুহু জঙ্গী বিমানের শব্দ বা বোমার আঘাতে তাদের ওপর ভেঙ্গে পড়া অট্টালিকার পরোয়া তারা করছিল না এবং এখানে–ওখানে ছড়িয়ে–ছিটিয়ে থাকা রক্তাক্ত লাশের প্রতিও তাদের কোন ভ্রুক্ষেপ ছিল না।

আশ্চর্য! মানুষ কি জানতো না, আমাদের অধিকার হরণের জন্য ফ্রান্স ও ইসরাইলের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে ইংল্যান্ড সেনাবাহিনী পাঠিয়েছে? তাদের বুদ্ধি–বিবেক কি এতই অচেতন ছিল যে, তারা বিষয়টির ভয়াবহতা পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারেনি? নাকি লাল শয়তানেরা এমন এক কাল্পনিক দৈত্যে পরিণত হয়েছিল, যা কোন মানুষ বা জাতিকে কোন রকম ভয়–ভীতি দেখাতে পারে না? নাকি আমরা একটি অধিকার ও স্বাধীনতা সচেতন জাতি, যারা কোন রকম ত্যাগ স্বীকারে কার্পণ্য করি না?

বিশ্ব বিবেক নড়ে উঠলো। আক্রমণকারী দেশগুলোর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও নিন্দা শুরু হলো। শান্তি বিনষ্ট হওয়ার কারণে বিশ্ব সংস্থাও বিক্ষুব্ধ হলো। রাশিয়া ভয় দেখালো লন্ডন ও প্যারিসকে নানান ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের। তাছাড়া বহু দেশ এমন নির্লজ্জ কাজের জন্য বিক্ষুব্ধ হলো। মিসরীয় জাতি নিরন্তর তাদের রক্তাক্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলো। ছত্রী সেনারা পোর্ট সাঈদ দখলের চেষ্টা করলো। আকাশ থেকে বোমা ফেলা হলো। জনতা ও সেনাবাহিনী রাস্তায় রাস্তায় পজিশন নিল। স্বেচ্ছাসেবীরা আকাশ থেকে অবতরণরত শত্রুবাহিনীর ছত্রী সেনাদের ধরে ধরে মারতে লাগলো।

পোর্ট সাঈদের ফুয়াদ স্ট্রীট ছিল সর্বাধিক ভয়াবহ রণক্ষেত্র। এ ফ্রন্টের প্রতিরক্ষা বাহিনীর পুরোভাগে ছিল কমান্ডার সাঈদ হাফেজ। সে একটি ব্যাংকারের ভেতরে নড়াচাড়া করছে। চেহারা ধূলিধূসরিত, হাত দু'টি কালো, কোট–প্যান্টে চাপ চাপ রক্তের দাগ। এ অবস্থায় সে কিছু সৈনিককে নির্দেশ দিচ্ছে ছত্রী বাহিনীর অবতরণ বরাবর আকাশের দিকে গুলী ছোঁড়ার জন্য। অন্য একটি দলকে নির্দেশ দিচ্ছে ব্যাংকারের দিকে এগিয়ে আসা

লোকদের হটিয়ে দেয়ার জন্য। তারপর সে আমাদের মেডিকেল টিমের লোকদের প্রতি ইঙ্গিত করলো, আহত বা শহীদদের সরিয়ে নেয়ার জন্য। তারপর সে ফিরে গেল তার রাইফেলটির কাছে, পুঞ্জীভূত ঘৃণা নিয়ে সীমা লংঘনকারীদের বুক তাক করে মৃত্যুক ছুঁড়ে মারার জন্য।

সাঈদ হাফেজ যখন গুলী ছুঁড়ছিল, অবাক হয়ে তাকে তাকিয়ে দেখছিলাম। তার মুখমন্ডলের পেশীগুলো সংকুচিত হয়ে উঠেছে, জ্বলন্ত আগুনের স্ফুলিঙ্গ তার দু'চোখ থেকে ঠিকরে পড়ছে এবং রাইফেল থেকে গুলী ছোঁড়ার সময় রাইফেলের ঝাঁকুনির সাথে তার শরীরও কেঁপে কেঁপে উঠছে। আর সেই সাথে পেঁজা তুলোর মত তার বিক্ষিপ্ত চুল নেচে নেচে উঠছে। সাঈদ হাফেজের সময় এসেছে তার প্রাক্তন সৈনিক দাদা ও তাঁর বন্ধু আরাবীর প্রতিশোধ নেয়ার। প্রতিশোধ নেয়ার সময় এসেছে তার বাবার, যিনি বহু কষ্ট সহ্য করেছেন এবং প্রতিশোধ নেবার সময় এসেছে বাসীমার প্রতি অত্যাচারের। হায়, যদি সে না ফিরত! তার মনে পড়ছে ইংরেজ সেনা ছাউনিতে বন্দী দিনগুলোর কথা। তার আরো মনে পড়ছে কুকুরের হামলা, চাবুকের আঘাত, বরফের মত ঠান্ডা পানির, বেদনাদায়ক পীড়ন, প্রচন্ড ক্ষুধা আর শাস্তির কথা। আমার মনে হলো, সে প্রতিশোধ নিচ্ছে আমার ও সেই ছোটবেলার মিটগামারের আল-মুয়াহাদা স্ট্রীটে পানির নর্দমায় পড়ে গেলে যারা হেসে কুটি কুটি হয়ে পড়েছিল, তাদের কাছ থেকে। সে প্রতিশোধ নিচ্ছে 'জুমায়্যিয' বিক্রেতা সালেম চাচার ছেলে এবং আমার চাচার। যিনি ঘুষ অথবা বড় ধরনের একটা সুপারিশপত্র ছাড়া সামান্য একটি কাজ লাভ করতে সক্ষম হননি। সে আরো প্রতিশোধ নিচ্ছে, অনেক নাম না-জানা লোকদের পক্ষ থেকে, যাদের সীমা, সংখ্যা এমন ভয়াবহ মুহূর্তে নির্ধারণ করা মোটেই সম্ভব নয়।

আমি সেনা অফিসার সাঈদ হাফেজের পেছন থেকে তাকিয়ে দেখছিলাম। অবাক হয়ে গেলাম। সেখানে আছে রণক্ষেত্রের পোশাক পরিহিত নিয়মিত সৈনিকরা। তাদের পাশেই রয়েছে ফিরিঙ্গী পোশাক পরা লোকেরা। সেখানেই আছে লম্বা জামা ও পাজামা পরা তৃতীয় একদল লোক। ছেঁড়া ও ময়লা কাপড় পরা চতুর্থ একদল লোকও তাদের সাথে আছে। গতকালও যারা খাওয়া সিগারেটের পেছনের অংশটুকু কুড়াতো, জুতো পালিশ করতো অথবা খবরের কাগজের হকারি করতো। আছে কিশোর, যুবক ও বৃদ্ধের সমাহার। তাদের মধ্যে যেমন আছে ছাত্র, তেমনি আছে কুলি-মজদুর, অফিসের কর্মচারী, কর্মকর্তা, সাধারণ সৈনিক, কমিশন্ড অফিসার এবং কিছু মহিলাও। এমনকি আমি দেখতে পেলাম, আধা ভাঙ্গা একটা বাড়ীর জানালায় দাঁড়িয়ে একজন মহিলা একটি ধাতব পাত্র একজন শত্রুর সৈন্যের মাথায় ছুঁড়ে মারছে। সম্ভবত অন্য একটি পাত্র আনার জন্য ভেতরে যাওয়ার উদ্যোগ করছিল। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে একটি গুলী এসে তার মাথায় লাগলো। জানালার ওপরই সে ঢলে পড়লো। তার মাথা থেকে রক্ত ঝরতে লাগল।

এক অভিনব যুদ্ধ। এ যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছিল ভাঙ্গা বোতল, শিশি, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, ইট-পাথর, কসাইদের ছুরি, রান্নার হাড়ি-পাতিল। এভাবেই একটি জাতি গৌরব ও সম্মান সৃষ্টি করে এবং স্বাধীনতা রক্ষা করে সমস্ত কিছুর বিনিময়ে।

প্রবল গোলাবৃষ্টির মধ্যে আহত ও নিহতদের সরিয়ে নেয়া সহজ কাজ ছিল না। তা সত্ত্বেও এমন ভয়াবহ পরিবেশ ও প্রবল প্রতিরোধও আমার কাছে স্বাভাবিক মনে হয়েছে। আমি মোটেই ভীত বা পরিশ্রান্ত হইনি। মনে হয়েছে, সংঘর্ষের ব্যাপ্তি ও প্রচন্ডতা মৃত্যুকে এত সহজ ও স্বাভাবিক করে দিয়েছে যে, যে কেউ মৃত্যুর জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

ছত্রী বাহিনীর প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়া হলো। তারপর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় চেষ্টাও। আমার কাছে স্পষ্ট মনে হয়েছে, পোর্ট সাঈদের এ যুদ্ধ চিরকালের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে। স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধ দেখিনি, তাই তার সাথে এর তুলনা করতে পারছিনে। পোর্ট সাঈদের যুদ্ধের কোন তুলনা নেই। সে যুদ্ধ আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় ঘটনা।

ধোঁয়ার কুন্ডলী, চেঁচামেচি, রাইফেলের গোলাগুলী ও বোমার বিস্ফোরণের মধ্যে কিছু সময় কাটালাম। পঙ্গু মানুষ, রক্তাক্ত দেহ আর সংগ্রামীদের সে এক বিস্ময়কর জগত।

সাঈদ হাফেজ যেখান থেকে গুলী চালাচ্ছিল, সেদিকে তাকালাম। কিন্তু তাকে পেলাম না। সে কোথায় গেল তা জানার জন্য ক্রোলিং করে এগোনোর চেষ্টা করতেই অনুভব করলাম, একজন আহত ব্যক্তি মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে আছে এবং আমার কাছে সাহায্য চাচ্ছে। খুব দ্রুত তাকে সরিয়ে নেয়া এবং আমার বন্ধুর অনুসন্ধানের বিষয়টি আপাতত মুলতবি রাখা কর্তব্য মনে করলাম।

মেডিক্যাল সেন্টারে আহত ব্যক্তিকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ডাক্তার যেখানে অবস্থান করেন দ্রুত সেদিকে বেরিয়ে গেলাম। ডাক্তারকে দেখলাম, তিনি একজন কমিশন্ড অফিসারের পেট অপারেশন করে গুলী বের করছেন। আমি গভীরভাবে অফিসারটির চেহারা নিরীক্ষণ করলাম। দেখলাম, এই মানুষটিই হচ্ছে রক্তমাংসের সাঈদ হাফেজ। মুহূর্তে আমি চিৎকার করে বলে উঠলামঃ

–এ লোকটি কে?

–এ এক হতভাগ্য, আমরা তার ডান কাঁধ থেকে একটি গুলী বের করেছি। পেট থেকেও আরেকটি বের করার চেষ্টা করছি।

আমি সাঈদের মলিন ও বিমর্ষ মুখের দিকে তাকালাম। তখনো তার চেহারা থেকে প্রতিশোধস্পৃহা ও অনমনীয় ভাব দূর হয়নি। অচেতনভাবে জিজ্ঞেস করলাম– এ কি অফিসার সাঈদ হাফেজ?

–শান্তভাবে ডাক্তার জবাব দিলেন– আমরা জানিনে। সে দেশেরই এক সন্তান।

–ঈর্ষা করার মত বীরত্ব ও সাহসিকতার এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত সে স্থাপন করেছে।

অনুনয়ের ভঙ্গিতে আমি বললামঃ

–জনাব, আপনি কি মনে করেন সে ভালো হয়ে যাবে?

–কেন হবে না? আমরা তো এখন অলৌকিক কর্মকান্ডের দেশ মিসরে আছি।

–ক্ষত যে খুব মারাত্মক মনে হচ্ছে?

–তেমন মারাত্মক নয়, আমার বিশ্বাস অপারেশনটি তার বেশ কাজে লাগবে।

–ডাক্তার সাহেব, আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করুন।

যুদ্ধ মুলতবি–চুক্তি সম্পাদনের কিছুদিন পর আমি হাসপাতালের যে ভবনটিতে পোর্ট সাঈদের যুদ্ধে আহতদের কয়েকজন ছিল, তারই আশেপাশে পায়চারি করছিলাম। হঠাৎ দেখলাম, শায়খ হাফেজ তাঁর পাগড়ী ও সুফীদের লম্বা কালো জুববা পরে হাসপাতালের ভেতর দিকে যাচ্ছেন।

তাঁর চোখে–মুখে ব্যথা ও ভীতির ছাপ। সত্যি কথা বলতে কি, এ সময় তাঁকে দেখে আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম। খুব দ্রুত তাঁর পেছন পেছন এগিয়ে চললাম। সাঈদ যে কামরায় ঘুমাতো সেখানে ঢুকেই এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখতে পেলাম। শায়খ হাফেজ সাঈদের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে চুমু দিচ্ছেন, আর অঝোরে কাঁদছেন।

আর সাঈদ মিট্‌মিট্ করে হেসে বলছে– আব্বা কাঁদছেন কেন। আমি তো আলহামদু লিল্লাহ ভালোই আছি।

–আমি শায়খকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য তাদের কথার মাঝখানে বলে উঠলাম– চাচা, সাঈদ অতুলনীয় বীরত্ব ও সাহসিকতা দেখিয়েছে। সে সবের বিস্তারিত বর্ণনা শুনলে আনন্দে ও গর্বে আপনার অন্তরটা ভরে যাবে। আরাবী বিপ্লবের একজন অংশীদার সৈনিকের পৌত্র মহান স্বেচ্ছাসেবক সাঈদ হাফেজ সম্পর্কে পত্র–পত্রিকায় যা কিছু লেখা হয়েছে, তার কিছু হয়তো আপনি পড়েছেন।

অত্যন্ত বিনয়ের সাথে লোকটি উত্তর দিল– আলহামদু লিল্লাহ। আমার ছেলের কাছ থেকে এমনটিই আশা করেছিলাম। এখন মরলেও শান্তিতে মরতে পারবো। আর এই যে অশ্রু তোমরা দেখছো, আমি তা সংবরণ করতে পারছিনে, আমাকে তোমরা ক্ষমা করো।

দীর্ঘক্ষণ তিনি ছিলেন। অনেক কথাই তার সাথে হয়েছিল। অনেক বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম। চলে যাওয়ার সময় তিনি দ্বিতীয় বার কান্নায় ফেটে পড়লেন।

–আবার কেন কাঁদছেন? সাঈদের অবস্থায় কি নিশ্চিন্ত হতে পারেননি?

–আমি খুবই নিশ্চিন্ত হয়েছি; কিন্তু.....।

–কিন্তু কি?

–সাঈদ আমাকে বাসীমা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছে।

–তাতে কী হয়েছে?

–আমি তাকে মিথ্যা বলেছি। বলেছি সে ভালো আছে।

–এছাড়া তাকে আর কি আপনি বলতে পারতেন?

–তাকে বাসীমার সত্যি খবরটাও তো দিতে পারতাম। একদিন সকাল বেলায় আমরা তাকে রেল লাইনের ওপর খন্ড–বিখন্ড অবস্থায় দেখতে পেলাম। কখন কিভাবে সে ঘর থেকে বের হলো আমরা কেউ তা জানিনে।

–হতভাগী আত্মহত্যা করেছে। আমাদের ধারণা ছিল, সে সম্পূর্ণ অচেতন। এমন মারাত্মক অবস্থায় তার আত্মহত্যা সম্পর্কে তুমি কী ভাবতে পারো?

–ইয়া আল্লাহ! আর বলবেন না চাচা, যথেষ্ট হয়েছে।

শায়খ হাফেজ আর কোন কথা বলতে পারলেন না। তাঁর দু'চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো, আর তিনি তা রুমাল দিয়ে মুছতে লাগলেন। এ পরিবারের অতীত চিত্রটি মুহূর্তে আমার মাথায় ভেসে উঠলো। তারপর দেখতে পেলাম বাসীমার পরিণতি, আমার বীর বন্ধু সাঈদের পরিণতি এবং তাদের দু'জনের মাঝখানে শায়খ হাফেজের উপস্থিতি। আমার অন্তর গভীর দুঃখ ও ব্যথায় খানখান হয়ে যেতে লাগলো। অনুচ্চ কন্ঠে আমি বলে উঠলাম,

–লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ– এক আল্লাহ ছাড়া কোন উপায় ও শক্তি নেই।

স্টেশনে শায়খ হাফেজকে বিদায় দেয়ার আগে বেদনা বিজড়িত কন্ঠে আস্তে আস্তে তাঁকে বললাম,

–আশা করি কায়রো দিয়ে যাওয়ার পথে আমার চাচাকে খবরটি দিয়ে যাবেন। আমি এক সপ্তাহ পরেই ফিরছি এবং নতুন করে কলেজের পড়া শুরু করবো, পরীক্ষার প্রস্তুতি নেব। এ সপ্তাহ আমি সাঈদের পাশেই কাটাবো। এর মধ্যে সে ইনশাআল্লাহ ভালো হয়ে উঠবে।

–আল্লাহ তোমার সহায় হোন।

–মাআস সালামাহ্।

–সাল্লামাকাল্লাহ।

তাশখন্দে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি 'লাইল ও কাদবান'-এর খ্যাতিমান কাহিনীকার মিসরীয় কথাশিল্পী ডাঃ নাজিব কিলানীর খ্যাতি আজ বিশ্বজোড়া। সিনেমা, মঞ্চ এবং টেলিভিশনের জনপ্রিয় কাহিনী নির্মাণেই তাঁর খ্যাতি সীমাবদ্ধ নয় — উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা এবং মননশীল প্রবন্ধ রচনায় তিনি সমান সিদ্ধহস্ত। এ পর্যন্ত তাঁর অর্ধ শতাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ইটালী, ইংরেজী, রুশ, তুর্কী, উর্দু, ফারসীসহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় তাঁর গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

তাঁর এ খ্যাতি তাঁকে বিরল সম্মানের অধিকারী করেছে। মিসরের শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক উচ্চ পরিষদ, আরবী ভাষা একাডেমী, নাদিল কিস্‌সা, মাজাল্লাতুশ শাব্বান আল মুসলেমীনসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষামন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তিনি পুরস্কৃত হয়েছেন বিপুলভাবে। এমনকি ডঃ তাহা স্বর্ণপদক লাভের গৌরবও তিনি অর্জন করেছেন। পশ্চিম মিসরের শারশাবাহ নামক পল্লীতে ১৯৩১ সালে এই খ্যাতিমান লেখকের জন্ম। তিনি কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের আল কাস্‌রুল আরনী মেডিক্যাল কলেজের মেডিসিন ও সার্জারীর ব্যাচেলর। বর্তমানে তিনি নাদিল কিস্‌সা ও আরবী লেখক সংঘের সদস্য এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পদে সমাসীন।

ডাঃ নাজিব কিলানীর বাংলায় অনূদিত সাড়া জাগানো প্রথম উপন্যাস-'আল্লার পথের সৈনিক' বিপুল পাঠক প্রিয়তা পেয়েছে। উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্য পরিষদ প্রকাশ করেছিল ১৯৮৫ সালে। এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮৭ সালে। 'আত-তরীক-আত-তাবীল'-এর বাংলায় অনূদিত নাজিব কিলানীর দ্বিতীয় উপন্যাস-'রক্ত রঞ্জিত পথ।'

উপন্যাসটি ১৯৫৭ সালে মিসরের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত সাহিত্য প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত। 'রক্ত রঞ্জিত পথ'-এর প্রতিটি ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে মিসরের স্বাধীনতা সংগ্রাম, আত্ম কুরবাণী, প্রেম এবং জীবন সংগ্রামের তেজদীপ্ত সাহস। 'রক্ত রঞ্জিত পথ'-এ স্বাধীকারের স্বপ্ন নিয়ে ছুটে চলেছে জীবন সংগ্রামী এক দুরন্ত ঘোড় সওয়ার।